Zofa'
Ak Karak
Dimona
Aş Şafi
Zin
Mizpe
Ramon
Al Jafr
Ma'an
রক্তে আঁকা
Al Kuntillah
Yotvata
ফিলিস্তিন
Elat
জসিমউদ্‌দীন আহমাদ

বই: | রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন
লেখক: | জসিমউদ্‌দীন আহমাদ
প্রচ্ছদ: | আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশক: | ইয়াছিন ইলাহী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রক্তে আঁকা

ফিলিস্তিন

জসিমউদ্‌দীন আহমাদ

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশ্লেষক

FERA PROKASHON

প্রকাশনায়

ফেরা প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড মাদরাসা মার্কেট, (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৬২৮-৪৩২২৩০
feraprokashon@gmail.com
facebook.com/feraprokashon

প্রথম প্রকাশ: জুন-২০১৬

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৭

তৃতীয় সংস্করণ: অক্টোবর ২০২১

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক
islamicboighor.com

মূল্য: ৩০০ টাকা

ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম

রাহিমাহুল্লাহু তায়ালা রাহমাতান ওয়াসিয়া।

আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আপনাকে স্থান দিন
ফিরদাউসে আ'লায়।

২০০২-০৩ সালে চিনের সামরিক বাজেট ছিল ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার পরিমাণ মাত্রাটি বড়ো হয়ে গেছে বলে আমেরিকা চিনের ওপর আপত্তি তুলেছিল। একই বছর আমেরিকা ইসলাম-বিষয়ক 'গবেষণা ও এক্সপার্টিজ'-এর জন্য যে বাজেট করেছে তার পরিমাণও ৩৫ বিলিয়ন ডলার। কি হয়েছে আমেরিকার? পৃথিবীতে শত ধর্ম রয়েছে, আর কারো বিষয়ে নয় শুধু মুসলমানদের বেলায় তাদের এতোটা যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয় কেন? উত্তরটি যদিও বিশাল, এককথায় বললে কিং ডেভিডের 'কিংডম অব ইসরঈল' প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী জায়নবাদী ব্যবস্থার মূলে তা প্রোথিত। ইহুদিরা অর্থের মালিক। ইহুদিরা ইসলামের চিরশত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ। ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের অন্য অর্থ ইরাকে ইহুদিদের ভাড়াটে শক্তির আগ্রাসন। জন্মগতভাবে তাদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণার প্রেষণা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এই প্রেষণায় তাড়িত হয়ে তারা দুনিয়াময় জ্বালিয়ে যাবে যুদ্ধের আগুন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘরে-বাইরে। এই যুদ্ধ চলতে থাকবে- এক চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত। আল্লাহর ইচ্ছায় *কিতালুল ইয়াহুদের* মাধ্যমে বিশ্ব মুক্ত হবে ইহুদিবাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে। বাসযোগ্য হবে মানুষের পৃথিবী।

শুধু দুটি কথা নয়...

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন মুসলিমবিশ্ব নানামুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কষাঘাতে জর্জরিত। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সামরিক- প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিম-উম্মাহ আক্রান্ত। মুসলিমদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের শত্রুতা নতুন নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে ঈমানদারদের সঙ্গে কুফুরিশক্তি বিদ্বেষ-বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। ইসলামের শুরুর যুগে কাফেররা এই দ্বীনকে প্রতিহত করার সবরকমের কলা-কৌশল প্রয়োগ করেছিল। অতীতে এধরনের অপচেষ্টাগুলো সামরিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল বেশি। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ ছিল কম। একেবারেই যে ছিল না তা নয়। খেলাফতে রাশেদার পর থেকে বিভিন্ন বাতেল ফেরকার উদ্ভব এধরনের অপতৎপরতারই ফল-ফসল। যদিও এসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র অতীতে কোথাও স্থায়িত্ব পায়নি। এর একটি কারণ হতে পারে তা ছিল নবুওয়তের নিকটবর্তী যুগ। সময়ের পরিক্রমায় ইসলামের বিস্তৃতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ কৌশলেও ভিন্নতা এসেছে। একসময় যা ঘোষিত ও সদম্ভ 'ক্রুসেড' ছিল তা এখন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' 'সভ্যতার যুদ্ধ'! সমাজকে 'খারাপ' লোকদের হাত থেকে 'বাঁচানোর' প্রয়াস! এই যুদ্ধের নির্দিষ্ট কোনো ভূগোল নেই। বীজগণিতের কাল্পনিক সংখ্যার মতো 'সন্ত্রাসবাদের' অশরীরি আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশ্বের এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে!

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নগদ প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের উল্টোগতি। শত্রুকে মিত্র কিংবা মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করার বিপজ্জনক প্রক্রিয়ায় মুসলিমবিশ্ব এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড তার অন্য অংশ থেকে একেবারেই আলাদা। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব প্রভাব-বলয়। জাতিগত এই পরিচয়ের সংকট কতটা গুরুতর তা আমরা মুসলিমদের জন্য আলাদা আলাদা রাষ্ট্র ও এই রাষ্ট্রগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটির সীমানা ও স্বার্থগত বিরোধ থেকে অনুধাবন করতে পারি। অতীতে কখনো এমন হয়নি কেউ নিজেকে সৌদি, ইরাকি বা সিরিয়ান পরিচয় দিয়ে গর্বিত হয়েছে। তখন ছিল 'উম্মাহ'। এখন 'দেশ?' আলাদা সীমারেখা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জটাজালে মুসলিমরা আজ কেউ পাকিস্তানি, কেউ বাঙালি, কেউ আফ্রিকান, কেউ ইন্দোনিশ- ভৌগলিক ও আঞ্চলিক, বৃহত্তর পরিসরে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জাতিতে বিভক্ত। জাতীয়তার উদ্দেশ্য আত্মপরিচয় মুছে নতুন আইডেনটিটি ক্রিয়েট করা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাজহাবগত সংঘর্ষ, ধর্মের নামে দলাদলি, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভিন্নতাসহ নানা ফাসাদ।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রথমসারিতে আছে ইহুদি, বর্তমানে ইসরঈল। পৃথিবীতে সংঘটিত সমস্ত অনিষ্টের মূলেও এরা। খৃস্ট ও পৌত্তলিক শক্তি তাদের ক্রীড়নক মাত্র। মুসলমানদের চূড়ান্ত ও শেষ লড়াইটি সংঘটিত হবে ইহুদি-খৃস্টান ও অবিশ্বাসীদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যকথায়, ইসরঈলে (ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডে) সংঘটিত হবে বিশ্বকে বাঁচানোর শেষ 'মহাযুদ্ধ'। ইহুদিজাতিকে নির্মূল করে পৃথিবীকে বাঁচানোর মিশনে নেতৃত্ব দেবেন 'মাহদি'। নেতৃত্ব

দেবেন 'ঈসা ইবনু মরিয়ম' আলাইহিস সালাম। দাজ্জালের বিরুদ্ধে 'আরমাগেদন' বা 'মালহামা' যাই বলি 'বিলাদুশ শাম' ও ফিলিস্তিনেই সংঘটিত হবে।

ফিলিস্তিন, ইসরঈল, ইহুদি, মালহামা, আখেরুজ্জামান- একসঙ্গে গাঁথা অনেকগুলো পরিভাষা। এগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটি পরম্পরাযুক্ত। বিশ্বকে বুঝতে হলে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে চলমান সাংস্কৃতিক ও সামরিক অপতৎপরতার ধরন-প্রকৃতি জানতে হলে- ফিলিস্তিন, জায়নবাদ, ইসরঈল ও বৃহৎ মধ্যপ্রাচ্য প্রকল্প সম্পর্কে জানতে হবে। বুঝতে হবে ফ্রি-ম্যাসন ও জায়নিস্ট আন্দোলনের পূর্বাপর। জানতে হবে *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার*! এই বইয়ে আমি ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি (*সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল* বইয়ে মালহামা ও আখেরুজ্জামান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)। এখানে ইতিহাসের মূল বিষয়গুলো কলেবর বৃদ্ধি না করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দৃষ্টি আকর্ষণের মতো করে উল্লেখ করেছি, উদ্দেশ্য- মধ্যপ্রাচ্যের খেলাফত পরবর্তী মুছে ফেলা ইতিহাস নিয়ে আমাদের জানাশোনাকে সংশয়গ্রস্ত করা। অন্যকথায়, ভুলবাল ইতিহাসের খোলস উন্মোচন।

এই বইয়ের বেশিরভাগ লেখা সংকলন। দু'একটি লেখা তরজমা, অন্যগুলো মৌলিক। ইন্টারনেটের বিশাল ভাণ্ডার ঘেঁটে ফিলিস্তিন সম্পর্কিত নানাধর্মী তথ্য থেকে কিছু বিশুদ্ধ তথ্য এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। কয়েকটি লেখা মূল সোর্সের ভাব ও ভাষা ঠিক রেখে খানিকটা পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনসহ সংযুক্ত হয়েছে। ব্লগ ও ব্যক্তিগত ব্লগস্পট থেকে নেওয়া গবেষণাধর্মী রচনাগুলোর

জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ রইল। আশরাফ মাহমুদ, শায়েখ মাহদি, আসিফ আরসালান, আমিন বেগ, জাভেদ কায়সার, হোসেন মাহমুদ ও মোহাম্মাদ নূরুল আমিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাঁদের রচনার সৌন্দর্য ও তথ্যের সমাহার বইটিকে গুণগতমানে সমৃদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের জন্য রইল আন্তরিক দোয়া ও শুভকামনা। যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উম্মাহর প্রতি আপনার মনে দরদ ও ভালবাসা জাগলে এই ক্ষুদ্র চেষ্টা-উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে। আশা করি দোয়ায় ভুলবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের পথে কবুল করুন, আমিন।

-জসিমউদ্‌দীন আহমাদ

পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কৈফিয়ত

'আকর' শব্দের অভিধানসিদ্ধ অর্থ- 'খনি, আধার, উৎস'। *রেফারেন্স* বুক বোঝাতে আমরা বলি, 'আকরগ্রন্থ'। অভিধান *আকরকে* 'মূল্যবান উৎসে' সংজ্ঞায়িত করেছে। 'রক্তের আকরে লেখা ফিলিস্তিন'- এই বাক্যে *রক্তের-আকরে লেখা* শব্দবন্ধের আমরা অর্থ নিতে পারি, 'রক্তের খনিতে লেখা', নিগুঢ় অর্থে *রক্তের খনিতে ডোবানো*।

গোধুলির লালিমার মতো ইতিহাসে ফিলিস্তিন রক্তের আধার। রক্ত-বর্ণে লেখা এর সময়ালেখ্য, ইতিহাস। যদি বলি তার জন্ম-উৎস-বিস্তৃতি রুধিরধারা থেকে উৎসারিত, বাহুল্য হবে না। ফিলিস্তিন আমাদের অনেকের নিকট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর একটি নিপীড়িত ভূখণ্ড। কারো কাছে এর পরিচয় এক শতাব্দীর। কেউ হয়তো চেনেন সালাহুদ্দীন আয়ুবীর সুবাদে। সিরাতের পাঠক জানেন প্রিয়নবীর মেরাজের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতার কথা। মুসলিম-খৃস্টান-ইহুদি– সবাই একে চেনে বায়তুল মোকাদ্দাসের ইতিহাস দিয়ে। বর্তমান ইসরঈল, প্রাচীন কেনান-ফিলিস্তিন। মানুষের কথ্যভাষ্য যখন একটি-দুটি বর্ণের আকার পেতে শুরু করেছে, শব্দের-বাক্যের আলেখ্য হয়ে উঠেছে, তারও আগে থেকে ফিলিস্তিনের প্রতিটি বর্ণে, তার বুকে-পাঁজরে রক্তের ক্ষত।

ফিলিস্তিন হাতবদল হয়েছে অসংখ্যবার। প্রতিটি হাতবদলে সাবেক অধিবাসীদের বিদায় ও নয়া বাসিন্দাদের স্বাগত জানিয়েছে সে রক্তের উপাখ্যানে। এখানকার মাটি-আকাশ বড়ো বড়ো সভ্যতার উত্থান-পতনের সাক্ষী। সভ্যতার প্রতিটি উত্থানে-পতনে, সময়ের প্রতিটি পালাবদলের অপরপিঠে খোদিত যেন

একখণ্ড রক্তাক্ত ফিলিস্তিন। অ্যাসিরিয়, আরামায়িক, কানানি, ব্যাবিলনিক, হেলেনিয়, সেলজুক, গ্রিক, রোমান, সাসানি–নমরুদ-ফেরাউন থেকে নিয়ে ক্রুসেড, নেবুচাদনেজর থেকে হালাকু– প্রতিটি আগ্রাসীর রক্তলোলুপ জিঘাংসার বলি হয়েছে ফিলিস্তিন। ইতিহাসের শত নির্মমতা, নৃশংসতার শত উপাখ্যান তার গায়-গতরে। পরাধীন-স্বাধীন-পরাধীন– এই চক্র যেন তার অবধারিত নিয়তি। শুধু শাসক পরিবর্তনে নয়, এক সভ্যতাকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উপড়ে এখানে জায়গা নিতে চেয়েছে আরেক সভ্যতা। পৃথিবীর চিরায়ত নিয়ম আমরা যাকে বলি, তারচেয়েও বেশি করে ফিলিস্তিন যেন দ্রুততর করেছে পরবর্তীদের পতন। এখানে কারো কীর্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্থায়ী তো নয়ই। পৃথিবীর বহু শহরে-নগরে বিলুপ্ত সভ্যতার বহুকালস্থায়ী বিস্ময়কর স্থাপত্য, সুরম্য অট্টালিকা কিংবা নিদেনপক্ষে কীর্তি-উৎকর্ষের ছাপ-চিহ্ন দেখা যায়। আমাদের জানাশোনা পৃথিবীর প্রায় সবগুলো সভ্যতা ফিলিস্তিনে বসতি গাড়লেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো স্মৃতিচিহ্ন এখানে আপনি খুঁজে পাবেন না। তবে কি ফিলিস্তিন তার বুকে কাউকে ঠাঁই দিতে নারাজ?

ফিলিস্তিনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে জনপদটি মাত্র একবারই রক্তপাতহীন হাতবদল হয়। সাহাবায়ে কেরামের হাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে মুসলিমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের অধিকার লাভ করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উম্মতের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু কদম রাখেন এই মাটিতে।

দাউদ ও সোলায়মান আলাইহিমুস সালামের যুগকে ইহুদিরা বলে 'স্বর্ণযুগ'। আমরা বলি, ঈমানদারদের যুগ। এর সঙ্গে মুসলিম

শাসনের সময়টুকু যোগ করুন। এতোটুকু বাদে পুরো ফিলিস্তিনের ইতিহাস অশ্রু ও বেদনার। সাড়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে এর অধিবাসীরা বরাবরই ক্ষত-বিক্ষত। মানবসভ্যতার শেষ মহাযুদ্ধ, মুসলিমদের মালহামা-খৃস্টানদের আরমাগেদন- সংঘটিত হবে এই ভূখণ্ডকে ঘিরেই। নির্মম গণহত্যা ও চূড়ান্ত নৃশংসতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মুক্তির পথ রচিত হবে এখান থেকেই। শুধু মানুষ নয়, এই মহারণে অংশ নেবে জড়পদার্থও। রক্তের আকরে, রক্তের সাগরে ধুয়ে পবিত্র হবে ফিলিস্তিন। শুদ্ধ হবে মানবতা। এই আমাদের- 'রক্তের-আকরে লেখা ফিলিস্তিন'! প্রিয় ফিলিস্তিন!

- *ডিসেম্বর ২০১৭*

নোট : আকর শব্দের ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে বোদ্ধামহলে খানিকটা সংশয় থাকায় নতুন সংস্করণে নাম পরিবর্তন করে 'রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন' করা হয়েছে।

দওলাত ফিলিস্তিন

রাজধানী : জেরুসালেম

প্রশাসনিক কেন্দ্র : রামাল্লা, পশ্চিম তীর

বৃহত্তম শহর : গাজা উপত্যকা

রাষ্ট্রীয় ভাষা : আরবি

জাতীয় সংগীত : ফেদায়ী (*My Redemption*)

সরকার : আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত

রাষ্ট্রপতি : মাহমুদ আব্বাস

প্রধানমন্ত্রী : ড. ইবরাহিম মোহাম্মদ শতিয়াহ

পারলামেন্ট স্পিকার : সেলিম জানাউন

আইন-সভা : জাতীয় পরিষদ

স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮

ইউএনজিএ রেজল্যুশন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র : ২৯ নভেম্বর, ২০১২

ইসরাঈলি জবরদখল : চলমান

মোট আয়তন : ৬,০২০ কিমি. (২,৩২৪.৩৪ বর্গমাইল)

পানি (%) : ৩.৫

পশ্চিম তীর : ৫,৬৫৫ কিমি.

গাজা ভূখণ্ডের আয়তন : ৩৬৫ কিমি.

জনসংখ্যা : (২০১৬, আনুমানিক) ৪৮,১৬,৫০৩ (বিশ্বের ১২৩তম)

ঘনত্ব : ৮০০/কিমি (২,০৭২/বর্গমাইল)

জিডিপি (পিপিপি) : ৳১১.৯৫ বিলিয়ন (২০১৪, আনুমানিক)

মাথা-পিছু : ৳২৮১০.৬

গিনি (২০১৩) : ৩৫.৫ (মাধ্যম- ১০৭তম)

এইচডিআই (২০১৪) : ০.৬৭৭ (মাধ্যম- ১১৩তম)

মুদ্রা : মিসরিয় পাউন্ড (*EGP*)

ইসরঈলি শেকেল (*ILS*)

জর্দানিয়ান দিনার (*JOD*)

সময় অঞ্চল : ইইটি (ইউটিসি+২)

গ্রীষ্মকালীন (ডিএসটি) : ইইএসটি (ইউটিসি+৩)

তারিখ বিন্যাস : দিন-মাস-বছর (*dd/mm/yyyy*)

ড্রাইভের দিক : ডানদিকে

কলিং কোড : +৯৭০

আইএসও ৩১৬৬ কোড : পিএস (*PS*)

ইন্টারনেট টিএলডি : ডটপিএস (*.ps*)

(তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া)

নোট : নির্ধারিত এই সীমারেখা বা জাতীয়তার ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই।
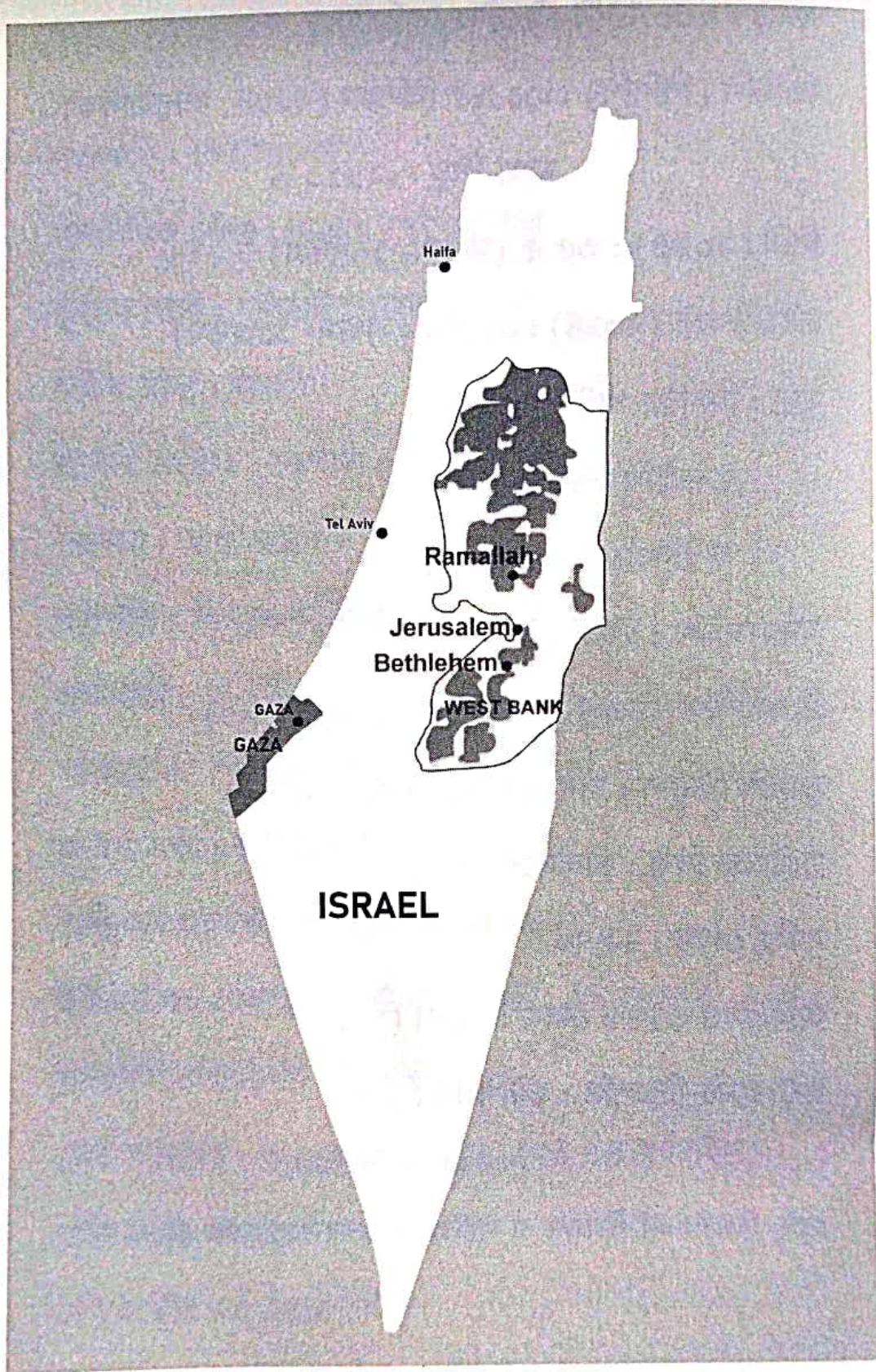
জবরদখলকৃত *ফিলিস্তিনের* মানচিত্র। সাদা অংশ ইহুদি ইসরাঈল। কালো অংশ ফিলিস্তিন।

"

এখানে, এই পাহাড়ের ঢালে, সন্ধ্যা আর সময়ের কামানের সামনে

ভাঙাচোরা ছায়ার বাগান পাশে রেখে,

আমরা তা-ই করি যা বন্দিদের করণীয়,

যা করে বেকারেরা;

আশার আবাদ করি।

একটা দেশ প্রস্তুত প্রত্যুষের জন্য। আমরা এগোচ্ছি

সহজ সরলতায়

নিকট থেকে দেখতে পাচ্ছি বিজয়ের ক্ষণ;

বোমাবর্ষণের আলোয় জ্বলে না আমাদের কোনো রাত্রি,

শত্রুরা সতর্ক; আমাদের জন্য আলো জ্বালে

কারাপ্রকোষ্ঠের অন্ধকারে।

এখানে কোথাও 'আমি' নাই।

এখানে আদম স্মরণ করছে তার কাদার কণিকা।

মৃত্যুর কিনার থেকে আদম বলেন;

হারানোর মতো আর কোনো অবশেষ নাই আমার;

আমি মুক্ত; অবকাশের প্রায় কাছাকাছি।

হাতের মুষ্টিতে সমাহিত আমার ভবিষ্যৎ।

শীঘ্রই দেখবো আমি আমার জীবন,

জন্ম নেবো মুক্ত, আর পিতামাতাহীন,

এবং যেমন আমার নাম, আমি বেছে নেবো মহানীল অক্ষর।

-মাহমুদ দারবিশ (১৯৪২-৯ আগস্ট ২০০৮)

সূচিপত্র

রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন

'আপনি যদি জানতে চান বায়তুল মোকাদ্দাসে আমাদের হাতে বন্দীদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, তাহলে এটুকু জেনে নিন, 'আমাদের সৈন্যরা সোলায়মান মন্দিরে পৌঁছেছে মুসলমানদের রক্তের গভীর স্রোত পার হয়ে। রক্তে ডুবে গিয়েছে ঘোড়ার উরু...'

প্রাচীন ফিলিস্তিন

প্রাচীনকালে *কেনান* নামে পরিচিত ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডের আয়তন আড়াই হাজার বর্গমাইল। ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের বর্তমান মিসর, জর্দান, সিরিয়া ও লেবাননের পাশে অবস্থিত ফিলিস্তিন একটি উর্বর ও ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়ার দেশ। ফিলিস্তিন আলাদা কোনো দেশ নয়, হাদিসের বর্ণনানুযায়ী এটি 'বিলাদুশ শামের'[১] একটি অংশ। সাইয়্যেদেনা মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের মতো নবীর আর্বিভাব এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সফর ও বসবাসের স্থান ছিল আজকের ফিলিস্তিন[২]। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে দেশটির কৌশলগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। জেরুসালেম বা আল-কুদ্স[৩] ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি পূর্বদিক থেকে 'জায়ন' ও পশ্চিম দিক থেকে 'জয়তুন' পাহাড় দিয়ে ঘেরা। 'জায়ন' অর্থ- 'রৌদ্রোজ্জ্বল'। এ পাহাড়ের নাম তাওরাত ও ইঞ্জিলেও এভাবে বর্ণিত আছে।

---

১ সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, জর্দান ও লেবানন- এই পাঁচটি দেশ নিয়ে গঠিত অঞ্চলটি রোমান আমল ও উসমানি তুর্কি খেলাফত আমল পর্যন্ত পরিচিত ছিল *বিলাদুশ শাম* নামে।

২ বর্তমান ফিলিস্তিনের আল-খলিলে (হেবরন) সাইয়্যেদেনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মাজার রয়েছে।

৩ জেরুসালেম নিয়ে পরিশিষ্ট দেখুন।

ফিলিস্তিনের ঘটনাবহুল ইতিহাসের শুরু নবীগণের কাহিনি দিয়ে। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অন্য নাম *ইসরঈল*। হিব্রু ইসরঈলের বাংলা অর্থ, 'আল্লাহর বান্দা'। *বনি ইসরঈল* ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। খৃস্টপূর্ব তের শতাব্দী যাবৎ তারা মিসরে ক্ষমতাধর ছিল। ফেরাউনের রাজত্বকালে মিসরে ইসরঈলিদের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। দেশটিতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আগমনের প্রায় চারশ তিরিশ (৪৩০) বছর পর মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরঈলকে মিসর থেকে প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডে (ফিলিস্তিন) স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেন। যার ধারাবাহিকতা চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সাইয়্যেদেনা মুসা আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিনের জন্য দশ অধ্যায়বিশিষ্ট আসমানি নির্দেশনামা (তাওরাত) আনতে গোত্র ছেড়ে অদৃশ্য হলে বনি ইসরঈল পুনঃ মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। এই অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর পথ হারিয়ে মরুভূমিতে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায় এ সম্প্রদায়। মুসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘ এই সময়েও গোমরাহ এই সম্প্রদায়কে দ্বীনের পথে পরিচালনা থেকে বিরত হননি বা তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেননি। বনি ইসরঈলিরা এসময় বার বার বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছে। মুসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর আল্লাহর নবী ইউশা ইহুদিদেরকে জর্দান থেকে পথ দেখিয়ে প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর থেকে এ সম্প্রদায় যে-কোনো নতুন শহরে উপনীত হতো, সেখানেই চালাত লুটতরাজ ও গণহত্যা। জেরুসালেমের আদিবাসী[৪]-বাদশাহ প্রতিবেশী অন্য পাঁচটি শহরের রাজার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে বনি ইসরঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত প্রতিপক্ষকে বনি ইসরঈলিরা নির্বিচারে হত্যা করে। যদিও ফিলিস্তিনের

---

৪ ফিলিস্তিনের আদিবাসীরা ছিল মাৎস-দেবতার পূজারী। মুসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে মিসর থেকে ইহুদি জাতি *কানানে* হিজরতকালীন ফিলিস্তিন ছিল এদের মজবুত নিয়ন্ত্রণে। এরা ছিল সুদক্ষ যোদ্ধা জাতি। বনি ইসরঈলের নবী তালুত আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে মাৎস-দেবতার পুজারীদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। আদিবাসী রাজা জালুত নিহত হয় দাউদ আলাইহিস সালামের হাতে। এ-ঘটনা পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারায় বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

আদিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে বনি ইসরঈল পরাজিত হয়। এরপর দুই সম্প্রদায়ের মাঝে আরো ক'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষঅবধি বনি ইসরঈল শক্তি ও কূট-কৌশলের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।

সাইয়্যেদেনা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের এক হাজার বছর আগে দাউদ আলাইহিস সালাম তালুতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনের স্থানীয় বাসিন্দাদের হাত থেকে জেরুসালেম শহরটি মুক্ত করেন। দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র সোলায়মান আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে আল্লাহর ঘর বায়তুল মোকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেন। মক্কা মোকাররামায় ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক পবিত্র কা'বা পুনঃনির্মাণের প্রায় এগারো শ' (১১০০) বছর পর এবং ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের নয়শ সত্তুর (৯৭০) বছর আগে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মিত হয়। দাউদ আলাইহিস সালাম পবিত্র কা'বার পুনঃনির্মাতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চৌদ্দতম অধঃস্তন পুরুষ। 'মথি' গসপেল[৫] অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সম্পর্ক আটাশ পুরুষের। পবিত্র কা'বার প্রথম নির্মাতা আদম আলাইহিস সালাম, এরও আগে ফেরেশতা কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের ভিত্তি গাড়েন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, পরবর্তীতে সোলায়মান আলাইহিস সালাম ওই

---

৫ বাইবেলের বর্তমানে চারটি সংস্করণ বহুল প্রচলিত। এগুলোকে একত্রে বলা হয়, *গসপেল* (*Gospel*) বা 'সুসমাচার'। যিশুর (ঈসা) জীবন, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের বিবরণ গসপেল। গসপেলের বহুল প্রচলিত উদাহরণ *নিও টেস্টামেন্ট* বা নতুন নিয়মের চারটি সংস্করণ- মার্ক, লুক, মথি ও জনের লেখা গসপেল। এই চারটি গসপেল ছাড়াও বাইবেলের আরো সংস্করণ রয়েছে। যে গসপেলগুলোতে তাওহিদ বিশ্বাস ও শেষনবী হিসেবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কথা বর্ণিত ছিল হিংসুক খৃস্টান পাদ্রীরা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে বা নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমানে বাইবেলের প্রায় পঁচিশ হাজার সংস্করণ আছে যেগুলোর কোনো দুইটি এক রকমের নয়। (*Stott, John R.W. "Basic Christianity". Inter-Varsity Press, 1971. p. 12 , Keller, Timothy. "The Reason for God". Dutton, 2008. p. 100, Craig Evans, "Life-of-Jesus Research and the Eclipse of Mythology", Theological Studies 54 (1993) p. 5*)

ভিত্তির ওপর একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেন। তাওহিদপন্থীদের কাছে এটি *মসজিদে আকসা* নামে পরিচিত।

মুসার তোরঙ (Trunk)

একটি ছোট্ট গোলাকার তোরঙে নবজাতক মুসাকে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন মা, পরবর্তীতে মুসা আলাইহিস সালাম এই তোরঙে তাঁর নির্দেশাবলি ও ওহির (আল্লাহর প্রত্যাদেশ) লিপিকা বোর্ড, বর্ম ও নবুয়তের নিদর্শনাদি রাখেন। দাউদ আলাইহিস সালামের সময় এর বাইরের ও ভেতরের দিকটিকে সোনার প্রলেপ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয় এবং এটি নিয়ে আসা হয় 'জায়ন' পাহাড়ে। এরপর এই তোরঙকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় একটি ইবাদতগাহ। অল্প কিছুদিনের জন্য এই তোরঙ ফিলিস্তিনের আদিবাসীদের হস্তগত হয়। এরপর পুনরায় তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় বনি ইসরঈলের কাছে। সোলায়মান আলাইহিস সালামের সময় এটি ছিল জায়ন পাহাড়ে। বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের পর একে স্থানান্তর করা হয় আল-কুদসে। সোলায়মান আলাইহিস সালাম রাজত্ব করেন চল্লিশ বছর। বায়তুল মোকাদ্দাসসহ প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে এসময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর বনি ইসরঈল পুনরায় জুলুম-অত্যাচার ও লুটতরাজে জড়িয়ে যায়। এসময় তাদের রাজ্য ভেঙে পড়ে।

খৃস্টপূর্ব ৭৩০ অব্দে সম্রাট 'সালমানেস' ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করে এবং ইহুদিদের পরিবর্তে জেরুসালেমে ব্যবিলনীদের অভিবাসিত করে। ফলে এই অঞ্চলের ইহুদিরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। খৃস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে রাজা 'বুখতন্নাছেরে'র সময় আশুরি সম্প্রদায়ের হামলার ফলে অবশিষ্ট ইহুদি কতৃত্ব ভেঙে পড়ে এবং ইহুদি গোত্রগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বহু ইহুদি আশুরিদের হাতে দাস হিসেবে নিগৃহীত হয়। আগ্রাসীরা সোলায়মান আলাইহিস সালামের ইবাদতখানাটিও ধ্বংস করে দেয়।

বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের ৪৮০ বছর পূর্বে (খৃস্টপূর্ব প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে) ইউশা বিন নুনের নেতৃত্বে বনি ইসরঈলের (ইহুদি সম্প্রদায়)

ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডে আগমনের পর থেকে দেশটি আনন্দের মুখ দেখেনি। অদ্যবধি (সাড়ে তিন হাজার বছর) অশান্তির অনলে জ্বলছে ফিলিস্তিনে। ইহুদি সম্প্রদায়ের পরবর্তী নবী- আরমিয়া, আশইয়া ও দানিয়েল আলাইহিমুস সালাম জেরুসালেমের ধ্বংস ও বনি ইসরঈলের দুঃখ-কষ্ট, বন্দীত্ব প্রত্যক্ষ করে তাদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়েছেন। তাঁরা ইহুদিদেরকে 'মহান মুক্তিদাতার' আগমনের সুসংবাদ দান করতেন। তাঁদের বাণী, কবিতা ও শ্লোক তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে।

দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পারস্যে (ইরান) বাদশাহ সাইরাসের[৬] উত্থান ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য উল্লসিত হওয়ার উপলক্ষ। বিজয়ের ধারাবাহিকতায় সাইরাস ৫৩৮ খৃস্টপূর্বাব্দে ব্যবিলন দখল করলে বনি ইসরঈল জুলুম থেকে মুক্তি লাভ করে। সাইরাসের বদান্যতায় জেরুসালেম ফেরতের সুযোগ পায়

---

৬ সাইরাস প্রথম *ক্যামবিসেসের* সন্তান। মা *ম্যান্ডেন* মিদিয়ান সম্রাট অস্টিয়েজের কন্যা। জ্যোতিষ গণনায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, রাজকুমারী ম্যান্ডেনের গর্ভে যে পুত্রসন্তানের জন্ম হবে, সে হবে বিদ্রোহী এবং একসময় এই অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতির আসনে বসবে সে। গণকদের এ ভাববাণী ছিল এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা। সাইরাস নামটি প্রাচীন পারসিয়ান শব্দ *কোরস* থেকে এসেছে, যার অর্থ- জ্যোতির্ময় (*like the Sun*)। ইন্দো-ইউরোপিয়ান অর্থে, 'শত্রুর যম' (*humiliator of the enemy*)। ৫৫৮ খৃস্টপূর্বাব্দে পিতা ক্যামবিসেস মারা গেলে ত্রিশ বছর বয়সে সাইরাস সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি সুদক্ষ ও সুসজ্জিত বৃহৎ একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। হঠাৎ করে তার অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পায়। দশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি সমগ্র মাদিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন। এরপর তার রাজ্যসীমা স্বল্পসময়ের মধ্যে পারস্যসহ মেসোপটেমিয়া উপত্যকার উত্তর অংশ, আরমেনিয়া ও এশিয়া-মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিশ বছরের মধ্যে তিনি পূর্বে ইন্ডিস নদী থেকে এজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূ-খণ্ডের অধিপতি হন। ৫৩০ খৃস্টপূর্বাব্দে সাইরাস সেমিনোমাডিকানদের বিদ্রোহ দমনে গিয়ে নিহত হন। সেমিনোমাডিক রাণী টমিরিস তার মাথা কেটে রক্ত ভর্তি চামড়ার থলিতে ফেলে দেন। সাইরাসের সমাধি ইরানে অবস্থিত।

(Jack Martin Balcer (1984). Sparda by the bitter sea: imperial interaction in western Anatolia. Rollinger, Robert, 'The Median "Empire", Herodotus, The Histories, Book I, 440 BC. Tr. by George Rawlinson.)

ইহুদিরা। সম্রাটের ধর্মীয় সম্প্রীতির ফলস্বরূপ আল্লাহর ঘর (আল-কুদস) পুনঃনির্মিত হয়। জেরুসালেমের শান্তিপূর্ণ এই অবস্থা বহাল থাকে রাজা তৃতীয় দারিউসের সময় পর্যন্ত। খৃস্টপূর্ব ৩২৩ সালে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ফানাকিয়া ও পারস্যে আগ্রাসন শুরু করলে পুনরায় এসব দেশে ধ্বংস, গণহত্যা ও লুটতরাজ নেমে আসে। পরবর্তীতে আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিরা ফিলিস্তিনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খৃস্টপূর্ব ৬৩ সাল থেকে এ অঞ্চলে শুরু হয় রোমান আধিপত্য। আরমেনিয়া ও এশিয়ার কিছু অংশ এবং আফ্রিকায় আগ্রাসন চালানোর পর রোমানরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ওপর চড়াও হয়। ৭০ খৃস্টাব্দে রোম-সম্রাটপুত্র টাইটাস ইহুদি বিদ্রোহ দমনে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে জেরুসালেম অবরোধ করে। কয়েক মাসের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ইহুদিরা রোমানদের হাতে পরাভূত হয়। নিহত হয় বারো হাজার ইহুদি। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় জেরুসালেম। ধ্বংস হয় বায়তুল মোকাদ্দাস। প্রাণে বাঁচতে দশ লাখ ইহুদির অধিকাংশ পৃথিবীর নানান দেশে পালিয়ে যায়। রোম সম্রাট হেডারিয়ানস পরবর্তীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুসালেম পুনঃনির্মাণ করলেও বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ইহুদিদের ফিলিস্তিন প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।
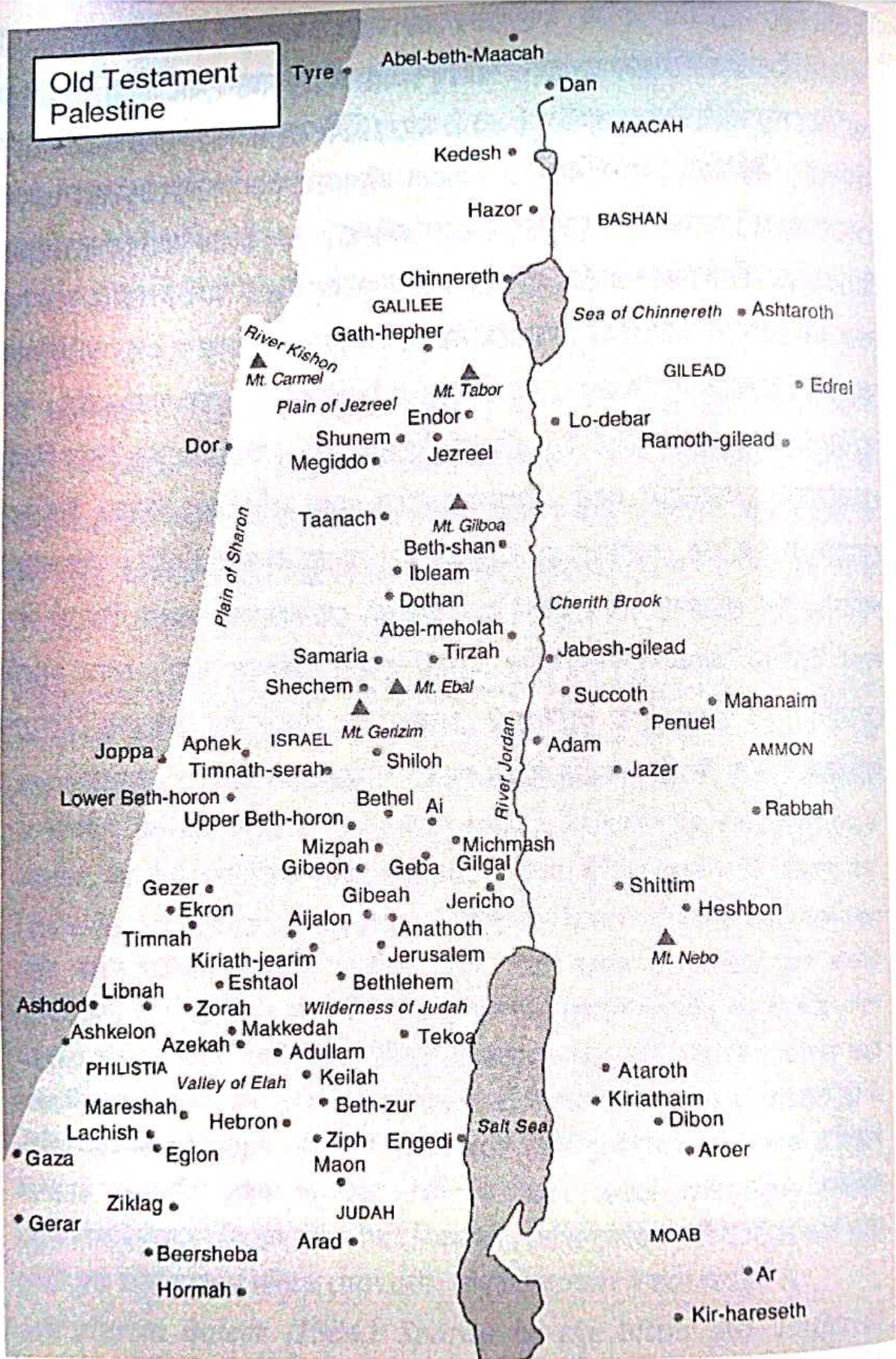
ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত প্রাচীন ফিলিস্তিনের মানচিত্র। ছবি : ইন্টারনেট

ঈসা আলাইহিস সালাম

জুলুম ও বিভীষিকাপূর্ণ জামানায় ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ছিল এই অঞ্চলের জনগণের জন্য আশাজাগানিয়া ঘটনা। ঈসা আলাইহিস সালাম জলিল প্রদেশস্থ নাছেরায় তাঁর পারিবারিক জন্মস্থান ছেড়ে হাওয়ারি নিয়ে জেরুসালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি প্রচুর মোজেজা প্রদর্শন করেন। বিকৃত বাইবেলে (ইঞ্জিল) এসবের বিবরণ রয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম জেরুসালেমে অবস্থিত ইবাদতগাহে (বায়তুল মোকাদ্দাস) নিয়মিত যাতায়াত করতেন। জনগণকে তিনি তাওহিদ শিক্ষা দিতেন। ইহুদি ধর্মযাজকেরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আধিপত্য ও কর্তৃত্বের পথে বাধা মনে করে তাঁর বিরুদ্ধে লিপ্ত হয় ষড়যন্ত্রে। নানামুখী চক্রান্তের শেষ অংকে ইহুদি পারিষদের[৭] ফতোয়া ও চাপে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডের রোমান শাসক তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা চালায়। এ সম্পর্কে কোরআন মজিদে বলা হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

'মসিহকে ওরা হত্যাও করতে পারেনি, ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি। বরং ওদের কাছে এরকমই প্রতিভাত হয়েছে।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭)

---

৭ খৃস্টপূর্ব ৬৪ অব্দে ইহুদি হেরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পৌত্তলিক রোমানরা ফিলিস্তিনে দখলদারী প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এই দালালির ফলস্বরূপ ফিলিস্তিন কিছুকাল ইহুদি হেরদের শাসনাধীনে থাকে। হেরদ ছিল মূর্তি-সংস্কৃতিপ্রেমী। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতায় ইহুদিরা বিদ্রোহের শঙ্কা তৈরি করলে রোমানরা তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়ত প্রচারের সময়টিতে মোটামুটি সংখ্যক ইহুদি রোমান ফিলিস্তিনে পুনরায় বসতি গাড়ে। ইহুদি ধর্মযাজকদের পরিষদটি *ইহুদি পারিষদ* নামে পরিচিত ছিল।

একসময় ঈসা মসিহ'র প্রচুর অনুসারী জন্ম নেয়। কালক্রমে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন[৮] খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে রোমান শাসকগোষ্ঠী ও সাধারণ খৃস্টানেরা ইহুদিদেরকে ঈসা আলাইহিস সালামের খুনী হিসেবে চিহ্নিত করে (তাদের ভাষায় শুলে চড়ানোর ঘটনায়) ইহুদিদের প্রতি রূঢ় আচরণ শুরু করে। এর ফলে একের পর এক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ইহুদি বিদ্রোহ।

সম্রাট কনস্টান্টাইন (৩০৬-৩৩৭ খৃ.) ঈসা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের প্রায় তিন'শ বছর পর খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলে এটি সরকারি ধর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং জেরুসালেম পুনঃ বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। বেথলেহেমকে (বায়তুল লাহাম) ঈসার জন্মস্থান এবং তাঁর কথিত মাজারের কেন্দ্র মনে করার ফলে জেরুসালেম খৃস্টানদের কেন্দ্রীয় শহর গণ্য হতে থাকে। এখানে নির্মিত হয় বহু গির্জা। পরবর্তী তিন'শ বছর বায়তুল মোকাদ্দাসে ইহুদি উপস্থিতি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

পারস্যে সাসানি (মজুসি) বাদশাহ দ্বিতীয় খসরু'র রাজত্বকালে ইরান ও রোম সম্রাটের মাঝে ৬০৪ খৃস্টাব্দ থেকে ৬৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লড়াই চলে।[৯]

---

৮ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম, নবুওয়তপ্রাপ্তি ও অন্তর্ধানের সময় রোমানরা ছিল পৌত্তলিক ও প্যাগান ধর্মের অনুসারী। রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিরা দীর্ঘ নিপীড়নের শিকার হয়। খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল একই। প্রায় তিনশ বছর তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চলে। রোম সম্রাট হায়দারান ও তিরজানের শাসনামলে খৃস্টধর্মাবলম্বীদেরকে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। কিন্তু নিপীড়নের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য থেকে খৃস্টধর্মকে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। একসময় ব্যাপক জনগোষ্ঠী খৃস্টবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়ে। সাম্রাজ্য খণ্ডিত হওয়ার শঙ্কায় সম্রাট কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট ৩১৬ সালে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট কনস্টান্টাইনের জন্ম ২৮০ সালে। তিনি খৃস্টধর্মের 'পোলবাদে' ঈমান এনেছিলেন, যা শিরকে পূর্ণ ছিল। পোপ জনপল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী মুশরিক ছিলেন। ফলে ইউরোপে শুরুতেই খৃস্টধর্ম প্রবেশ করে ভেজালরূপে।

৯ ফিলিস্তিনে মুসলিম বিজয়ের ২৩ বছর পূর্বে ৬১৪ সালে শেষ বাইজেন্টাইন-সাসানি যুদ্ধের সময় ইরানি সেনাবাহিনী শাহর বারাজের নেতৃত্বে জেরুসালেম আক্রমণ করে। পারসিকরা শহরে লুটপাট চালিয়ে বহু খৃস্টানকে হত্যা করে। *চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার* ধ্বংস ও এর ক্রুশ খুলে তিসফুন নিয়ে যায় পারস্যের বাহিনী। এই অভিযানে ইহুদিরা ছিল পারসিকদের সহযোগী।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ইরানি সৈন্যরা রোমানদের পরাজিত করে শামের দখল নেয়। সম্রাট খসরুর মৃত্যুর পর রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়। পবিত্র কোরআনের সুরা রোমে এব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

জেরুসালেম; ইসলামি-যুগ

জেরুসালেম মুসলমানদের নিকট 'আল-কুদস' নামে পরিচিত। 'কুদস' শব্দের অর্থ, 'পবিত্র'। এখানে আছে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ, পবিত্র কোরআনে যাকে *আল-আকসা* বলা হয়েছে। 'আকসা' শব্দের অর্থ 'দূরবর্তী'। সম্ভবত মক্কা থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা একে 'মসজিদে আকসা' নামে অভিহিত করেছেন।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন 'মসজিদে হারাম' থেকে 'মসজিদে আকসা' পর্যন্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত রেখে দিয়েছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা বনি ইসরঈল, আয়াত : ১)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির সময় পারসিক মজুসিরা শাম দখল করে কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায় পৌছে। কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে ৬২২ থেকে ৬২৭ সাল নাগাদ রোমানরা তাদের পরাজিত করে শাম পুনরুদ্ধার করলে তারা আগের সীমানায় ফিরতে বাধ্য হয়। এর আগে ৬১৯ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মারাত্মক পরাজয়ের সম্মুখীন ও এর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে।

মুসলিমদের নিকট আল-কুদসের রয়েছে অসামান্য মর্যাদা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে জানা যায়, 'আল-কুদসের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো নবী নামাজ পড়েননি বা ফেরেশতা দাঁড়াননি।' (তিরমিযি)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত লাভের পরবর্তী তের বছর নবীজী মক্কায় বসবাস করেন। এসময় মুসলমানরা মসজিদুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে মদিনার নিকটবর্তী বনি সালমা মসজিদে নবীজী সাহাবিদের নিয়ে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মসজিদুল আকসার পরিবর্তে মসজিদুল হারামকে (পবিত্র কা'বা) কেবলায় পরিণত করেন। ইসলামে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে ইবাদতের নিয়তে সফরের অনুমতি রয়েছে- মসজিদে আকসা, মসজিদে হারাম (মক্কা) ও মসজিদে নববী (মদিনা)। (বুখারি : হাদিস নং- ১১৮৯, মুসলিম : হাদিস নং- ১৩৯৭)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু সিরিয়া-ফিলিস্তিনে রোমান শত্রুদের দমনার্থে খেলাফত কেন্দ্র থেকে সেনা-অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম খলিফার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সময় বিলাদুশ শাম মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অবসান ঘটে রোমান আধিপত্যের। এসময় থেকে জেরুসালেমের ইসলামি যুগের সূচনা।

সফ্রেনিয়াসের আত্মসমর্পণ, জেরুসালেম বিজয়

৬৩৪ সালে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ায় সেনা অভিযান জোরদার করেন। ৬৩৬ সাল নাগাদ রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারে বড়োসড়ো অভিযান শুরু করে। এই বছরের আগস্টে ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অক্টোবরের শুরুতে সিরিয়ায় নিযুক্ত ইসলামি সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ *আমিনুল উম্মাহ* আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু খলিফার নির্দেশে

ফিলিস্তিনে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেন। জাবিয়া থেকে জেরুসালেমের উদ্দেশে মার্চ করে ইসলামি বাহিনী। নভেম্বরের প্রথমদিকে ইসলামি যোদ্ধারা জেরুসালেমের নগরপ্রান্তে উপনীত হন। বাইজেন্টাইন বাহিনী নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়। ইয়ারমুক যুদ্ধের পর জেরুসালেম সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইসলামি যোদ্ধারা শহরের সমস্ত প্রবেশপথ দখল করে পার্শ্ববর্তী পেল্লা ও বসরা দখল করলে শহরটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পারসিকদের নিকট থেকে জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের পর হেরাক্লিয়াস এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করেছিলেন। ইয়ারমুক পরাজয়ের পর শহরের রোমান গভর্নর পেট্রিয়াক সফ্রেনিয়াস এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পুনঃসংস্কার করেন। পবিত্র ভূমির (ارض المقدس) মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামি যোদ্ধারা রক্তপাত এড়াতে শহরের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের বদলে অপেক্ষা করছিলেন খৃস্টান বাহিনীর রসদ ঘাটতির। অন্যদিকে চার মাস অবরুদ্ধ থাকার পর রোমানরা হেরাক্লিয়াসের কাছ থেকে সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে জিজিয়ার শর্তে আত্মসমর্পনে সম্মত হয়। সফ্রেনিয়াস শর্তারোপ করেন খলিফাকে নিজে এসে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। খৃস্টানদের এই শর্ত মোতাবেক খলিফা দারুল খেলাফত (মদিনা তাইয়্যেবা) থেকে জেরুসালেম যাত্রা করেন। ৬৩৭ সালের এপ্রিলে শত শত মাইল মরুসাগর পাড়ি দিয়ে খলিফা পৌছেন ফিলিস্তিনে। সাদাসিধে পোশাকে উটের লাগাম হাতে একজনমাত্র ভৃত্য সহযোগে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু শহরে প্রবেশ করলে নগরবাসী বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। সানন্দে তারা খলিফার সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। জিজিয়ার বিনিময়ে ভিনধর্মীদের নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। মুসলিম পক্ষে খলিফা ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বাক্ষর করেন চুক্তিপত্রে। খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস, আব্দুর রহমান বিন আওফ ও মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুম হন চুক্তির সাক্ষী। খৃস্টান পক্ষে ছিলেন সফ্রেনিয়াস ও অন্যান্যরা। ছয়'শ বছরের নিপীড়নমূলক রোমান শাসনের পর জেরুসালেম ১৫ হিজরি মোতাবেক ৬৩৭ খৃস্টাব্দে কাগজে-কলমে মুসলিমদের অধিকারে আসে এবং এই প্রথম ইহুদিরা এখানে 'নাগরিক' হিসেবে বসবাস ও উপাসনার অনুমতি পায়।

সাইয়্যেদেনা ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ'র নামে ঘোষণা করা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মু'মেনীন ওমর জেরুসালেমের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তাদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ, শহরের সুস্থ-অসুস্থ ও তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। মুসলিমরা তাদের গির্জা দখল বা ধ্বংস করবে না। তাদের জীবন এবং যে ভূমিতে তারা বসবাস করছে, তাদের ক্রুশ অথবা সম্পদ- ধ্বংস করা হবে না কোনোকিছুই। ধর্মান্তরিত করা হবে না জোরজবরদস্তি। কোনো ইহুদি তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না জেরুসালেম।

জেরুসালমবাসী অন্যান্য শহরের মানুষের মতোই জিজিয়া (ট্যাক্স) প্রদান করবে এবং অবশ্যই বাইজেন্টাইন ও লুটেরাদের বিতাড়িত করতে হবে। জেরুসালেমের যেসব বাসিন্দা বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক, গির্জা ও ক্রুশ ছেড়ে নিজের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে চায়, আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পাবে। গ্রামের অধিবাসীরা চাইলে শহরে থেকে যেতে পারে এই শর্তে, শহরের অন্যান্য নাগরিকের মতো তাদেরকেও জিজিয়া প্রদান করতে হবে। যার ইচ্ছে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে পারে। যার ইচ্ছে থেকে যেতে পারে নিজের পরিজনদের কাছে। ফসল কাটার আগে তাদের থেকে নেওয়া হবে না কিছুই।

> চুক্তি অনুযায়ী যদি তারা জিজিয়া প্রদান করে, তাহলে এই চুক্তির অধীনস্ত শর্তসমূহ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁর নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের ন্যায় সমস্ত খলিফা এবং ঈমানদারদের পবিত্র কর্তব্য বলে ধর্তব্য।[১০]

লিখিত বিভিন্ন মুসলিম দলিল মোতাবেক যোহরের নামাজের সময় সফ্রেনিয়াস ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে *চার্চ অব দ্য হলি সেপালচারে* নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এমন করার ফলে ভবিষ্যতে মুসলিমরা চুক্তি ভঙ্গ করে একে মসজিদে পরিণত করবে এই আশঙ্কায় ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাতে সম্মত হননি। জেরুসালেমে দশদিন অবস্থান করার পর খলিফা মদিনা তাইয়্যেবা ফিরে আসেন। জেরুসালেমে অবস্থানের সময় সফ্রেনিয়াস ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বেশ কিছু পবিত্র স্থান দেখাতে নিয়ে যান। এর মধ্যে *টেম্পল মাউন্ট*ও ছিল। এর দূরাবস্থা দেখে তিনি এখানকার জঞ্জাল ও ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে একটি কাঠের মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। গলের বিশপ *আরকালফ* ৬৭৯ থেকে ৬৮২'র মধ্যে জেরুসালেম ভ্রমণের সময় তার দেখা মসজিদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, এর বীমগুলো কাঠের তৈরি ও এটি নির্মাণ করা হয়েছিল পুরনো ধ্বংসাবশেষের ওপর। এখানে একসঙ্গে ৩,০০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারতেন। জেরুসালেম বিজয়ের ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর ৬৯১ সালে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক এটি পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীতে উসমানি খেলাফতকালে মসজিদটির আরো সংস্কার হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-আকসার বর্তমান কাঠামোটিও নির্মিত হয়েছে মুসলিম আমলে।

---

১০ তারিখে তাবারি : *The Great Arab Conquests*

কুব্বাতুস সাখরা (মসজিদে ওমর, ওপরে বামে) ও বায়তুল মোকাদ্দাস (ডানে)। ছবি : ইন্টারনেট

ক্রুসেড আগ্রাসন

১০৯৫ খৃস্টাব্দে (৪৮৮ হিজরি) ইউরোপিয় খৃস্টান সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালালে শুরু হয় ক্রুসেড যুদ্ধ এবং এ সংঘাত অব্যাহত থাকে পরবর্তী দু'শ বছর। ইউরোপিয় সন্ত্রাসীদের এসব আগ্রাসনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পাশ্চত্যে মুসলমানদের অতীত বিজয়াভিযানের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং প্রাচ্যের (মুসলিম ভূমির) সম্পদ-ভাণ্ডারের প্রতি লালসা। এছাড়া পাদ্রীদের তরফে ঈসার পবিত্র মাটি জেয়ারতের মাধ্যমে বেহেশতগমণও একটি উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়। ঐতিহাসিকেরা ক্রুসেড যুদ্ধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন- ফিলিস্তিন ও বায়তুল মোকাদ্দাস ইস্যু, মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানদের নিরাপত্তা কর (জিজিয়া) ও তাদের সঙ্গে কল্পিত অসদাচারণের প্রোপাগান্ডাকে।

মধ্যযুগে (৩৯৫ খৃ.) প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য *পশ্চিম রোম* ও *পূর্ব রোমে* বিভক্ত হওয়ার পর থেকে ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহর[১১] হাতে কনস্টান্টিনোপল[১২] (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের আগ পর্যন্ত ইউরোপ ছিল গির্জার

---

১১ সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ বিন দ্বিতীয় মুরাদ বা সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, জন্ম : ২০ এপ্রিল ১৪২৯। মৃত্যু : ৩ মে ১৪৮১। উসমানি সাম্রাজ্যের সপ্তম সুলতান। 'আল-ফাতেহ' (বিজয়ী) ও 'আবুল খায়রাত' (কল্যাণের পিতা) তাঁর উপাধি। প্রায় তিরিশ বছর তিনি মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের উৎস ছিলেন। ১৬ মুহররম ৮৫৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৫১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি উসমানি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময় তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর। ব্যক্তিত্ববোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি, সততা ও নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অনন্য। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ ছিলেন একজন মুজাহিদ সুলতান, যাঁর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়-

لتفتحن القسطنطنية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش

'নিশ্চয়ই তোমরা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে। তার আমির উত্তম আমির হবেন এবং সে বাহিনী উৎকৃষ্টতম সেনাবাহিনী হবে।' (বিশর বিন সুহাইম রাদিআল্লাহু আনহুর সূত্রে মুসনাদে আহমদ; ৪/৩৩৫, হাদিস নং : ১৮৯৫৭; মুসতাদরাকে হাকেম ৫/৬০৩, হাদিস নং : ৮৩৪৯; মুজাম কবির, তাবারানি, হাদিস নং : ১২১৬)

১২ 'কনস্টান্টিনোপল' বা 'কস্তুন্তনিয়া' (قسطنطينيه) প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের (পূর্ব বাইজেন্টাইন) রাজধানী। একসময় শহরটি ল্যাতিন ও গ্রিক সাম্রাজ্যেরও রাজধানী ছিল। ৩২৪ খৃস্টাব্দে বাইজেন্টিয়ানের সম্রাট কনস্টান্টাইন শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে এটি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে মজবুত দুর্গবেষ্টিত শহর। এর তিনদিক দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত ও একদিক সমুদ্রবেষ্টিত। কনস্টান্টাইনের নামে শহরটির নাম হয় *কনস্টান্টিনোপল*। ১২ শতকে এটি ইউরোপের সুবৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ধনী শহর ছিল। ১৪৫৩ সালের ২৯ মে উসমানি বাহিনী কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে দেড় হাজার বছরের মতো টিকে থাকা রোমান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উসমানিয়দের এই বিজয়ের ফলে তাদের সামনে ইউরোপে অগ্রসর হওয়ার পথের সমস্ত বাধা অপসারিত হয়। বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মদ তাঁর রাজধানী এড্রিনোপল থেকে সরিয়ে কনস্টান্টিনোপল নিয়ে আসেন। সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে শহরটি বিজয়ের চেষ্টা চলছিল। যদিও অনেক পরে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ এতে সফল হন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কনস্টান্টিনোপল দু'বার বিজিত হবে। প্রথমবার সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহর হাতে বিজিত হয়েছে এবং শেষবার মাহদির

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মূলকেন্দ্র। গির্জাবাদে[১৩] পোপ হচ্ছেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ১০০০ খৃস্টাব্দের পর থেকে পোপ (খৃস্টান ধর্মগুরু) যুদ্ধ বাধাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পাদ্রীদের (খৃস্টান ধর্মজ্ঞো) মাধ্যমে রটিয়ে দেয়, ফিলিস্তিনে ঈসা আলাইহিস সালামের আর্বিভাবের[১৪] নিদর্শনাদি প্রকাশ পেয়েছে। দলে দলে খৃস্টান ঈসার আবির্ভাব দেখতে বায়তুল মোকাদ্দাসের

আগমনের পর মুজাহেদীনের হাতে আসবে এর অধিকার। বিস্তারিত দেখুন- নু'য়াইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহকৃত 'আল-ফিতান'।

১৩ সম্রাট *কনস্টান্টাইনের* খৃস্টধর্ম গ্রহণ রোমের সম্রাটকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে গির্জাকেন্দ্রিক শাসনে পরিণত করে। গির্জাবাদে ক্ষমতার মূল 'পোপ'। 'পোপ' শব্দের অর্থ, 'পিতা'। পোপকে ক্যাথলিকরা পিতৃতুল্য মনে করে। পশ্চিমে শাসনক্ষমতার মূল 'পোপতন্ত্র' বা 'গির্জাবাদ'। বর্তমানেও পশ্চিমাদের গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিনির্ধারণী বহু বিষয়ে গির্জার প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে। গির্জাবাদে ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পাদ্রীরা নিয়ন্ত্রণ করেন, যারা নিজের প্রয়োজনমাফিক ধর্মীয় বিধান রচনা করতে পারেন। এদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রোমের বিশপ। যার উপাধি, 'পোপ'। শক্তিমত্তার দিক থেকে কোনো কোনো পোপ রোমান সম্রাট অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাধর ছিলেন। (পোপতন্ত্র নিয়ে সুরা তাওবার ৩১নং আয়াতে আলোচনা আছে। আগ্রহীরা তফসির দেখতে পারেন)।

১৪ খৃস্টধর্মে শেষজামানায় 'প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার' আবির্ভাবের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মথি বাইবেলের ২৪তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'আকাশে বিদ্যুতের চমক যেমন পূর্বদিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, মানুষের সন্তানের বিষয়টিও সেরূপ হবে। মানুষের সন্তান আকাশের মেঘে চড়ে বিপুল শক্তি নিয়ে আসছেন।... সজাগ থাক, কারণ তোমরা জান না ঠিক কোন সময় তোমাদের নেতা আসবেন।' লুকের গসপেলে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কোমরগুলো বেঁধে রাখো এবং বাতিগুলো জ্বালিয়ে রাখ। তোমরা তাদের মতো হও যারা নিজ নেতার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছে, যাতে যখনই তিনি আসেন আর দরজায় করাঘাত করেন তখনই তোমরা তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পার।' খৃস্টীয় বিশ্বাসে সহস্রাব্দের সূচনায় ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার ধারণা আছে যিনি এন্টিখ্রাইস্টের সঙ্গে লড়াই করবেন। এই আবির্ভাবকে খৃস্টানরা 'মিলেনিয়াম' বলে। যিশুর অন্তর্ধানের প্রথম সহস্রাব্দে খৃস্টসমাজ ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বে রক্ত নদী বইয়ে দেয়। ২০০১ সালে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে আগ্রাসী হামলা শুরু করে যুগের *হুবাল* আমেরিকা। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানে আক্রমণকে 'ক্রুসেড' বলে ঘোষণা করে।

উদ্দেশে রওয়ানা হয় এবং এ সুযোগে পাদ্রীরাও তাঁর আগমনকে বছরের পর বছর পেছাতে থাকে। ফলে ফিলিস্তিনগামী জনতার সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে মিলিয়নে[১৫] পৌছে। ষড়যন্ত্রের শুরুর দিকে একজন পাদ্রী সাতশ' তীর্থযাত্রী নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু সাইপ্রাস হয়ে ইউরোপে ফিরে গিয়ে সে গুজব রটিয়ে দেয়, 'মুসলমানেরা তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি'। এসব কল্পকাহিনী ও ষড়যন্ত্র ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পাদ্রীদের প্রচার-প্ররোচনায় প্রথম ক্রুসেডে নাইটদের[১৬] সঙ্গে আল-কুদসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় লাখ লাখ দরিদ্র ও নিঃস্ব খৃস্টান। তিন বছরের ক্রমাগত পথচলা, যুদ্ধ ও লুটতরাজের পর চল্লিশ হাজার সন্ত্রাসী বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছায়। বাকিরা যুদ্ধ অথবা ক্ষুধা ও মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ে।০

খৃস্টান সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত গণহত্যা

দীর্ঘ অবরোধের পর তীব্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রবেশ করে ক্রুসেড বাহিনী। শহরে প্রবেশ করে নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে সন্ত্রাসীরা। ক্রুসেড বাহিনীর অধিনায়ক গডফ্রে[১৭] বিজয়ের পর পোপের

---

১৫ দশ লাখে এক মিলিয়ন।

১৬ সামরিক দলপতি।

১৭ গডফ্রে অব বুইলোঁ (*Godfrey of Bouillon*) ফরাসি ক্রুসেডার। জন্ম ১৮ সেপ্টেম্বর ১০৬০, মৃত্যু ১৮ জুলাই ১১০০ খৃ.। নৃশংস এই খুনীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম ক্রুসেডে সাত লাখ খৃস্টান সন্ত্রাসী কনস্টান্টিনোপলের পথে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে। সেলজুক সুলতান আরসালান দাউদ খৃস্টান বাহিনীর গতিরোধ করতে গিয়ে পরাজিত হন। খৃস্টানরা পুরো এলাকা ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা এন্টিয়ক অবরোধ করে। নয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ক্রুসেডাররা এন্টিয়ক দখল করে ১০৯৮ সালের ৩ জুন। নগরবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাদের মাংশ ভক্ষণ করে ক্রুসেডাররা। খৃস্টান ধর্মজাযকেরা প্রচার করে, যারা মুসলমানদের মাংশ খাবে নিষ্পাপ অবস্থায় 'স্বর্গে' প্রবেশ করবে তারা। ১০৯৯ সালের জুলাইতে ক্রুসেডার দলপতি গডফ্রে মিসরের ফাতেমি শাসক মোস্তফা আলী বিল্লার সেনাপতি ইফতেখার উদ্দৌলাকে পরাজিত করে জেরুসালেম শহর দখল করে সত্তুর হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে।

কাছে লিখিত পত্রে জানায়, 'আপনি যদি জানতে চান বায়তুল মোকাদ্দাসে আমাদের হাতে বন্দীদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, তাহলে এটুকু জেনে নিন, আমাদের সৈন্যরা সোলায়মান মন্দিরে (বায়তুল মোকাদ্দাস) পৌঁছেছে মুসলমানদের রক্তের গভীর স্রোত পার হয়ে। রক্তে ডুবে গিয়েছে ঘোড়ার উরু।'

খৃস্টান সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিন শোষণ করে ৯০ বছর। ১১৪৪ সালে ইরাকের আমির সুলতান নুরুদ্দীন জিংকি রাহিমাহুল্লাহ সন্ত্রাসী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধারে অভিযান শুরু করেন। এসময় খৃস্টান সন্ত্রাসীরা দ্বিতীয় ক্রুসেডের সূচনা ঘটায় (১১৪৭-১১৪৯ খৃ./৫৪২-৫৪৪ হি.)। ১১৮৭ সাল নাগাদ সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহ ক্রুসেডার সন্ত্রাসীদের পরাজিত করে বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন এবং উৎপীড়ক শত্রুকে সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বিতাড়িত করেন। এরপর স্রোতের বেগে ইউরোপ থেকে সৈন্য-সামন্ত ক্রুসেডারদের সঙ্গে যোগ দিলে শুরু হয় নতুন যুদ্ধ, তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২ খৃ./৫৮৫ হি.)। মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ইউরোপিয় সম্রাট ও পোপ পারস্পরিক অনৈক্য ভুলে একতাবদ্ধ হয় এবং ফ্রান্স ও বৃটেনের রাজা যৌথভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ক্রুসেড বাহিনী ইসলামিবিশ্বের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলিমদের খুনের বন্যা বইয়ে দেয়। এসব পৈশাচিক বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ইউরোপিয় ঐতিহাসিক- আলবার মালাহ, গোস্তাভ লোভোন ও অন্যান্যের গ্রন্থে।

গডফ্রে জেরুসালেমের রাজা ঘোষিত হয়। তার আদেশে জেরুসালেমের প্রসিদ্ধ মসজিদ কুব্বাতুস সাখরাকে পরিণত করা হয় গির্জায়। (*Hitti's History of the Arabs-P.639*)
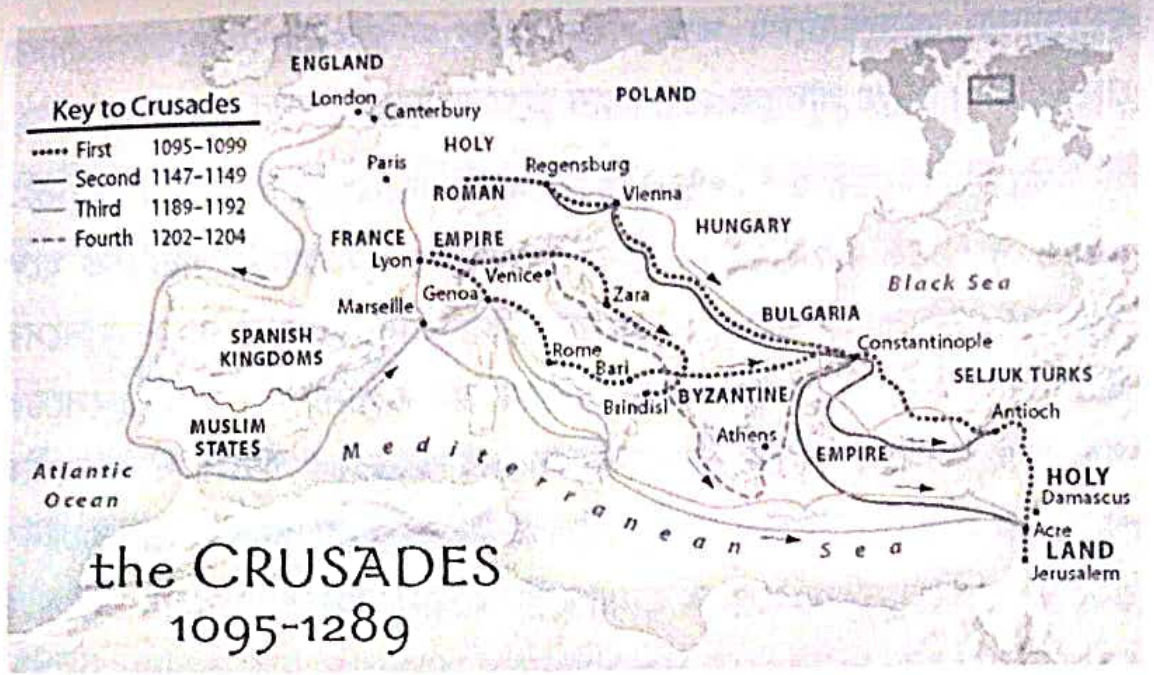
ক্রুসেড সন্ত্রাসের মানচিত্র। ধর্ম-উন্মাদনায় খৃস্টীয় ইউরোপ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিমবিশ্বে।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ইন্তেকালের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আইয়ুবী বংশ। ইউরোপে পোপ ও সম্রাটের মাঝে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব চলার পর শেষপর্যন্ত পোপ তৃতীয় *এ্যনিউসান* মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফতোয়া জারি করে। ফলে তিন বছর সন্ধি চলার পর পুনরায় যুদ্ধের (চতুর্থ ক্রুসেড, ১২০২-১২০৪ খৃ.) আগুন জ্বলে উঠে। ক্রুসেড বাহিনী কনস্টান্টিনোপল দখল করে সেখানে নতুন রাজা বসায়। ১২১৭-১২২১ খৃস্টাব্দে (৬১৪-৬১৮ হিজরি) পোপ এ্যনিউসানের উত্তরাধিকারীর উস্কানিতে শুরু হয় পঞ্চম ক্রুসেড। পোপ ইউরোপিয় রাজাদের প্রতি বায়তুল মোকাদ্দাস 'উদ্ধারের' আহবান জানায়। কিন্তু রাজারা এতে কর্ণপাত না করলে পোপ নিজ উদ্যোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি নেয়। কিন্তু পঞ্চম ক্রুসেডে খৃস্টান সন্ত্রাসীরা পরাজিত হয়ে ইউরোপে বিতাড়িত হয়। ষষ্ঠ ক্রুসেডের উস্কানিদাতা পোপ তৃতীয় *এ্যনারিউস*। জার্মানির রাজা *ফ্রেডারিক* প্রথমত পোপের আহবানে সাড়া দিয়েও শেষে অনুতপ্ত হয়ে পোপের ফতোয়া পরিত্যাগ করে। পোপ তাকে কাফের ফতোয়া দিলে ফ্রেডারিক পোপকে বন্দী করে বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেসময় আইয়ুবী বংশীয় শাসকদের অনৈক্য ও মতভেদের ফলে

মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে সন্ধি করে জেরুসালেম শহর ছেড়ে দেয়। যদিও বায়তুল মোকাদ্দাস তখনো মুসলমানদের হাতে থাকে।

সপ্তম ক্রুসেডের শুরু সেন্ট লুইয়ের মিসর আক্রমণের মধ্য দিয়ে (১২৪৮-১২৫৪ খৃ./৬৪৬-৬৫২ হি.)। গাজা উপত্যকায় খৃস্টবাহিনী পরাজিত হলে নবম লুই প্রতিশোধ গ্রহণে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। বিপুল মুক্তিপণের মাধ্যমে রেহাই পান লুই। সপ্তম ক্রুসেডের পর এবং আইয়ুবী বংশের শেষ সুলতানের ইন্তেকাল ঘটলে দাস বংশীয় শাসকেরা প্রায় তিন'শ বছর বায়তুল মোকাদ্দাসসহ সমগ্র অঞ্চল শাসন করেন। ১২৫৮ সালে মুসলিমবিশ্বে আক্রমণকারী মঙ্গোলবাহিনী[১৮] বাগদাদ ধ্বংস ও

---

১৮ মঙ্গোল আগ্রাসন ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে তমাশাচ্ছন্ন যুগ। ১৩ শতকের মতো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ মুসলিমবিশ্বে আর সংঘটিত হয়নি। মঙ্গোলরা ছিল মধ্য ও উত্তর এশিয়ার যাযাবর জাতি। ধূ ধূ বৃক্ষহীন প্রান্তরে ছিল তাদের বসবাস। বস্তুকেন্দ্রিক বহু ঈশ্বরবাদী মঙ্গোলরা সুবৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই গড়ে তুলতে পারেনি। উত্তর চিনের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মৌখিক চুক্তি ও জোটস্থাপন ছিল মঙ্গোলদের রাষ্ট্রব্যবস্থা। চেঙ্গিস খান মঙ্গোল গোত্রপতি। তার শাসনকালে (১২০৬-১২২৭ খৃ.) মঙ্গোল গোত্রগুলোকে অন্যান্য তুর্কি গোত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয় চেঙ্গিস। এর মাধ্যমে এক সুবৃহৎ ও ঐক্যবদ্ধ দল গড়ে উঠে। মঙ্গোলদের বিজয়ের মূল সূত্র ছিল ত্রাস সৃষ্টি। যেসব শহরের অধিবাসীরা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত জানাতো তাদের নিয়তি দাঁড়াতো নির্মম গণহত্যা। আফগানিস্তানের হেরাত অবরোধ করার পর মঙ্গোলরা অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। ১২৫৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারিতে মঙ্গোল বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করে। অবরোধের দুই সপ্তাহ পর ১০ ফেব্রুয়ারি শহরে প্রবেশ করে মঙ্গোল বাহিনী। এরপর এক সপ্তাহজুড়ে লুঠতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। মসজিদ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি- ধ্বংস করা হয় সবকিছু। বাগদাদের কুতুবখানার বইয়ের কালিতে টাইগ্রিস নদীর পানি কালো রঙ ধারণ করে। এক সপ্তাহের ধ্বংসযজ্ঞে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ১০ লাখ মানুষকে। বসবাসের অযোগ্য ও সম্পূর্ণ জনমানবহীন শহরে পরিণত হয় বাগদাদ। এরপর মঙ্গোলরা দখলে নেয় সিরিয়া ও মিসরের কিছু অংশ। দৃশ্যত তাদের মোকাবেলা করবার মতো কোনো শক্তি ইসলামিবিশ্বে তখন ছিল না। কিন্তু মামলুক সুলতানদের সঙ্গে আইন জালুতে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে থেমে যায় মঙ্গোল বিজয়যাত্রা আর হালাকুর প্রেতাত্মারা ইসলামিবিশ্ব থেকে বিতাড়িত হয় চিরতরে। (*The Mongol Invasion and the Destruction of Baghdad*)

শামের কিছু অংশ দখল করে বায়তুল মোকাদ্দাস দখলের জন্য সেখানে পৌঁছলে মামলুক সুলতানদের[১৯] সঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে। ফিলিস্তিনের *আইন জালুতে* মঙ্গোলবাহিনী পরাজিত হলে মুসলিমবিশ্বে মঙ্গোল বর্বরতার অবসান ঘটে।

উসমানি বংশের উত্থান

মঙ্গোলবাহিনী ও গ্রিকদের সঙ্গে উসমান গাজির দীর্ঘ লড়াই ও একের পর এক বিজয়াভিযানের পর তুরস্কে *উসমানি বংশীয় খেলাফত* প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৯৯ সালে। ৭২৭ হিজরি মোতাবেক ১৩২৬ খৃস্টাব্দে উসমান গাজি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর বংশধরেরা ধারাবাহিকতার সঙ্গে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ খেলাফতের মসনদে আসীন হলে ৮৫৭ হিজরিতে (১৪৫৩ খৃ.) ক্রুসেডারদের শক্তিসামর্থ্যের কেন্দ্র ও পূর্ব রোম-

---

১৯ মামলুক (مملوك) দ্বারা শাসকের 'সম্পত্তি' বা 'অধীনস্ত দাস' বোঝানো হয়। নির্দিষ্টভাবে মামলুক দ্বারা বোঝায়- খাওয়ারিজমি রাজবংশ পারস্য (১০৭৭-১২৩১ খৃ.), মামলুক সালতানাত দিল্লি (১২০৬-১২৯০ খৃ.), মামলুক সালতানাত কায়রো (১২৫০-১৫১৭ খৃ.) ও ইরাকের মামলুক রাজবংশ, উসমানি ইরাকের অধীন (১৭০৪-১৮৩১ খৃ.)।

মিসরের মামলুকরা দীর্ঘস্থায়ী মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দাস সৈনিকদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এই শাসনব্যবস্থা। দাসরা ছিলেন সারকাসিয়ান ও জরজিয় বংশোদ্ভূত। বুরজি মামলুক সালতানাতে বলকান (আলবেনিয়ান, গ্রিক, দক্ষিণ স্লাভিক) বংশোদ্ভূত বহু মামলুক ছিল। সময়ের সঙ্গে মামলুকরা সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। মিসর ছাড়াও লেভান্ত, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে তারা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সুলতানের পদও লাভ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিল স্থানীয় আমির। মিসর ও সিরিয়ায় মামলুকরা সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন যা 'মামলুক সালতানাত' (১২৫০-১৫১৭) নামে পরিচিত। *আইন জালুতের* যুদ্ধে মামলুক সুলতান কুতুয ও তাঁর সেনাপতি বাইবার্স মঙ্গোল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ক্রুসেডারদের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে ১২৯১ সালে মামলুকরা তাদেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। (*Isichei, Elizabeth (১৯৯৭), A History of African Societies to 1870, Cambridge University Press ׀ p: 192*)

সাম্রাজ্যের রাজধানী কস্তুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল-একালের ইস্তাম্বুল) জয় করে ক্রুসেডারদেরকে ইউরোপের ফটক পর্যন্ত তাড়া করেন। খলিফা মুহাম্মদ ফাতেহ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু অঞ্চল উসমানি খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয় ছিল ইউরোপের ইতিহাসে পট-পরিবর্তনের সূচনা। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় যেমন মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এই বিজয়ের ফলে বর্বর ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটে রেঁনেসা (পরিবর্তন) সূচিত হয়।
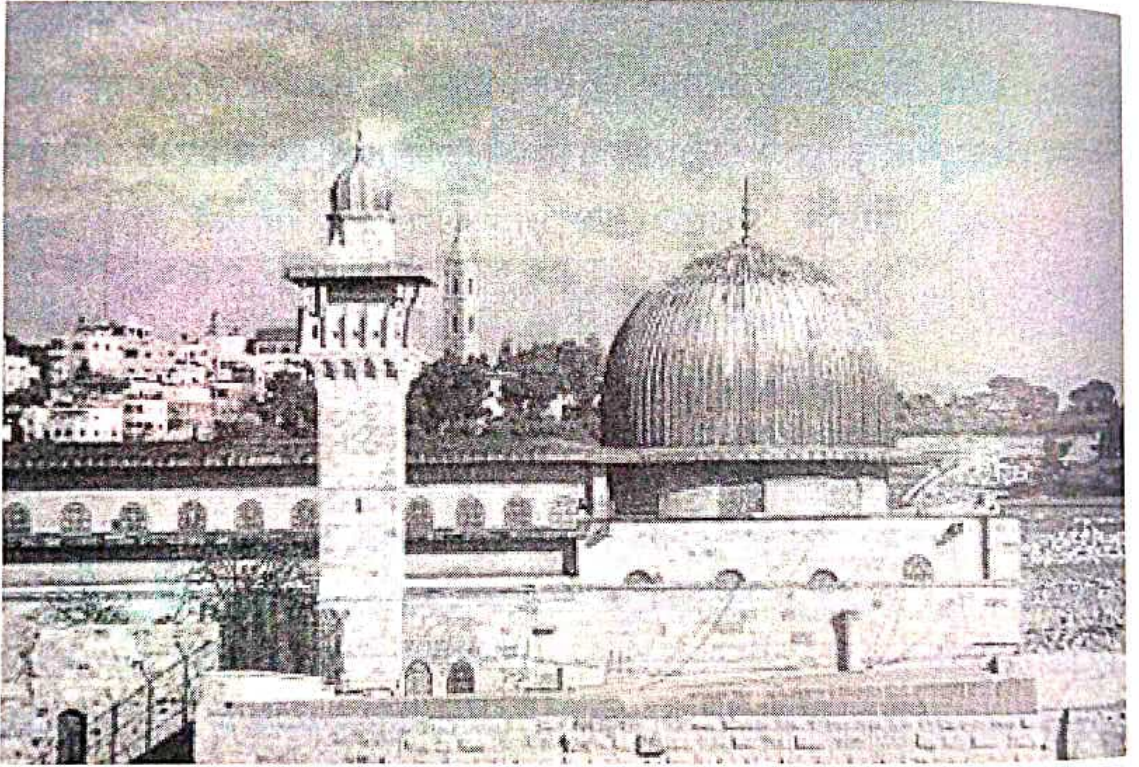
বায়তুল মোকাদ্দাস, জেরুসালেম, ফিলিস্তিন। ছবি : ইন্টারনেট

পাঁচশ' বছর পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী। এসময় উসমানি খেলাফতে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, রাষ্ট্রপরিচালনা, উন্নয়ন-

ব্যবস্থাপনা, শহর স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপিয় সরকারগুলো সব সময়ই উসমানিয়দের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও তটস্থ ছিল।[২০]

শিয়া-তুর্কি সংঘাত

ইরানে সাফাভি রাজবংশের পত্তন[২১], শিয়া মাজহাবকে সরকারি মাজহাব ঘোষণা এবং ইউরোপিয় রাষ্ট্র বিশেষ করে বৃটেনের প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্তে শিয়া ইরান ও উসমানিয়দের মাঝে দু'শ বছর মেয়াদী বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উসমানিয়দের সঙ্গে সন্ধি করার পর ইউরোপ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক (রেঁনেসা) আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুসলিমবিশ্বে তখন বিশাল ও গভীর ফাটল দেখা দেয়। একটি দীর্ঘ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে যায় মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য। ইসলামি সভ্যতা প্রতিরক্ষার বদলে মুসলিমরা জড়িয়ে পড়ে অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও মাজহাবি কলহে।

শিল্প-বিপ্লবের[২২] ফলে ইউরোপের চেহারা রাতারাতি বদলাতে থাকে। ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাজার ছেয়ে যায় বিপুল উৎপাদন ও পণ্য-সামগ্রী দিয়ে।

---

২০ সে যুগের ভূ-মধ্যসাগরকে বলা হতো 'আল বাহরুল উসমানি' (উসমানি সাগর)। নৌ ও সমরশক্তিতে মুসলিমরা ছিল পুরো বিশ্বে অদ্বিতীয়। লোহিত সাগরকে বলা হতো 'হারাম সাগর'। কারণ, এতে ক্রুসেডারদের জাহাজ প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

২১ সাফাভি রাজবংশ পারস্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর অন্যতম। একে আধুনিক পারস্যের ইতিহাসের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই রাজবংশ বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সাফাভি শাসন ১৫০১ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১৭২৯ থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তকালের জন্য তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাফাভি শিয়ারা উসমানিয়দের সঙ্গে প্রায় দুইশ বছর অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল।

২২ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ১৭৫০-১৮৫০ সালে কৃষি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিল্পায়নের গতিসঞ্চারিত হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। ১৫ ও ১৬ শতকের সমুদ্রযাত্রা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। পুঁজিবাদের উদ্ভব, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার, কয়লার খনি ও ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহারে গড়ে উঠে বহু শিল্প-শহর ও কল-কারখানা। একে বলা হয় *শিল্পবিপ্লব*।

নিজস্ব চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত পণ্য তাদের গুদামে পড়ে থাকে। পণ্য বিক্রি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির জন্য দেখা দেয় বিদেশি বাজারের আবশ্যকতা। এভাবে সূচনা ঘটে উপনিবেশিক[২৩] যুগের। ইউরোপিয় সন্ত্রাসীরা এসময় বাইরের জগতের বাজার দখলে শুরু করে সহিংস লড়াই।

ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও 'আরব জাতীয়তাবাদ'

উনবিংশ শতকের শেষদিকে ফিলিস্তিনে কিছু বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দেয়। এসব বিদ্রোহে বৃটিশেরা প্রত্যক্ষ মদদ যোগায়। বৃটিশের গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ এবং শক্তি ও সম্পদের উৎস তখন ভারতবর্ষ।[২৪] ভারতবর্ষকে

---

২৩ উপনিবেশ (*Colony*) এমন একটি স্থান বা এলাকা যা অন্য কোনো দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সহজ কথায় অন্য দেশের দখলদারি ও কর্তৃত্বের শিকার হওয়াকে বলে *উপনিবেশ*। একটি দেশের যখন অনেকগুলো উপনিবেশ থাকে তখন মূল দেশটি *সাম্রাজ্য* হিসেবে পরিচিত হয়। বিশ্বে একসময় বহু উপনিবেশ ছিল যা বর্তমানে স্বাধীন দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। 'উপনিবেশ' বা 'কলোনি' ল্যাতিন শব্দ 'কলোনিয়া' থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রিসে উপনিবেশের নিয়ন্ত্রককে মেট্রোপোলিশ বা *প্রধান নগর* বলা হতো। নিয়ন্ত্রিত রাজ্যরূপে উপনিবেশের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব করার কোনো স্বাধীন স্বত্ত্বা বা অধিকার ছিল না। ষোড়শ শতকের শুরুতে আধুনিক ভারতের অংশবিশেষ পর্তুগালের দখলদারিতে ছিল; যা সমষ্টিগতভাবে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পর্তুগিজ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা ও ভারতবর্ষ একই কায়দায় বৃটিশ কর্তৃক শোষিত হয়।

২৪ ভারতীয় উপমহাদেশ- ভারত, পাকিস্তান, বার্মার কিছু অংশ নিয়ে 'ভারতবর্ষ' গঠিত ছিল। ভারত একক দেশ নয় বরং, অনেকগুলো ছোট-বড়ো রাজ্যের সমষ্টি ছিল। *ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* ১৬১২ সালে ভারতে প্রথম তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এরপর দেড়শ বছর ধরে মোঘল সম্রাটের অনুমতিক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের বাণিজ্যের বিস্তার ঘটায়। ১৭০৭ সালে মোঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতাহ্রাস ও ১৭৫৭ সালে বাংলায় পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির প্রতারণাপূর্ণ বিজয় বৃটিশ ক্রুসেডারদেরকে এ অঞ্চলে দখলদারীর সুযোগ এনে দেয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে এর সমস্ত সম্পত্তিকে বৃটিশ রাজের সম্পত্তি হিসেবে অধিভুক্ত করা হয়। ভারতবর্ষ তিন ধাপে বৃটিশ শোষণের শিকার হয়েছে- ১৭৫৭-১৭৭০ কম্পানি ও দেশিয় নবাবের দ্বৈত-শাসন, ১৭৭০-১৮৫৮ কম্পানি শাসন, ১৮৫৮-১৯৪৭ বৃটিশ রাজের শাসন।

মজবুত কব্জায় রাখতে বৃটিশেরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দখলদারী প্রতিষ্ঠা করে। বৃটিশের ইউরোপিয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে ভারতে হামলা ঠেকানোর জন্য সুয়েজ খালে[২৫] দখলদারী তাদের জন্য জরুরি ছিল। কিন্তু সুয়েজ খাল তখন উসমানি খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে। উপনিবেশিক আধিপত্যের পথে উসমানি খেলাফত ছিল দুলর্জ্ঘ বাধা। ফলে বাধার এই প্রাচীর অপসারণ করতে উপনিবেশিক শক্তিগুলো উসমানিয়দের বিরুদ্ধে জোট পাকাতে শুরু করে।

---

২৫ সুয়েজ খাল (*Suez Canal*) মিসরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত একটি কৃত্রিম সামুদ্রিক খাল। এটি ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। দশ বছর খননের পর পথটি ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এপ্রিল ১৮৫৯ সালে এবং শেষ হয় নভেম্বর ১৮৬৯ সালে। উত্তরে ইউরোপ থেকে দক্ষিণে এশিয়া-উভয়প্রান্তে পণ্যপরিবহনে সুয়েজ খাল জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে সম্পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হয় না। খালটি উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে কখনো কখনো পণ্য জাহাজ থেকে নামিয়ে মিসরের মধ্য দিয়ে স্থলপথে পরিবহন করা হতো। এভাবে ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগরে এবং লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে অপেক্ষমাণ জাহাজে মালামাল পারাপার হতো। এই খালের ব্যপ্তি ভূমধ্যসাগরের পোর্ট আবু সাঈদ থেকে লোহিত সাগরের সুয়েজ পর্যন্ত। ফরাসি প্রকৌশলী ফার্দিনান্দ দে লেসেপ্স এই খাল খননের উদ্যোক্তা। শুরুতে এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৬৪ কিলোমিটার (১০২ মাইল) এবং গভীরতা ছিল ৮ মিটার (২৬ ফুট)। বেশ কিছু সংস্কার ও সম্প্রসারণের পর ২০১০ সালের হিসেবে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ১৯০.৩ কিলোমিটার (১২০.১১ মাইল), গভীরতা ২৪ মিটার (৭৯ ফুট) এবং সর্বনিম্ন সরু স্থানে এর প্রস্থ ২০৫ মিটার (৬৭৩ ফুট)। উত্তর প্রবেশ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ২২ কিলোমিটার/১৪ মাইল, মূল খালের দৈর্ঘ্য ১৬২.২৫ কিলোমিটার/১০০.৮২ মাইল এবং দক্ষিণ প্রবেশ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ৯ কিলোমিটার/৫.৬ মাইল।
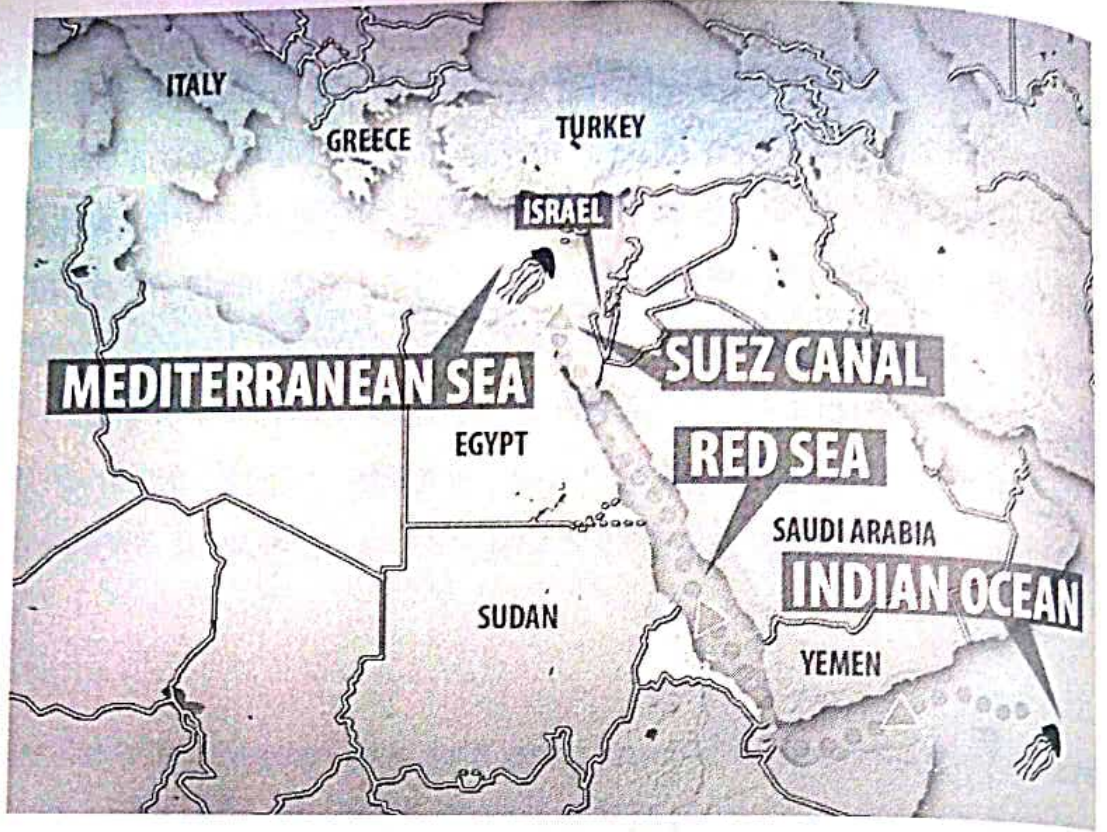
সুয়েজ খাল। ছবি : ইন্টারনেট

বৃটিশ সরকার 'আরব-জাতীয়তাবাদে'[২৬] প্রলুব্ধ করে আরবদেরকে উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি ও মদদ দিতে শুরু করে। মক্কায়

---

২৬ এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকায় জাতীয়তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'মেম্বারশিপ ইন অ্যা ন্যাশন অর সভেরেইন স্টেট'-'জাতি বা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সদস্য'। উইকিপিডিয়া বলছে, 'ন্যাশনালিটি ইজ দ্য লিগ্যাল রিলেশনশিপ বিটুয়িন অ্যান ইনডিভিজুয়াল হিউম্যান অ্যান্ড অ্যা স্টেট'-'ব্যক্তি বিশেষ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিধিগত সম্পর্কই জাতীয়তা'। উইকিপিডিয়া নাগরিকত্ব সম্পর্কেও এই একই কথা বলছে। অর্থাৎ, জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব সমপর্যায়ের। দূর অতীতে যখন রাষ্ট্র ছিল না মানুষ তখন ছিল জাতিভুক্ত। আধুনিক পৃথিবীতে বহুজাতিক রাষ্ট্র আছে, বহুরাষ্ট্রিক জাতিও আছে। খেলাফতের পতন পরবর্তী সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার তাগিদে পশ্চিমাসভ্যতা নতুন এক ব্যবস্থা চাপিয়েছিল বিভক্ত মুসলিম দেশগুলোর ওপর যার নাম 'জাতি রাষ্ট্র' বা 'জাতীয়তাবাদ'। ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচার মোকাবেলায় আত্মরক্ষার পদ্ধতি হিসেবে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি। শুরুর দিকে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয় খৃস্টধর্মের প্রটেস্ট্যান্ট (*Protestant*) মতাবলম্বীদের দ্বারা। জাতীয়তাবাদের মূল হলো

উসমানিয়দের প্রতিনিধি ছিলেন *শরিফ হুসাইন*[২৭]। বৃটিশেরা উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নির্বোধ শরিফ হুসাইনকে কাজে লাগায়। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে (১৩৩৪ হি.) ইউরোপের তিন প্রধান শক্তি *রাশিয়া*, *ফ্রান্স* ও *বৃটিশের* মাঝে 'সাইক্স-পিকট' ও 'সাজোনোভ' নামে গোপন কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

নির্দিষ্ট ভূরাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় মানুষকে আলাদা সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক পরিচিতি দান করা। (*ইমতিয়াজ সেলিম*, *রিটার্ন অব ইসলাম*)

২৭ সাইয়্যেদ হুসাইন বিন আলী ১৮৫৩ সালে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। শরীফ আলী ইবনু মুহাম্মদ ও মাতা সালহা বানি-সাহারের জ্যৈষ্ঠ সন্তান তিনি। ১৯০৮-১৯১৭ সাল পর্যন্ত তুর্কিদের পক্ষ থেকে মক্কার শরিফ ও আমির ছিলেন। পরবর্তীতে নিজেকে মক্কার বাদশাহ ঘোষণা করার পর সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের সমর্থন লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯১৬ সালে উসমানি খেলাফতের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন তিনি। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি কর্তৃক তুর্কি খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার দুইদিন পর ট্রান্সজর্দানের শুনাহতে পুত্র আবদুল্লাহর শীতকালীন ক্যাম্পে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন শরীফ হুসাইন। আবদুল আজিজ ইবনে সৌদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর রাজত্ব ও অন্যান্য জাগতিক উপাধি তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীকে প্রদান করেন। হেজায অঞ্চলে উসমানি খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত সর্বশেষ হাশেমি গোত্রীয় শাসক ছিলেন শরীফ হুসাইন। ১৯১৬ সালের আগে শরীফ হুসাইন আরব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও খেলাফত রাষ্ট্রে *তুর্কি জাতীয়তাবাদ* যা ১৯০৮ সালের তরুণ তুর্কি বিপ্লবের সময় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়, তা হাশেমিদেরকে অসন্তুষ্ট করে এবং উসমানিয়দের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে শরীফ হুসাইন উসমানিয়দের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখলেও পুত্র আবদুল্লাহর পরামর্শে গোপনে বৃটিশের সঙ্গে আতাঁত করেন। বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রী লর্ড কিচনার মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে শরীফ হুসাইনকে অনুরোধ করে। ১৯১৫ সালে শরীফ হুসাইন হেজায ও পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে একটি *আরব জাতি* ও *আরব খেলাফতের* দাবি তোলেন। বৃটিশ হাইকমিশনার হেনরি ম্যাকমোহন তাকে প্রলুব্ধ করে কুয়েত, এডেন ও সিরিয়ার উপকূলে রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ব্যতিত মিসর থেকে পারস্য পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য প্রদানের মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। শরীফ হুসাইন নিজেকে আরবদের বাদশাহ (মালিক বিলাদুল আরব) ঘোষণা করলে ইবনু সৌদের সঙ্গে তার সংঘাত বৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্ন মতাদর্শের জন্য বিশ্বযুদ্ধের আগেও (১৯১০) তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। আরব বিদ্রোহের শুরু থেকে বৃটিশেরা তাকে সমর্থন করলেও সৌদি আক্রমণ ঠেকানোর ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেনি। ৪ জুন ১৯৩১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)

হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক উসমানি খেলাফতের যেসব এলাকা বিচ্ছিন্ন করা হবে তা এ তিন শক্তি নিজেদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে নেবে। এভাবে ইসলামি সালতানাতকে গ্রাস করার জন্য তিনটি কুফুরি শক্তি নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হয়। কিছুদিন পর বৃটেন এই চুক্তিকে সুয়েজ খালে স্বীয় আধিপত্যে বাধা হিসেবে দেখতে পায়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় জারের দুর্বলতা ও বলশেভিক বিপ্লবের[২৮] সুযোগে বৃটিশেরা *সাজোনোভ* চুক্তি মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিলিস্তিনের দখল নিয়ে নেয়। এসব পদক্ষেপ এমন সময় গৃহীত হয় যখন আরব অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের পক্ষ থেকে দ্রুততার সঙ্গে 'জাতীয়তাবাদী' চিন্তার প্রচলন এই দর্শনকে শক্তিশালী রূপ দিচ্ছিল। বেশিরভাগ মুসলিম ক্রমশ 'জাতীয়তাবাদী' চিন্তা-দর্শনে আক্রান্ত হয়ে ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত ক্রুসেডাররা মুসলিম অঞ্চলগুলোতে এসময় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী নানা ছদ্ম-আন্দোলনের জন্ম দিচ্ছিল। একই সময় বৃটেনে ইহুদি ঐক্যের ষড়যন্ত্রমূলক আহবানের সূত্রপাত ঘটে যা ঐতিহাসিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। বৃটিশ সরকার ইহুদি বর্ণবাদী জাতীয়তার সংঘবদ্ধ প্রচারণায় যুক্ত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে জায়নবাদীরা একটি একক ইহুদি জাতির চিন্তা ও তাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপতৎপরতা শুরু করে। বৃটিশ সরকার খোলাখুলি এধরনের অপতৎপরতায় শক্তি ও সমর্থন যোগাতে থাকে।

---

২৮ বলশেভিক বিপ্লব অন্য নামে অক্টোবর বিপ্লব অথবা নভেম্বর বিপ্লব অথবা অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব- রাশিয়ায় সংঘটিত কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক বিপ্লব যা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অংশবিশেষ। জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে ২৫ অক্টোবর এবং গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে ৭ নভেম্বর ১৯১৭ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। (সেরধসোভা ও অন্যান্য, বিপ্লব কী, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৯৬)

ফ্রি-ম্যাসনরা[২৯] ধনাঢ্য ইহুদিদের নিকট থেকে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ এবং লক্ষ্য হাসিলে একটি দল গঠন করে। ফিলিস্তিনি একটি পাহাড়ের নামে দলটির নামকরণ করে জায়ন (*Zion*)। এই জায়ন পাহাড়ে আছে দাউদ ও সোলায়মান আলাইহিমুস সালামসহ বনি ইসরঈলের বহু নবীর মাজার। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে (১৮৯২-১৮৯৮ খৃ.) জাতীয়তাবাদী ইহুদিরা বিভিন্ন দেশের ইহুদিদের ফিলিস্তিনে গমন ও অভিবাসনে সক্রিয় হয়ে উঠে। ইহুদি ধর্মগুরুদের কেউ কেউ জায়নিস্টদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও উপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র বুঝতে পেরে এর বিরোধিতা করায় শুরুর দিকে *জায়নবাদী আন্দোলন*[৩০] ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমদিকে ফিলিস্তিনের ওপর বৃটিশ আধিপত্যের সুযোগে জায়নিস্টরা বিশ্বজুড়ে ইহুদি নিপীড়নকে ইস্যু করে একটি পৃথক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। জায়নবাদের লক্ষ্য ছিল *প্রাচীন*

---

২৯ 'ফ্রি'-'মুক্ত', 'ম্যাসন'-'কারিগর'। ফ্রি-ম্যাসন অর্থ 'মুক্ত কারিগর'। সোলায়মান আলাইহিস সালাম বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের সময় একজন কারিগর নিযুক্ত করেন ইহুদি তালমুদে তাকে 'বিধবার সন্তান' বলা হয়েছে। এই কারিগরের নাম ছিল *হাইরাম আবিফ*। ইহুদিরা ধারণা করে হাইরাম আবিফ অতীন্দ্রীয় জ্ঞানের ধারক ছিলেন। ইহুদিদের প্রাচীন গুপ্তসংঘঠন *ফ্রি-ম্যাসনারির* উদ্ভব হাইরাম আবিফকে কেন্দ্র করে। ফ্রি-ম্যাসনারির মূলমন্ত্র 'গড়া'। আজকের সভ্যতাকে ভেঙে আগামীদিনের সভ্যতায় রূপান্তরিত করা। ফ্রি-ম্যাসনারি ৩৩টি পদ বা ডিগ্রিতে বিভক্ত। ৩৩তম পদ সর্বোচ্চ ডিগ্রি যাকে *মাস্টার* বলা হয়। ফ্রি-ম্যাসনারিতে যোগ দিতে চাইলে ভিন্নধর্মী রিচুয়ালের মাধ্যমে তাকে কিছু গুপ্তজ্ঞান দেওয়া হয়, নেওয়া হয় বিশস্ততার অঙ্গীকার, এরপর তাকে ফ্রি-ম্যাসন বলে গণ্য করা হয়। ফ্রি-ম্যাসনদের রচনা থেকে জানা যায় ফ্রি-ম্যাসনারির শুরু ব্যাবিলনিয় সভ্যতা থেকে। রাজা নমরুদ এমন একটি টাওয়ার তৈরি করে যার ভেতরে ছিল সম্পূর্ণ একটি শহর। এই টাওয়ার তৈরিতে যুক্তদের বিশেষ কিছু বিদ্যা জানা ছিল। এরাই ছিল *ম্যাসন*। নমরুদ কর্তৃক পূজিত মূর্তির শরীর ছিল মানুষের মতো দেখতে। মাথা ভেড়ার মতো এবং এর খাড়া দুটি শিং ছিল। এই দেবতার নাম, *বাল দেবতা*। ম্যাসনরাও *বাল* দেবতার পুজা করতো, বর্তমানে আমরা যাকে *ব্যাফমেট* বা *লুসিফার* নামে চিনি। ম্যাসনদের অনেক কিছুই ইহুদি গুপ্তবিদ্যা কাব্বালা, জোহর ও তালমুদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৩০ ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বলা হয়, *জায়নবাদ* (*Zionism*)। এ বিষয়ে পরিশিষ্টাংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইসরাঈল[৩১] প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা। বৃটিশেরাও একে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার ও এ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সামরিক চৌকির প্রয়োজনীয়তা থেকে জায়নিস্টদের প্রতিটি কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা জোগাতে থাকে।

আরবদের প্রতিক্রিয়া

দখলদার বৃটিশ কর্তৃক ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে 'ইহুদি জাতির কেন্দ্র' স্থাপনের বিষয়টি বৃটিশ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলে ইংরেজের অনুচর ও মক্কা মোকাররমার উসমানি গভর্নর *শরিফ হুসাইন* এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন। বৃটিশেরা জবাব দেয়, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রত্যাগমনের সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয়। এই বিবৃতিতে 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' গঠনের ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জায়নবাদী সংগঠনের গুন্ডাবাহিনী (হাগানাহ) ফিলিস্তিনের কিছু অংশ দখলে নিলে আরবদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর আগে ফিলিস্তিনে ছোট ছোট গ্রুপে কলোনীবাসী হিসেবে ইহুদিদের বসবাসের সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় আরবদের থেকে জমি কিনে ইহুদি *কৃষিখামারের* পত্তন ঘটানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে থিতু হচ্ছিল বহিরাগত ইহুদিরা।

---

৩১ ইহুদিদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থ তালমূদ ও তৌরাতে বর্ণিত কথিত আদিভূমি। কয়েক হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক অঞ্চলে এই প্রাচীন ইসরাঈল অবস্থিত ছিল বলে চরমপন্থী ইহুদিরা বিশ্বাস করে।

শায়েখ ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসামের[৩২] প্রতিরোধ

১৯২০ সালে মিত্রশক্তি[৩৩] ও আন্তর্জাতিক সমাজ[৩৪] ফিলিস্তিনের অভিভাবকত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ সরকারের হাতে সমর্পণ করে। *লিগ অব নেশনস*[৩৫] কর্তৃক বৃটিশের ওপর *ইহুদি জাতীয় কেন্দ্র* স্থাপনের মাধ্যমে *বেলফোর*[৩৬] *ঘোষণা* বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফিলিস্তিনে তখন পঞ্চাশ

---

৩২ শায়খুল মুজাহিদীন ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। এই মুজাহিদ আলেমের জন্ম ১৮৮৩ সালে সিরিয়ার লাযেকিয়া (লাতাকিয়া) প্রদেশের জাবালা শহরে। এই শহরে বিখ্যাত সূফি ইবরাহিম বিন আদহামের বসবাস ছিল। এখানে ইবরাহিম আদহামের মাজারও রয়েছে।

৩৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 'মিত্রশক্তি' বলতে সেসব দেশকে বোঝানো হয় যারা জার্মানির 'অক্ষশক্তির' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। (*Encyclopædia Britannica Online*)

৩৪ *আন্তর্জাতিক সমাজ* একটি চাতুরিপূর্ণ পরিভাষা। এর মাধ্যমে ইহুদি নেতৃত্বকে বোঝানো হয়। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিক মহল বা সমাজ, আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এসবের উদ্দেশ্য ইহুদি নেতৃত্বকে বোঝানো। যেমন, 'আন্তর্জাতিক মহল উদ্বিগ্ন' এর অর্থ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ইহুদি মহল উদ্বিগ্ন।

৩৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা *লিগ অব নেশনস* (*League of Nations*) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী একটি আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারি সংস্থা। ১৯১৯ সালে 'প্যারিস শান্তি আলোচনার' ফলস্বরূপ সংস্থাটির জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের উসমানি খেলাফতের ভূমিগুলো বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে দেওয়া এবং ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫-এর মধ্যে সংস্থাটির সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৮। (*Covenant of the League of Nations, The Avalon Project*)

৩৬ বেলফোর ঘোষণা (২ নভেম্বর ১৯১৭) বৃটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডের কাছে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোরের লেখা একটি চিঠি। *জায়নিস্ট ফেডারেশন অব গ্রেট বৃটেন এন্ড আয়ারল্যান্ড* নামক সংগঠনের কাছে পাঠানোর জন্য চিঠিটি তাকে দেওয়া হয়। বেলফোর ঘোষণায় বৃটিশেরা ইহুদি জায়নিস্টদেরকে ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। একে মনে করা হয় ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি।

(*Schneer, Jonathan The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict, p: 342*)

হাজার ইহুদির বসবাস। ইংরেজেরা ফিলিস্তিনের শাসনভার জনৈক ইহুদির হাতে অর্পণ করলে এই সরকারের অধীনে ইহুদিদের আগমনের দরজা খুলে যায়। স্বল্পসময়ে ইহুদি সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা আরবদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহের কারণ ঘটায়। বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী *চার্চিল* বিদ্রোহ ঠেকাতে ঘোষণা দেন, 'সমগ্র ফিলিস্তিনকে একটি ইহুদি দেশে পরিণত করার ইচ্ছা বৃটেনের নেই। *ইহুদি জাতীয় কেন্দ্র* স্থাপনের প্রয়োজনানুপাতে এবং ফিলিস্তিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কল্পে ইহুদি অভিবাসন অব্যাহত থাকবে।'

ইংরেজের সহায়তা নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো প্রস্তুত হতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদি পুঁজিপতিরা এদেরকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা যোগায়। অন্যদিকে আরবরা ছিল ছত্রভঙ্গ, অসংহত ও বিচ্ছিন্ন। উত্তেজিত স্লোগান বা বিক্ষোভ দেখানো ব্যতীত ফিলিস্তিনিদের কোনো কাজেই তারা লাগেনি।

বেপরোয়া ইহুদি আধিপত্যের মুখে ফিলিস্তিনি মুসলিম ও খৃস্টান জনসাধারণ পারস্পরিক বিভেদ ভুলে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে একপক্ষে ফিলিস্তিনি মুসলিম ও খৃস্টান জনসাধারণ এবং অন্যপক্ষে ইহুদি বসতিকামীদের মধ্যে এক রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধে। সহিংস সংঘাতে জায়নবাদী ইহুদি ও ইংরেজ সৈন্যদের বেপরোয়া গুলির মুখে ৩৫১ ফিলিস্তিনি নিহত হন। আহত ও বন্দী হন আরো অনেকে। পরবর্তীতে প্রহসনমূলক বিচারে একদল ফিলিস্তিনিকে আজীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

শায়খুল মুজাহিদ ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম। জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম গড়ে তুলেছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধ। ছবি : ইন্টারনেট

কুড়ি দশকের শেষ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত শায়খুল মুজাহেদীন ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসামের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় এক সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান। শামের জাবালাহ শহর থেকে শায়েখ কাসসাম রাহিমাহুল্লাহর নেতৃত্বে সূচনা ঘটে পবিত্র জিহাদের। আগ্রাসী ফ্রেঞ্চ ও তাদের নুসাইরি দোসরদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার উপকূলে প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন শায়েখ কাসসাম রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর জিহাদের ফলে ফিলিস্তিনে বৃটিশ দখলদারী ও ইহুদি সন্ত্রাসীদের রাজ্য বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালে জেনিনের কাছে স্বসৈন্যে শাহাদাতবরণের আগ পর্যন্ত শায়েখ কাসসাম বৃটিশ ও জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসামের শাহাদাত ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনিদের প্রথম অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র রচনা করে। শায়েখ কাসসাম ও তাঁর অধিকাংশ সহচর শাহাদাতবরণ করলে ১৯৩৭ সালে আব্দুল কাদের হুসাইনি মুজাহিদদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বহু যুদ্ধে শক্তিশালী বৃটিশ ক্রুসেডার ও জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করার পর শেষপর্যন্ত তিনিও স্বসৈন্যে শাহাদাতবরণ করেন। এরপর ১৯৪৪ সালে হাসান সালামা

বৃটিশ ও জায়নবাদী যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান।

চল্লিশের দশক থেকে ফিলিস্তিন ইস্যু আন্তর্জাতিক বিষয়াদির শীর্ষে স্থান লাভ করে। পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন ও আরবদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মুখে বৃটিশ সরকার বেপরোয়া ইহুদি অভিবাসন সীমিত করতে বাধ্য হলে তা জায়নিস্টদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

মুসলিম উচ্ছেদ ও ইসরাঈল প্রতিষ্ঠা

বৃটিশ ক্রুসেডাররা একদিকে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনের দরজা খুলে দেয় অন্যদিকে বৃটিশের সহযোগিতায় পুরোদমে সামরিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে ইহুদি সন্ত্রাসীরা। সংগোপনে প্রস্তুত হয় অনেকগুলো প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী সংগঠন। এর মধ্যে তিনটি প্রধান সংগঠন হলো- 'হাগানাহ, ইরগুন ও স্ট্যার্ন গ্যাং'।[৩৭]

---

৩৭ ১৯১৮ সালে বৃটিশের সহযোগিতায় জায়নবাদী ইহুদিরা গুপ্তসন্ত্রাসী বাহিনী 'হাগানাহ' প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমদিকে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সহায়তা করা হাগানাহ বাহিনীর দায়িত্ব হলেও পরবর্তীতে তারা সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়। 'হাগানাহ' ইহুদি ইসরাঈলের সেনাবাহিনী গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্ত্র সংগ্রহ ও ফিলিস্তিনে জায়নবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি ছিল হাগানার প্রাথমিক কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাগানাহ ১৬,০০০ সদস্যের প্রশিক্ষপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের ভেতর তারা বিভিন্ন পাবলিক যানবাহনে হামলা চালায়। ১৯৪০ সালের ২৫ নভেম্বর হাগানাহ *SS Patria* নামের জাহাজ উড়িয়ে দেয়। এতে নিহত হয় ২৬৮জন এবং আহত হয় ১৭২জন। ১৯৪৬ সালের ১৬-১৭ জুন 'অপারেশন মারকোলেট' নামে সন্ত্রাসী এক অভিযানে আরব অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী ১১টি ব্রিজ ধ্বংস করে হাগানাহ। ১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই হাগানাহ ও অপর জায়নিস্ট সন্ত্রাসী সংগঠন ইরগুন মিলিতভাবে জেরুসালেমের কিং ডেভিড হোটেলে (বৃটিশের প্রশাসনিক সদরদপ্তর) বোমা হামলা চালায়। এতে নিহত হয় ৯১জন। এই অভিযানে জায়নিস্ট সন্ত্রাসীরা আরবদের পোশাক পরে অংশ নেয় যাতে তাদের ওপর দোষ চাপানো যায়। ১৯৪৭-এর শেষের দিকে হাগানাহর সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যা শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ইহুদি সন্ত্রাসীরা বৃটিশ সেনাদের ইউনিফর্ম পড়ে ছদ্মবেশে জাফায় প্রবেশ করে এবং আরব ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টার উড়িয়ে দেয়। এতে ৪০জন নিহত ও ৯৮জন আহত হয়। ১৯৪৮ সালের ৫ জানুয়ারি জেরুসালেমে অবস্থিত খৃস্টান মালিকানাধীন সেমিরামিস হোটেলে বোমা হামলা চালায়।

হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির মাধ্যমে নিরীহ ফিলিস্তিনদের নিজ আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদে যুক্ত হয় এই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো। জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের গণহত্যার কথা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হলে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য ইহুদিদের গুপ্তসংগঠন *হাগানাহ* বেছে নেয় আত্মহননের পথ। ১৯৪০ সালে হাইফা বন্দরে *এসএস প্যাট্রিয়া* নামের ফরাসি একটি জাহাজকে উড়িয়ে দিয়ে ২৬৮ ইহুদিকে হত্যা করে *হাগানাহ*। ১৯৪২ সালে আরেকটি জাহাজ ধ্বংস করে ৭৬৯ ইহুদিকে একই কায়দায় হত্যা করে সন্ত্রাসী গ্যাংটি। উভয় জাহাজে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আসছিল। বৃটিশরা সাময়িক কৌশলগত কারণে জাহাজ দুটিকে ফিলিস্তিনের বন্দরে ভিড়তে দিচ্ছিল না। *হাগানাহ* নিজ জাতির লোকদেরকে হত্যা করে বিশ্বজনমত পক্ষে আনার চেষ্টা চালায়। এর সঙ্গে সমানতালে চলতে থাকে ইহুদি বসতি নির্মাণ ও মুসলিমদেরকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদকরণ। এসব তৎপরতার ফলস্বরূপ স্বল্পসময়ে ২০ হাজার থেকে বহিরাগত ইহুদির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৪০ হাজারে।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইঙ্গ-মার্কিন[৩৮] চাপে জাতিসংঘে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। ৩৩টি রাষ্ট্র পক্ষে, ১৩টি বিরুদ্ধে এবং ১০টি ভোট দানে বিরত থাকে। প্রস্তাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয়েও ইহুদিরা পায় ভূমির ৫৭%, ফিলিস্তিনরা ৪৩%। প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমানা অনির্ধারিত রাখা হয় যাতে ভবিষ্যতে ইহুদিরা সীমানা বাড়াতে পারে। জাতিসংঘের মাধ্যমে এভাবে পাস হয় একটি অবৈধ ও অযৌক্তিক প্রস্তাব। প্রহসনের নাটকে জিতে গিয়ে ইহুদিরা হয়ে উঠে আরো হিংস্র। হত্যা-সন্ত্রাসের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদে ফোন লাইন কেটে,

---

এতে স্প্যানিশ অ্যাম্বাসেডরসহ ২৬জন নিহত হয়। ১৯৪৭ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাবলিক বাস, মার্কেটপ্লেস ও ক্যাফেতে নিরীহ আরবদের ওপর জায়নিস্ট গ্যাংগুলোর যৌথ সন্ত্রাসী হামলায় ৯৩জন নিহত ও ১৬১জন আহত হন।

৩৮ ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ শক্তির আঁতাত।

বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন করে, ঘর-বাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ বা জোর-জবরদস্তি জমি দখল ও বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন করে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসীরা। ফলে লাখ লাখ মুসলমান বাধ্য হয় দেশ ত্যাগে।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে সৈন্যদের বের করে নিলে সেদিনই *তেলআবিব* শহরে *ইহুদি জাতীয় পরিষদ* গঠিত হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয় *ইসরাঈল রাষ্ট্র* প্রতিষ্ঠার। পূর্ব যোগাযোগ অনুসারে ১০ মিনিটের ব্যবধানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট *হেনরি ট্রুম্যান* নয়া 'ইসরাঈল রাষ্ট্রকে' স্বীকৃতি দেয়। এরপর স্বীকৃতি দেয় বৃটিশ ও সোভিয়েত রাশিয়া। বৃটিশেরা ফিলিস্তিন ত্যাগের প্রাক্কালে তাদের সব সমরাস্ত্র ও আনুষাঙ্গিক অবকাঠামো তুলে দিয়ে যায় ইহুদি জায়নবাদীদের হাতে। ফলে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদি আগ্রাসন ঠেকানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। জায়নবাদীরা একের পর এক দখলে নিতে থাকে ফিলিস্তিনি শহর-গঞ্জ-গ্রাম। বাধা পেলে দরিদ্র ও অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে *দেইর ইয়াসিন* ও *কাফার কাসেম* গ্রামে জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যার পর নিরাশ্রয়ী ও বাস্তুহারা ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে তারা পালাতে থাকে জর্দান সীমান্তের ওপারে। একই সময় আরবদেশগুলোর সৈন্যবাহিনী ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় মাঠে নামে। কিন্তু আদর্শ বিবর্জিত আরব সেনাবাহিনী সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ইসরাঈলি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ইহুদিরা পায় ইউরোপ-আমেরিকার নিরবিচ্ছিন সমর্থন ও বিরামহীন জঙ্গিবিমান-সমরাস্ত্রের যোগান।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে দশ লাখের অধিক ফিলিস্তিনি মুসলমান বাস্তুহারা হন। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি অঞ্চলে বিভক্ত করে জেরুসালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করলে ইসরাঈল এই পরিকল্পনা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এতোসব বঞ্চনার পর ফিলিস্তিনিদের মাঝে জন্ম নিতে শুরু করে বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ ও প্রতিরোধী সংগঠন। ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে গেরিলা যুদ্ধের বিকল্প ছিল না তাদের সামনে। ১৯৬৪ সালের ২৮ মে আল-

কুদস শহরে (বায়তুল মোকাদ্দাস) অনুষ্ঠিত হয় *ফিলিস্তিনি কংগ্রেস*। এই কংগ্রেসে *ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন* বা *পিএলও* প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইয়াসির আরাফাতের আল-ফাতাহ পিএলও-য় যোগ দিলে দলটি এর সামরিক বাহিনীতে রূপ নেয়। কিন্তু এর কোনো কিছুই ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সংগ্রামে আশানুরূপ ফল যোগাতে পারেনি। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসলমান স্বদেশের মুক্তির পথে জীবন দিয়েছেন। অথচ বিরামহীন অভিবাসন ও নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিম উচ্ছেদ সত্ত্বেও তখনো পর্যন্ত ইহুদিরা ছিল ফিলিস্তিনের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী।

Springfield Republican

25 Cents

WAR ENDS—TOTAL ISRAEL VICTORY

Syrians Collapse In Final Campaign; UN Session Called

U. S. Pilots Hit Power Complex

Williams Welcomes Thai Pair

Resignation of Vance Stirs Up Washington

Ladybird Guest At Clambake

ছয়দিনের যুদ্ধ : ১৯৬৭

১৯৬৭ সালের ৫ জুন সন্ত্রাসবাদী ইসরঈল অতর্কিতে মিসর, সিরিয়া ও জর্দানের বিমানবন্দরে আক্রমণ চালিয়ে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধে জর্দান-নদীর *পশ্চিম তীর*, *গাজা উপত্যকা*, সিরিয়ার *জিলান* (গোলান) *মালভূমি* ও মিসরের *সিনাই মরু এলাকা* ইসরঈলিরা দখল করে নেয়। আরব-ইসরঈলের এ যুদ্ধটি **ছয়দিনের যুদ্ধ** বলে পরিচিত। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইসরঈলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের হিম্মত হারিয়ে ফেলে আরব জাতীয়তাবাদীরা। ফলে আরব রাষ্ট্রগুলো বৃহৎ শক্তির লেজুড়বৃত্তি ও আলাপ-আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে থাকে। ছয়দিনের যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইশতেহার পাস করে ইসরঈলকে জবরদখলকৃত এলাকা থেকে পিছিয়ে আসার 'আহ্বান' জানায়। কিন্তু ইহুদিরা এই কাগুজে আহ্বানে মোটেও কর্ণপাত করেনি। উল্টো জর্দানের হাতে ন্যস্ত বায়তুল মোকাদ্দাসসহ জেরুসালেম শহর, বেথেলহাম (বায়তুল লাহাম) এবং আরো ২৭টি ফিলিস্তিনি গ্রাম দখলপূর্বক ইসরঈলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা দেয় তারা। জায়নবাদীরা বায়তুল মোকাদ্দাসে ইহুদি সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখানকার ইহুদি জনসংখ্যা তিন হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লাখ নব্বই হাজারে পৌঁছায়। ১৯৬৯ সালের ১১ আগস্ট ইহুদিরা মসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। বলা হয়, বৈদ্যুতিক বিভ্রাটে আগুন লেগেছে। এসময় অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকহারে নির্মিত হতে থাকে ইহুদি বসতি।

১৯৬৯ সালে পুরাকীর্তি, প্রাচীন শিলালিপি ও আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং প্রাচীন জাতি-সভ্যতার নিদর্শনাদি খোঁজার অজুহাতে *মসজিদে ওমর* (কুব্বাতুস সাখরা) ও মসজিদে আকসার আশেপাশে খনন কাজ শুরু করে ইসরঈল। এর একটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাসিন্দাদেরকে এই দুটি পবিত্র মসজিদ সংলগ্ন এলাকা থেকে বিতাড়নপূর্বক এসব ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস করে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো গড়ে তোলা। ইহুদিরা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইউরোপের মদদপুষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে এবং আরববিশ্ব ও জাতিসংঘের কথিত বিরোধিতা সত্ত্বেও বায়তুল মোকাদ্দাসকে (জেরুসালেম) ভবিষ্যত রাজধানীর ঘোষণা দেয়।

কারামা যুদ্ধ : ১৯৬৮

ছয়দিনের যুদ্ধে আরবদের অবমাননাকর পরাজয়ের পর সিরিয়া, জর্দান, ও লেবাননের শরণার্থী শিবিরে প্রশিক্ষণরত ফিলিস্তিনি প্রতিরোধী সংগঠনগুলো গেরিলা অভিযান জোরদার করে। জর্দানের রাজধানী আম্মানের পঁচিশ কিলোমিটার পশ্চিমে জর্দান উপত্যকায় অবস্থিত *কারামা* শহরে বহুসংখ্যক ফিলিস্তিনি শরণার্থী অবস্থান নিয়েছিল। *কারামা* ছিল জায়নবাদীদের *যুদ্ধ বিরতি লাইন* থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরত্বে ও দুশমনের গুলির আওতায়। কারামার জনসংখ্যা শরণার্থীদের আগমনে আড়াই হাজার থেকে বেড়ে দ্বিগুণে পরিণত হয়। *পিএলও-ভুক্ত আল-ফাতাহ*[৩৯] গেরিলা সংগঠন কারামায় কেন্দ্রীয় ঘাঁটি স্থাপন করে জায়নবাদের হুমকি মোকাবেলায় আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফিলিস্তিনিদের এ সিদ্ধান্তের আরেকটি ব্যাখ্যা ছিল, কারামায় প্রতিরোধ চালিয়ে জর্দান সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়া, কারামায় ফিলিস্তিনিদের

---

৩৯ আল-ফাতাহ (الفتح) ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৫৯ সালে গঠিত হয়। মাহমুদ আব্বাস, সালাহ খালাফ, খলিল আল-ওয়াজির, আহমদ শাকির, নায়েফ হাওয়াতিমা এবং আবদুল মোহসেন আবু মাইজার দলটির প্রথম প্রজন্মের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতা। ফাতাহ নিজ অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে ১৯৬৫ সালে। মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের অনুরোধে ফাতাহ ওই ঘোষণা দেয়। নাসের ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। নাসেরের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী মিসর ফাতাহকে অস্ত্র ও সামরিক উপকরণের যোগান দেয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি ফাতাহ গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ফাতাহ'র সামরিক শাখার নাম দেওয়া হয় 'আস-সায়েক্বা' বা 'বজ্র'। দলটির বেশিরভাগ রাজনৈতিক ও সামরিক সদস্য থাকতেন মিসর, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায়। ১৯৯৩ সালে ইসরাঈলের সঙ্গে অসলো আপোস চুক্তি স্বাক্ষরের আগপর্যন্ত ফাতাহ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ড মুক্ত করার নীতিতে অবিচল ছিল। কিন্তু আপোস চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফাতাহ'র তৎপরতা রাজনৈতিক তৎপরতায় সীমিত হয়ে পড়ে। নীতিগত এই পরিবর্তনের কারণে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে খুবই সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন ফিলিস্তিন স্ব-শাসন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৯৪ সালে। ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর আরাফাতের রহস্যজনক মৃত্যুর পর স্ব-শাসন কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামও দুর্বল হয়ে যায়।

খুন ঝরানো হলে সেখানে অবস্থান ও জর্দান উপত্যকায় গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

১৯৬৮ সালের ২১ মার্চ ইসরাঈলি সন্ত্রাসীরা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কারামার ওপর আগ্রাসন শুরু করলে মাত্র তিন'শ ফিলিস্তিনি গেরিলার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তাদের বহুসংখ্যক নিহত হয়। ভীতু সন্ত্রাসীরা প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পিছু হটে। এ যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জাতিকে বিজয়ের নতুন পথ ও উপায় দেখিয়ে দেয়। এরপর বহু ফিলিস্তিনি *ফাতাহ* গেরিলা সংগঠনে যোগদান করে। কারামা যুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন অর্জিত হয়। আরব সরকারগুলো পর্যন্ত তাদের সমর্থন দেয়, বিশেষত জর্দানের সামরিক বাহিনী ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু এ সহযোগিতা স্থায়ী ছিল না। ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসরাঈলের হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মুখে ফাতাহর সঙ্গে জর্দান সরকারের দ্বন্দ্ব প্রচণ্ডতর হয়ে উঠে- যা ১৯৭০ সালের কালো সেপ্টেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার জন্ম দেয়। ২৭ সেপ্টেম্বর জর্দানি বাহিনী কারামায় হাজারেরও অধিক ফিলিস্তিনি গেরিলা ও উদ্বাস্তুকে হত্যা করে নির্মমভাবে।
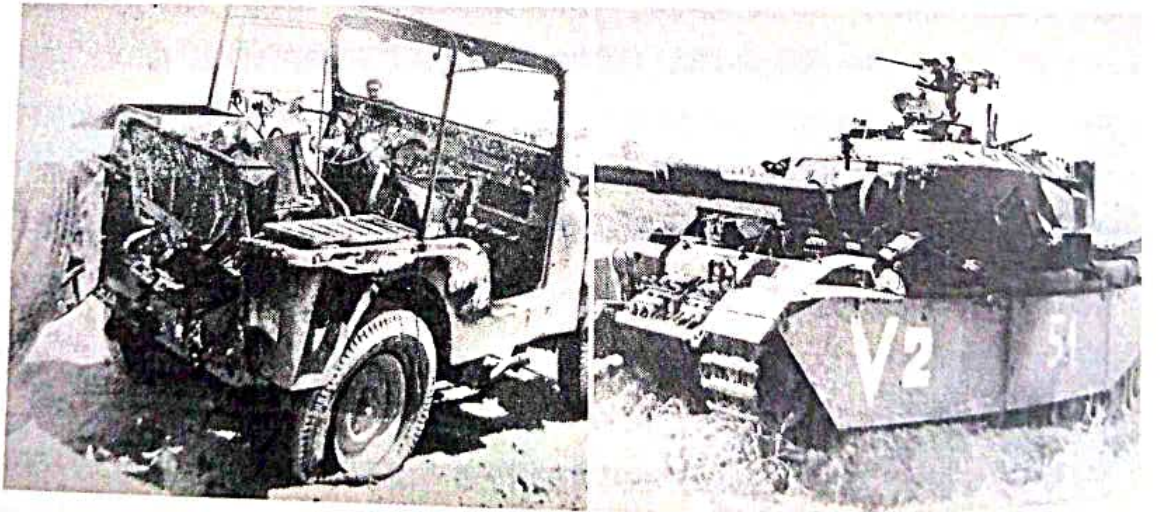
কারামায় বিধ্বস্ত ইসরাঈলি সাঁজোয়া ও পরিত্যক্ত ট্যাঙ্ক। ছবি : মিডিয়া কমন্স

রমজান যুদ্ধ[৪০] : অক্টোবর, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে মিসরের সামরিক বাহিনী অতর্কিত সুয়েজ অতিক্রম করে অলঙ্ঘনীয় বলে খ্যাত

ইসরঈলের *বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন*[৪১] ভেঙে ফেলে এবং সিনাই মরুভূমি ও দখলকৃত ইসরঈলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। পূর্বদিক থেকে একই সময় সিরিয় বিমানবাহিনী ইসরঈলের ওপর হামলা চালায়। যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনে ইহুদিদের শত শত জঙ্গিবিমান ও সাঁজোয়া ধ্বংস হয়।

নিহত হয় কয়েক হাজার ইসরঈলি। শূন্যে মিলিয়ে যায় ইসরঈলের অপরাজেয় হওয়ার রূপকথা। যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের দ্রুত সামরিক সহায়তা ও সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সিরিয় সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধের গতি ইহুদিদের পক্ষে মোড় নেয়। অন্যান্য আরবদেশ এই যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না রাখায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে মিসর। ইসরঈলি সামরিক বাহিনী হেলিবোর্ডের মাধ্যমে সুয়েজ খালের পশ্চিমে মিসরের অভ্যন্তরের একটি ছোট্ট এলাকায় সৈন্য নামিয়ে তা অবরোধ করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কায়রো থেকে ৬০১ কিলোমিটার দূরত্বে যুদ্ধাবসানের জন্য আলোচনা শুরু হয় এবং সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অবসান ঘটে এই যুদ্ধের।

---

৪০ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরঈল যুদ্ধ অক্টোবর যুদ্ধ বা রমজান যুদ্ধ বা ইয়ম কিপুর যুদ্ধ নামে পরিচিত। মিসর ও সিরিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট এবং ইসরঈলের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় জোটের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ৬ থেকে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরিশিষ্টাংশে 'ইয়ম কিপুর যুদ্ধ' নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

৪১ 'বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন' ইসরঈলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা বুহ্য। ধারণা করা হতো, এই প্রতিরক্ষা লাইন প্রতিহত করা অসম্ভব। কিন্তু মিসর ও সিরিয়ার সম্মিলিত বাহিনী মাত্র ৬ ঘণ্টার যুদ্ধে এই প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙে ফেলে।

রমজান যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইসরঈলি ট্যাঙ্ক। ছবি : মিডিয়া কমন্স

রমজান যুদ্ধ ফিলিস্তিনে ইহুদি দখলদারী প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ। দুই পক্ষের সমরাস্ত্র, লজিস্টিক ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে এর আন্দাজ পাওয়া যায়। ১৯ দিনব্যাপী স্থায়ী এই যুদ্ধে তিন হাজারের অধিক ইহুদি সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয় ৯ হাজারের মতো। জায়নবাদীদের ১০৬৩টি ট্যাঙ্ক, ৪০৭টি সাঁজোয়া, ৩৮৭টি জঙ্গিবিমান ও এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়। ভিন্নদিকে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের নিহত সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ৩৪১টি এয়ারক্রাফট ও ১৯টি নেভাল ভ্যাসেলসহ ধ্বংস হয় ২২৫০টি ট্যাঙ্ক। সমরশক্তির দিক থেকে শুধু মিসরই ইসরঈল থেকে প্রায় দুই গুণ ছিল। সিরিয়া ও অন্যান্য আরবদেশের হিসেবে জায়নবাদীদের সঙ্গে তাদের সামরিক সক্ষমতার অনুপাত ছিল ৩:১।[৪২]

আনোয়ার সাদাত ও হাফেজ আসাদের মিসর ও সিরিয়ায় সমরশক্তির অপ্রতুলতা না থাকলেও ছিল না দ্বীন বা আদর্শ। এই যুদ্ধের সঙ্গে পাওয়া যায়

---

৪২ ট্যাঙ্ক ও জঙ্গিবিমানের ক্ষেত্রে মিসরের ইসরঈলের চেয়ে দ্বিগুণ ও আর্টিলারির ক্ষেত্রে তিনগুণ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বিমান প্রতিরক্ষা ও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্রের ক্ষেত্রেও মিসর ইসরঈলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। সিরিয়া ও অন্যান্য আরবদেশের হিসেবে সমরশক্তির দিক থেকে আরবরা ছিল ইসরঈলের চেয়ে তিনগুণ শক্তিসম্পন্ন।

না ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্কও। যুদ্ধের শুরুতে মিসরিয় সৈন্যদেরকে ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত করার বদলে প্রেরণা দেওয়া হয় উম্মে কুলসুমের গানের দ্বারা! শুধু এতোটুকু থেকেই তাদের অবস্থান আন্দাজ করা যেতে পারে।

আরবপক্ষের উল্লেখযোগ্য মিত্র হাফেজ আসাদ সিরিয়ার কানিত্রা শহরটি ইসরঈলকে ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সি রক্ষা করেন। মিসরের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের শ্যালক মোসাদের সিনিয়র এজেন্ট হিসেবে জায়নবাদীদের পক্ষে যুদ্ধের পুরোটা সময় অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালান। প্রেসিডেন্ট সাদাত পাশ্চাত্য ও ইসরঈলের সঙ্গে আপোষ-রফার মাধ্যমে মসনদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। প্রথম আরবদেশ হিসেবে জায়নবাদী ইসরঈলকে স্বীকৃতি দিয়ে আনোয়ার সাদাত মুসলিমবিশ্বে জন্ম দেন বিভেদের।[৪৩]

ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পিএলও)

১৯৬৪ সালে আরব লিগের[৪৪] কায়রো অধিবেশনের পরই ফিলিস্তিনের অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তিকামী সংগঠন *ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন* (পিএলও) গড়ে

---

৪৩ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আনোয়ার সাদাতের মিসরই প্রথম ইসরঈলকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি মুসলিম দেশগুলোর ইসরঈলের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাবে মারাত্মক আঘাত হানে। মিসরের পর জর্দান ও সিরিয়াও হাঁটে একই পথে।

৪৪ আরব লিগ (جامعة الدول العربية) আরব দেশগুলোর সংস্থা। ১৯৪৪ সালের আলেক্সান্দ্রিয়া প্রোটোকলের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ আরব লিগ গঠিত হয়। মিসরের রাজধানী কায়রোতে এর সদরদপ্তর অবস্থিত। উদ্দেশ্য- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারস্পরিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা। আরব লিগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ- (১) কুয়েত (২) লেবানন (৩) ফিলিস্তিন (৪) কাতার (৫) জর্দান (৬) বাহরাইন (৭) সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮) লিবিয়া (৯) ওমান (১০) সৌদি আরব (১১) সিরিয়া (বর্তমানে বহিষ্কৃত) (১২) তিউনিসিয়া (১৩) ইরাক (১৪) আলজেরিয়া (১৫) মরক্কো (১৬) সুদান (১৭) জিবুতি (১৮) মিসর (১৯) ইয়েমেন (২০) মৌরিতানিয়া (২১) কমোরোস ও (২২) সোমালিয়া।

উঠে। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেওয়া দলগুলোকে যৌথ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার অংশ হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২৮ মে *ফিলিস্তিনি কংগ্রেসের* প্রস্তাব অনুযায়ী *পিএলও* প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করে আরব লিগ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমর্থন আদায়। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত *পিএলও* কার্যত ফিলিস্তিনের 'প্রবাসী সরকারের' দায়িত্ব পালন করে। বিশ্বের শতাধিক দেশ *পিএলও*কে স্বীকৃতি দেয় ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পায় সংগঠনটি। *পিএলও* প্রতিষ্ঠায় প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের। ১৯৬৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পিএলও-কে টানা ৩৫ বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন ফিলিস্তিনিদের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা *ইয়াসির আরাফাত*। আরাফাত ছিলেন ফাতাহর নেতা। ১৯৬৯ সালে ফাতাহ *ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশনে* অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি পিএলও'র চেয়ারম্যান মনোনীত হন। শুরুর দিকে ফাতাহ বা পিএলও সামরিক উপায়ে জায়নবাদী ইহুদিদের উৎখাতের চেষ্টা করলেও আশির দশকে এসে আরাফাত রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে মনোনিবেশ করেন। এসময় আলাপ-আলোচনা ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে *পিএলও*। পশ্চিমা বিশ্বকে তুষ্ট করে মজলুম ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায় করা যাবে বলে মনে করতেন আরাফাত ও তার দলের নেতারা।

ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ[৪৫]

আরাফাতের প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ*। আরাফাত প্রাথমিকভাবে এই কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। পরে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে ভোটের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তিনি নির্বাচিত হন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস পিএলও'র

---

৪৫ *ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ* ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন বা পিএলও নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনিদের স্ব-শাসন কর্তৃপক্ষ।

চেয়ারম্যান। পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ইসরাঈলের দয়া-মায়ায় বেঁচে আছে একসময়ের দাপুটে ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন-পিএলও।

ফিলিস্তিনিদের স্বাধিকার আদায়ের অন্যতম জনপ্রিয় সংগঠন হামাসকে পিএলওর সদস্য করা হয়নি। এ কারণে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে পিএলও'র জনপ্রিয়তা ও প্রভাব খুব বেশি নয়। পিএলও'র জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ, ইসরাঈল পিএলও'র সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখে অপরাপর দলের নেতাদের বেছে বেছে হত্যা করেছে, যা পিএলও এবং ইসরাঈলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির লঙ্ঘন। এসব হত্যা বন্ধে *ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ* কখনোই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এমনকি ফাতাহর ভিন্নমতাবলম্বী গুরুত্বপূর্ণ নেতাদেরকে হত্যা করলেও তারা চুপ থেকেছে। ইসরাঈলি গুপ্তহত্যার ফলে পিএলওর অন্যতম শরীক *পপুলার লিবারেশন ফ্রন্ট ফর দি ফিলিস্তিন* (পিএলএফপি) নেতৃত্বশূন্য হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ *পিএলএফপি* ফাতাহর চেয়ে ছোট হলেও সক্রিয় ও নিবেদিত ছিল।

পিএলও'র স্বীকৃতি : ১৯৭৪

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ *ফিলিস্তিন মুক্তিসংস্থাকে* (*PLO*) ফিলিস্তিন জনতার প্রতিনিধির স্বীকৃতি দেয় এবং *ইয়াসির আরাফাত* এক হাতে মেশিনগান ও অন্যহাতে শান্তির প্রতীক জয়তুনের (জলপাই) শাখা নিয়ে জাতিসংঘ অধিবেশনে উপস্থিত হন। তৃতীয় বিশ্ব ও প্রগতিশীল দেশসমূহের প্রতিনিধিরা এসময় তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দান করেন।

লেবাননে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষ : ১৯৭৫

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জর্দান কর্তৃক ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন দমন হওয়ার পর লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো

ইসরাঈলের মদদপুষ্ট *ফালাঞ্জীগোষ্ঠী*[৪৬] ও *ডানপন্থীদের* (খৃস্টান) হামলার শিকার হয়। ১৯৭৫ সালের মে মাসে কাতায়েব পার্টির (খৃস্টান) ফালাঞ্জিরা আইনে *রুমানাতে* ফিলিস্তিনি গেরিলাযোদ্ধা ও বেসামরিক শরণার্থীবাহী বাসে গুলি চালায়। এতে বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষ লেবাননের অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে যার চূড়ান্তরূপ *তেল জয়তার* শরণার্থী শিবির অবরোধ। খৃস্টান ফালাঞ্জিদের কামান হামলার পাশাপাশি খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ-পত্রের অভাবে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়। একই সময় লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে লেবাননি সমাজের রাজনৈতিক ও সরকারি কাঠামোতে তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

---

৪৬ ফালাঞ্জীগোষ্ঠী লেবাননের উগ্র-খৃস্টান সন্ত্রাসী গ্যাং। দলটি লেবানন গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৭৫-১৯৯০) দেশটিতে হিংসাত্মক তৎপরতায় জড়িত ছিল। লেবাননে শিয়া ও ইহুদি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মিলে সুন্নী মুসলিম ও ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে দলটি। শিয়া, দ্রুজ ও ইহুদিদের সঙ্গে তাদের শক্ত মৈত্রী ছিল।

১৯৭৮ সাল; মার্কিন ক্রুসেডারদের উদ্যোগে ক্যাম্প ডেভিড ষড়যন্ত্র। আনোয়ার সাদাত (বামে), মেনাখিম বেগিন (ডানে) এবং জিমি কার্টার (মাঝে)। ছবি : গভরমেন্ট মিডিয়া প্রেস

ক্যাম্প ডেভিড ষড়যন্ত্র : ১৯৭৮

ফিলিস্তিন বিপ্লবের ইতিহাসে আরব-ইসরঈল সম্পর্কের নতুন মোড় সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৭৮ সালের *ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি*। জামাল আবদুন নাসেরের পর সত্তুরের দশকের প্রথমদিকে বিশেষ করে রমজান যুদ্ধের অবসান ঘটার পর মিসর সরকার আপোষের পথে হাঁটে। ১৯৭২ সালে সাদাত মিসর থেকে সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টাদের বের করে দেয়। ১৯৭৫ সালে ইসরঈলের সঙ্গে *সিনাই চুক্তি* এবং ১৯৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেভিডে ইসরঈলি প্রধানমন্ত্রী *মেনাখিম বেগিন* ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট *কার্টারের* সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইহুদিদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় আনোয়ার সাদাত। প্রথম আরবদেশ হিসেবে দখলদার জায়নবাদী ইসরঈলকে স্বীকৃতি দিয়ে আরববিশ্বে অনৈক্য ও বিভেদের সূচনা ঘটায় মিসর।

অতীত ঘটনাপ্রবাহ এবং ক্যাম্প ডেভিডের বিশ্বাসঘাতকতা আরব জনতা ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে ব্যাপক হতাশা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার জন্ম দেয়।

লেবাননে ফিলিস্তিনিদের ওপর জায়নবাদী আগ্রাসন : ১৯৮২

১৯৮২ সালের ৬ জুন ইসরঈলি সন্ত্রাসীরা *ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশনকে* (পিএলও) নিশ্চিহ্ন করার জন্য লেবাননের ওপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক (সর্বাত্মক আক্রমণ) শুরু করে। ইহুদি সন্ত্রাসীরা ঘোষণা দেয়, আগ্রাসন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সীমিত থাকবে এবং চল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা স্থায়ী হবে। লেবাননে মোতায়েন সিরিয় বাহিনীর ওপর হামলা কিংবা লেবাননের ভূমি দখলের ইচ্ছে তাদের নেই। এছাড়া অভিযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেবাননের মাটি ত্যাগ করবে তারা- ইসরঈলের এই

ঘোষণার ফলে শিয়া সংগঠন 'হরকতে আমাল'[৪৭] জায়নবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়। জায়নিস্ট সন্ত্রাসীরা বা'কা উপত্যকায় মোতায়েন সিরিয় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলোতে অবস্থান নিয়ে আশিদিন পর্যন্ত লেবাননে আগ্রাসন চালায়। এসময় আরবদেশগুলো ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে ছিল চরম উদাসীন। আরবদের এই নিস্পৃহতার সর্বোত্তম সুযোগ গ্রহণ করে ইসরঈল।

জায়নিস্ট আগ্রাসন, পিএলও'র অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব ও শিয়াদের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষপর্যন্ত বৈরুত[৪৮] ছাড়তে বাধ্য হয় ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা। আটটি আরবদেশে বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে পড়ে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি জনতা। পিএলও'র কেন্দ্রীয় দফতর স্থানান্তর করা হয় তিউনিসিয়ায়। এই আগ্রাসন *পিএলও'র* সামরিক ভিত্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দেয় এবং তাদের দৌড়ঝাপ কূটনৈতিক তৎপরতায় সীমত করে দেয়। ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের বহু নেতা মিসর ও জর্দানের পথ অনুসরণ করে জায়নবাদী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আপোষের পথ বেছে নেয়। ইসরঈলি সন্ত্রাসীদের লেবানন আগ্রাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নোকতা, *পিএলও'র* অভ্যন্তরে বিশেষ করে *ফাতাহর* ভেতর মতভেদ তীব্র হওয়া। এ মতবিরোধ দলটির আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ও সক্ষমতায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

---

৪৭ 'হরকতে আমাল' লেবাননি *ইসনা আশারিয়া* (দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী) শিয়াদের সংগঠন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে সংগঠনটির অনুপ্রবেশ ঘটে ১৯৮৫ সালে। পুরো নাম- *হরকত আল-আমাল আস-শিয়াইয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ* (লেবাননে শিয়াদের স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন)। পরবর্তীতে কৌশলগত কারণে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'আমাল আল-ইসলামিয়্যা' (ইসলামি স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন)। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল লেবানন ও অন্য মুসলিম দেশগুলোতে শিয়াবাদের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখা। শুরুতে এর তৎপরতা লেবাননি শিয়াদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর সম্পূর্ণ নতুন নামে অপর একটি সংগঠনের জন্ম দেওয়া হয়, যা বর্তমানে 'হিজবুল্লাহ' নামে প্রসিদ্ধ।

৪৮ লেবাননের রাজধানী।

ফাতাহ'র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ; ১৯৮৩

১৯৮৩ সালের ৯ মে পিএলও'র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফাতাহ'র অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বা'কা উপত্যকায় শুরু হয়। কর্নেল আবু মুসা[৪৯] ও আবু সালেহ ছিলেন পিএলও-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ফাতাহ'র বিপ্লবী কাউন্সিলের সদস্য। সিরিয়ার সমর্থন পেয়ে আরাফাতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন তারা। ফাতাহ'র নীতিমালা পরিবর্তন এবং আলজেরিয়া, সিরিয়া ও লিবিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের দাবি জানান এই নেতারা। আস্থা সংকটের শেষ অঙ্কে রক্তাক্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটে আরাফাত-সমর্থক ও তার বিরোধীদের মাঝে। এর ফলে আরাফাত ও তার সমর্থকদেরকে লেবানন থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। জাতিসংঘের পতাকাবাহী পাঁচটি গ্রিক জাহাজে চড়ে এবং ফরাসি নৌ-বাহিনীর পাহারায় লেবাননের ত্রিপলী বন্দর হয়ে ইয়েমেন, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ার পথে রওনা হন সদলবলে আরাফাত। ফাতাহ'র বিদ্রোহীরা শুরু থেকে লিবিয়া ও সিরিয়ার বামপন্থী গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা পায়। আরাফাত-বিরোধীদের প্রতি লিবিয়া ও সিরিয়ার সমর্থন থাকায় এই দুটি দেশের বিরোধী জর্দান ও মিসরের দিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকে পড়েন আরাফাত। এরপর থেকে পিএলও'র মধ্যে আবু মুসার নেতৃত্বে *ফাতাহ ইন্তিফাদা* নামে জন্ম হয় নতুন একটি শাখা।

---

৪৯ কর্নেল সাঈদ মুসা আল-মুরাগা (কর্নেল আবু মুসা নামে অধিক পরিচিত) ১৯২৭ সালে জেরুসালেমের নিকটবর্তী সিলওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ সালে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ফিলিস্তিনি মিলিট্যান্ট গ্রুপ *ফাতাহ ইন্তিফাদার* নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৭০ সালের কালো সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জর্দান সেনাবাহিনী ছেড়ে ফাতাহয় যোগ দেন আবু মুসা। কর্নেল আবু মুসা ছিলেন নুসাইরি হাফেজ আসাদের ঘনিষ্ঠ ও বা'ছপন্থী।

বৈরুতে মার্কিন ও ফরাসি নৌ-সেনা ঘাঁটিতে বিস্ফোরণ :

২৩ অক্টোবর ১৯৮৩

১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাঈলি সেনা আগ্রাসন ও বৈরুত পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার ফলে লেবাননে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইতালির বহুজাতিক বাহিনীর আগমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। জায়নবাদী আগ্রাসীরা শুরুতে লেবাননের অভ্যন্তরে ৪০-৪৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি অভিযানের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে। কিন্তু পরে তারা বৈরুতে অবরুদ্ধ *ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশনের* পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও লেবানন থেকে পিএলওর সম্পূর্ণ বহিষ্কারের দাবি জানায়। এ দাবি পূরণের জন্য পশ্চিম বৈরুতের ওপর বিরামহীন বোমাবর্ষণ চালাতে থাকে সন্ত্রাসী ইসরাঈল। *সাবরা* ও *শাতিলা* শরণার্থী শিবিরে জাতিসংঘ কর্মীদের চোখের সামনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

জায়নিস্টদের অব্যাহত সন্ত্রাসের মুখে মুসলিমবিশ্ব থেকে সহযোগিতা না পাওয়ায় লেবানন সরকার ও পিএলও ফিলিস্তিনি ইউনিটগুলোকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়- ফিলিস্তিনিদের অপসারণ পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে বহুজাতিক বাহিনী বৈরুতে অবস্থান নেবে। বহুজাতিক বাহিনীর মধ্যে ছিল- আমেরিকা ও ফ্রান্সের আটশ ও ইতালির চারশ' সেনা। ১৯৮২ সালের ২১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর বহুজাতিক বাহিনী লেবানন থেকে পিএলও সৈন্যদের নির্বাসন তদারকি করে।

২৯ সেপ্টেম্বর বৈরুতে ইসরাঈলি বাহিনীর পরিত্যাগকৃত অঞ্চলে মার্কিন সেনাবহর প্রবেশ করে। বহুজাতিক নামের পশ্চিমা বাহিনী 'শান্তি ও নিরাপত্তা' রক্ষা, বিবদমান দলগুলোর মাঝে 'শান্তি আলোচনা' এবং বৈরুতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অবসানের বাহানায় নিজেদের উপস্থিতির মেয়াদ বাড়াতে থাকে লেবাননে। মার্কিন ক্রুসেডারদের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী সুন্নী ইসলামি দলগুলোকেও ভয়ভীতি দেখিয়ে অবদমিত করার অপচেষ্টা করে। ১৯৮৩ সালের ২৩ অক্টোবর বহুজাতিক বাহিনীর ঘাঁটিগুলো মুজাহিদদের

'ইশতেশহাদি হামলার'[৫০] শিকার হয়। বৈরুতে অবস্থানরত মার্কিন নৌ-বাহিনীর ঘাঁটিতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ছয় মিনিট পরই ফরাসি ছত্রী সেনার ঘাঁটিও একই কায়দায় বিস্ফোরিত হয়। এ হামলায় নিহত হয় ২৪১ মার্কিন নৌ-সেনা ও ৫৮ ফরাসি ছত্রী সেনা। এই বিস্ফোরণ ছিল *ভিয়েতনাম যুদ্ধের* পর মার্কিন সৈন্যদের ওপর এবং *আলজেরিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের* পর ফরাসি সৈন্যদের ওপর গুরুতর সামরিক ও রাজনৈতিক আঘাত। এর ফলে বহুজাতিক বাহিনীর শান-শওকত ও এদের সৃষ্ট ভীতি নস্যাৎ হয়ে যায় এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনে মুসলমানদের বিপ্লবী মনোবল প্রবল হয়ে উঠে।

শিবির যুদ্ধ : ১৯৮৫-১৯৮৭

১৯৮৫ সালের ১৯ মে থেকে ১৯৮৭ সালের শুরুর দিকে প্রায় দেড় বছর লেবাননের শিয়া সংগঠন *আমাল* ও বৈরুতের শরণার্থী শিবিরের অবশিষ্ট ফিলিস্তিনি গেরিলাদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শিয়া সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো অবরুদ্ধ করে রাখে। এ দীর্ঘ যুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের ঐক্য বিনষ্ট ও তাদের মাঝে স্থায়ীভাবে বিভেদের বীজ বুঁনে দেয়। লেবাননে

---

৫০ শত্রুর সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে স্ব-শরীরে দুশমনের বুহ্যের ভেতর ঢুকে আঘাত হানা। মুসনাদে আহমদের একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن نعيم بن همار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم:أي الشهداء أفضل قال: الذين إن يلقوا
في الصف يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك
إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه

'জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সর্বোত্তম শহীদ কে?' রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সর্বোত্তম শহীদ হলেন তাঁরা যারা সম্মুখভাগে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন না যতোক্ষণ না মৃত্যু এসে যায়। এরপর তাঁদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ তাঁদের প্রতি হাসেন। তোমাদের রব দুনিয়াতে যে বান্দাকে দেখে হাসেন তার হিসেব হবে না'।' (মুসনাদে আহমদ, সহিহ আল-জামি)

ফিলিস্তিনিদের অবস্থান এবং ইসরাঈল বিরোধী অভিযান চালানোর অজুহাতে ১৯৮২ সালে ইসরাঈলি আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে *আমাল* চাচ্ছিল না ফিলিস্তিনিরা এখানে স্থায়ী হোক। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা উদ্দেশ্য ছিল, লেবাননে অবস্থান করে পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করা। এজন্য তাদের স্থানীয় সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই বাকযুদ্ধ শেষপর্যন্ত ফিলিস্তিনি গেরিলা ও শিয়া সংগঠন *আমালের* মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় যা প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলি স্বার্থের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। এ যুদ্ধের ফলে *আমালের* বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফিলিস্তিনি গ্রুপের ভেতর অভিন্ন নীতি-অবস্থান গ্রহণের সুযোগ আসে এবং ফাতাহ নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা পোষণকারীরা *ফাতাহ ইন্তিফাদার* দিকে ঝুঁকে পড়ে। শিয়া সংগঠন আমালের ভেতরেও কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা ও নেতৃত্বের নীতি-অবস্থান প্রশ্নে সমালোচনা ও সংশয় তৈরি হয়। এছাড়া জনসমক্ষে ইহুদিসৃষ্ট শিয়াদের দ্বিচারিতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

আশির দশকে লেবাননে সংঘটিত ঘটনাবলি সামগ্রিকভাবে ইসরাঈল বিরোধী সংগ্রামী ফ্রন্টকে বিশুদ্ধতার দিকে এগিয়ে নেয়। এ নবশক্তি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ঈমানি দায়-দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে আপোষ-আলোচনার পরিবর্তে সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে আমেরিকা-ইসরাঈলের যাবতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন করে তোলেন।

বিপ্লবের নয়া তরিকা; 'ইন্তেফাদা'

মুসলিমবিশ্বের আত্মমর্যাদাহীন সরকারগুলো মুসলমানদেরকে স্বৈরাচার বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও ইসলামি জাগরণের তাত্ত্বিক দিকটিকে ম্লান করে দেখতে বাধ্য করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব জাতীয়তাবাদ'কে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হচ্ছিল যার প্রধান চিন্তক ছিল খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী মাইকেল আফলাক[৫১]। ফিলিস্তিনি জনগণ মুসলিম হলেও তাদের সংঘবদ্ধ ও

---

৫১ মাইকেল আফলাক (১৯২০-জুন ১৯৮৯) সিরিয় দার্শনিক ও আরব জাতীয়তাবাদী। আরববিশ্বে বা'ছিজমের প্রতিষ্ঠাতা। আফলাকের চিন্তাধারা বা'ছিজমে আত্মীকৃত করা হয় যেখানে

সংহত হওয়ার সূত্রটি ইসলাম ছিল না, ছিল *আরব জাতীয়তাবাদ*। এ কারণে ফিলিস্তিনিরা ইসলামি, খৃস্টিয় ও সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে কাজ করতো। কিন্তু এগুলো তাদেরকে তাওহিদ-বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ জিহাদে উজ্জীবিত করতে পারেনি। ইরানের শিয়ারা শাহের[৫২] বিরুদ্ধে নাশকতার প্রশিক্ষণ নিতো ফিলিস্তিনি শিবিরগুলো থেকে। ফলে ফিলিস্তিনি গেরিলা গ্রুপগুলোর সঙ্গে গড়ে উঠে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ১৯৭৮ সালে ইরানে শিয়া বিপ্লবের গতিধারা তুঙ্গে উঠলে 'আজ ইরান কাল ফিলিস্তিন' শ্লোগান ফিলিস্তিনিদের সামান্য হলেও আশান্বিত করে। কিন্তু শিয়া বিপ্লবকেন্দ্রিক সমস্ত আশা ফিলিস্তিনিদের জন্য গুড়েবালি হয়েই থেকেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের[৫৩] নেতৃত্বে *প্রাচ্যব্লক* ও *প্রগতিশীল দেশগুলো* ছিল বাহ্যত ফিলিস্তিনি গেরিলা গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষক। এই পৃষ্ঠপোষকতার

আরববিশ্বকে একটি *একক আরব-জাতি* রূপে একতাবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়। বা'ছিস্ট চিন্তাধারায় গুরুত্ব দেওয়া হয়, স্বাধীনতা ও আরব বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ *আরব সমাজবাদকে*। আফলাক ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খৃস্টান। সিরিয়ার 'প্রথম সুফিয়ানি শাসক' হাফেজ আসাদের এবং ইরাকে সাদ্দাম হুসাইনের দীক্ষাগুরু ছিলেন তিনি। ইরাক ও সিরিয়ায় শাসনক্ষমতা দখল করে বা'ছরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইরাক থেকে ইসলামকে নির্বাসিত ও সিরিয়ায় মূর্তি-সংস্কৃতিসহ আরব-জাতীয়তাবাদকে নতুন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

৫২ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী ইরানি রাজতন্ত্রের শেষ শাসক। ১৯৭৯ সালে শিয়াবিপ্লবের মাধ্যমে তার পতন হয়। সেক্যুলার 'মুসলিম' রেজা শাহ ইরানে রেজা খান নামেও পরিচিত। জন্ম ১৯১৯ সালের ২৬ অক্টোবর। ইরানের শাসন ক্ষমতায় বসেছিলেন ১৯৪১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি খোমেনীর নেতৃত্বে সংঘটিত শিয়াবিপ্লবে রেজা শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। পাহলভী বংশের তিনি দ্বিতীয় ও শেষ শাসক ছিলেন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় ১৯৮০ সালের ২৭ জুলাই মিসরে তার মৃত্যু হয় এবং রাজধানী কায়রোতে তাকে দাফন দেওয়া হয়।

৫৩ সোভিয়েত ইউনিয়ন ধর্মবিদ্বেষী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র যার অস্তিত্ব ছিল ১৯২২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটলে ১৫টি নতুন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। এই দেশগুলোর বেশিরভাগ রুশ কম্যুনিস্টরা জবরদখল করেছিল। ভ্লাদিমির লেনিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে সংগঠিত অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি ১৯১৮ সালে। মধ্যএশিয়ার মুসলিম দেশগুলো দখল ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করে আশির দশকে

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই দেশগুলোর কোনো একটিও ইসরঈলের অস্তিত্ব বিরোধী ছিল না। জায়নিস্টদেরকে তারা বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছে।

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে আম্মানে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনেও ইহুদি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ন্যূনতম নীতি-অবস্থানও গ্রহণ করা হয়নি। সম্মেলনের সব মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল ইরান-ইরাক যুদ্ধের দিকে এবং সামগ্রিকভাবে এ সম্মেলন ক্যাম্প ডেভিড লাইন ধরেই এগিয়ে যায়। এদিকে ফিলিস্তিনি জাতি বছরের পর বছর অপেক্ষা করছিল আরববিশ্ব তাদেরকে নাজাত দেবে বাস্তুহারার অনিশ্চয়তা থেকে। বিশেষত, অধিকৃত ফিলিস্তিনে বসবাসরত ফিলিস্তিনি জনগণ তাকিয়ে ছিল আরব সরকারগুলোর দিকে।

ফিলিস্তিনের মজলুম জাতি তাদের গেরিলা গ্রুপগুলোর ভোগ-বিলাস, বিভেদ-অনৈক্য ও দলাদলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ফিলিস্তিনি জনতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার প্রতি আরব সরকারগুলোর প্রকাশ্য উদাসীনতা ও অবহেলা প্রত্যক্ষ করে আরব জাতীয়তাবাদী চিন্তা-দর্শনের কার্যকারিতা এবং সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। ১৯৮৭ সালের হেমন্তে অধিকৃত ফিলিস্তিনি জনসাধারণ ইসরঈলের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ঘটান- যার নাম দেওয়া হয় *ইন্তিফাদা*। ইন্তিফাদা অর্থ 'নাড়া দেওয়া, নড়ে ওঠা, ঝাঁকুনি দেওয়া'। পাখি যেমন গোসল সেরে ভেজা শরীর হালকা করা ও আকাশে উড়বার জন্য পাখা ঝাঁপটায়, এমন ধরনের নাড়াকে বলে *ইন্তিফাদা*। ইন্তিফাদার পূর্বপর্যন্ত সমস্ত আন্দোলন ও অভ্যুত্থান ছিল বিশেষ

আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায় রুশ লাল ফৌজ। দশ বছর আফগানদের হাতে ভয়ঙ্করভাবে পর্যদুস্ত হয়ে ভেঙে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন। রাশিয়া ফিরে যেতে বাধ্য হয় ১৯১৭ সালের আগের সীমানায়। অপমৃত্যু ঘটে বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর আগ্রাসী হয়ে উঠা এক অপশক্তির। (*Impressions of Soviet Russia, by John Dewey*)

৫৪ ২২ সদস্যের আরব লিগ দুই বছর পর পর আরব শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে অংশ নেন সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।

কোনো দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৫৫] কিন্তু ১৯৮৭'র ইন্তিফাদার আগে-পরে কোনো বিশেষণ যুক্ত হয়নি। এই ইন্তিফাদা ছিল ফিলিস্তিনি জনগণের গণপ্রতিবাদ বা গণঅভ্যুত্থান। জবরদখল ও জায়নবাদী ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পর ইন্তিফাদার ফলে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি জনগণ আক্রমণাত্মক অবস্থানে এবং ইসরাঈলিরা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় যেতে বাধ্য হয়।

গাজা-আরিহা আপোষ

ইন্তিফাদা শরণার্থী ফিলিস্তিনিদের মাঝে দেখা দেয় আশা-ভরসার আলোকচ্ছটা হয়ে। ইসরাঈল গুরুতর বিপদের আভাষ পেয়ে তৈরি হয় আপোষের জন্য। এতোদিন ফিলিস্তিনিদের ন্যূনতম ও নামকাওয়াস্তে স্বীকৃত অধিকারসম্বলিত যাবতীয় ইশতেহার ও পরিকল্পনাকেও সন্ত্রাসীরা শক্ত হাতে দাবিয়ে রেখেছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ ও ৩৩৮ নম্বর ইশতেহারকে তারা অস্বীকার করেছে। *রিগান শান্তি পরিকল্পনা*সহ এধরনের বহু পরিকল্পনা জায়নিস্ট সন্ত্রাসীরা পিষ্ট করেছে পদতলে। এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ইহুদি সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিন নামে কোনো জাতির ঐতিহাসিক পরিচয়কে ভিত্তিহীন বা তাদের লক্ষ্যের পথে গুরুতর বাধা মনে করতো। কিন্তু ইন্তিফাদার আতঙ্কে আমেরিকা ও ইসরাঈল পিএলও'র সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। সোভিয়েতের পতন এবং একমেরু বিশ্বব্যবস্থার সুবাদে পশ্চিমারাও চাচ্ছিলো দ্রুত সঙ্কটের কেন্দ্রগুলো বিশেষ করে বৈশ্বিক বিপদাপদের উৎস মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি ও সংকটের আগুনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। যাতে ইসলামপন্থী আন্দোলনগুলোকে ঠেকানো বা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের সুবিধাবাদী মহল ইন্তিফাদাকে নিজেদের হাতে আলোচনায় দরকষাকষি ও

---

৫৫ ১৯৮৩ সালের মে মাসে আরাফাতের নেতৃত্বাধীন আল-ফাতাহ থেকে আলাদা হয়ে যায় 'ফাতাহ আন্দোলন'। এটি 'ফাতাহ ইন্তিফাদা' নামে পরিচিত।

সুবিধা আদায়ের ধারালো অস্ত্র মনে করে পা দেয় আপোষ আলোচনার পাতানো ফাঁদে।

১৯৯৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশনের চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত সন্ত্রাসী আইজাক রবিনের[৫৬] কাছে লিখিত এক পত্রে ইসরঈলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক বিধি ও ইশতেহার মেনে নেওয়ার কথা জানায়। এই চিঠিতে পিএলও সনদের যে অংশে ইসরঈলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে তা বাতিল বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। আইজাক রবিন একই দিন জবাবিপত্রে ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশনকে ফিলিস্তিনি জনতার প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি ইসরঈলি ক্যাবিনেটে অনুমোদন করিয়ে নেয়। ইয়াসির আরাফাত ও আইজাক রবিন খুচরা আলাপের পর সতেরো দফাবিশিষ্ট এক খসড়া সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে। এ সমঝোতায় জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের কিছু এলাকা (আরিহা) ও গাজা অঞ্চলের ওপর ফিলিস্তিনিদের

---

৫৬ আইজাক রবিন (১ মার্চ ১৯২২- ৪ নভেম্বর ১৯৯৫) ম্যান্ডেটরি ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে জন্মগ্রহণকারী ইসরঈলি রাজনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী। পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দুই মেয়াদে ইসরঈলি জায়নবাদীদেরকে নেতৃত্ব দেয়। ১ মার্চ ১৯২২ সালে জেরুসালেমের শারে জেদেক মেডিক্যাল সেন্টারে তার জন্ম। ইউরোপ থেকে তৃতীয় পর্যায়ে ফিলিস্তিনে বসতিস্থাপনকারী নেহেমিয়া ও রোজা দম্পতির সন্তান আইজাক রবিন। নেহেমিয়া রুবিতজভ ইউক্রেনের সিদরোভিচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল। গোল্ডামেয়ারের পদত্যাগের পর ১৯৭৪ সালে ইসরঈলের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয় আইজাক রবিন। প্রথম মেয়াদে সিনাই অন্তর্বর্তী চুক্তিতে স্বাক্ষর ও এনতেবে এলাকা অবরোধের আদেশ দেয়। আর্থিক কেলেঙ্কারির কারণে ১৯৭৭ সালে পদত্যাগে বাধ্য হয়। ১৯৮০-এর দশকের অধিকাংশ সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল। এসময় সূত্রপাত ঘটে ফিলিস্তিনিদের প্রথম ইন্তিফাদা'র। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়। ইসরঈল-ফিলিস্তিন 'শান্তি প্রক্রিয়ার' সূত্রপাত ঘটায়। ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অসলো চুক্তিসহ বেশ কয়েকটি ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদন করে রবিন। ১৯৯৪ সালে জর্দানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর ইসরঈলের কট্টর ইহুদি ধর্মাবলম্বী ও শান্তি প্রস্তাব বিরোধী ইগাল আমিরের হাতে নিহত হয় আইজাক রবিন। (*Jewish Virtual Library, Yitzhak Rabin*)

স্বায়ত্বশাসন মেনে নেওয়া হয়। আমেরিকা-ইসরঈল কর্তৃক এ চুক্তি মেনে নেওয়ার আসল মতলব ছিল ফিলিস্তিনিদের ভেতর ফাটল ধরানো। যার ফলে ইন্তিফাদার বিপ্লবী আগুন ফিলিস্তিনিদের দিয়েই নিভিয়ে দেওয়া যায়। আপোষ-সমঝোতার ফল ছিল, প্রতিক্রিয়াশীল আরব সরকারগুলোর ইসরঈলকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে বিদ্যমান বাধা দূর হওয়া। ইসরঈলের তরফে এধরনের চুক্তি এক ধরনের পশ্চাদপসারণ। কিন্তু এর কারণ ছিল ইন্তিফাদার বিপদ সম্পর্কে ইসরঈলিদের ভয় ও উদ্বেগ। নিশ্চিত করে বলা যায়, এ সমঝোতা ফিলিস্তিনি জাতির মুক্তিসংগ্রামের সুমহান লক্ষ্য-আদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কেননা, ইসরঈলকে স্বীকৃতি দেওয়া মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এ অপরাধের দায় শুধু আরাফাত ও পিএলও'র ঘাড়েই বর্তায় না। বরং আপোষকামী তৎপরতার ফলাফল পরবর্তীতে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জায়নিস্ট পরিকল্পনায় রূপ নিয়েছে।

ফিলিস্তিন নিয়ে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও একথা বলা যায়, ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ-জিহাদ ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের মূলে প্রোথিত এক শক্তিশালী অস্ত্র, জায়নবাদী সন্ত্রাসের সমস্ত কলা-কৌশলকে যা ব্যর্থ করে দিতে পারে। বিরামহীন জুলুম ও বর্বরতার পরও ফিলিস্তিনি জনসাধারণের ঈমান ও আদর্শ আজ এমন একটি ফলবান বৃক্ষ, যার শিকড় জমিনের সুগভীরে প্রোথিত এবং এর মোকাবেলার ক্ষমতা জায়নবাদের কখনোই হবে না। ফিলিস্তিনের মুক্তির জিহাদ ও এর প্রতি মুসলিমবিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থন এ আন্দোলনকে এক বিশালদেহী চিরসবুজ ও জটাজাল বিস্তারকারী বৃক্ষে পরিণত করেছে, জায়নবাদের উৎখাতই যার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله

'ততোক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতোক্ষণ না তোমরা ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (সে যুদ্ধ হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহুদিরা পাথর ও গাছের আড়ালে লুকোবে)। পাথর ডেকে (ডেকে) বলবে, 'হে মুসলিম! আমার পেছনে ইহুদি লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা করো'।' (সহিহ বুখারি : হাদিস নং-২৭৬৮)

তোমরা
থর ও
আমার
৬৮)

মুছে ফেলা ইতিহাস

মুসলিমবিশ্বকে খণ্ডিত করার বৃটিশ ষড়যন্ত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী *লিগ অব নেশনস* (জাতিসংঘের আদিরূপ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। *লিগ অব নেশনসের* অন্যতম দায়িত্ব ছিল, বিজিত উসমানি অঞ্চলগুলোকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া। *লিগ অব নেশনস* সম্পূর্ণ আরব অঞ্চলকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে (যাকে ম্যান্ডেট বলা হয়)। এরপর এসব ম্যান্ডেট তুলে দেওয়া হয় বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে...

মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া ষড়যন্ত্রের এক মর্মান্তিক ও নিকৃষ্ট উদাহরণ। একশো বছর আগেও সমগ্র আরবঅঞ্চল উসমানি খেলাফতের অংশ ছিল। উসমানি খেলাফত বিশাল বহুজাতিক একটি রাষ্ট্র, যার কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল ইস্তাম্বুল। বর্তমানে আরববিশ্বের মানচিত্রকে জটিল গোলকধাঁধার মতো মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বেশ কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার মাধ্যমে উসমানি খেলাফতের পতন এবং নতুন জাতীয়তাবাদী এসব রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানো হয়। নবসৃষ্ট এই রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব সীমানা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড ও মুসলিমদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তায় বিভক্ত করে ফেলে। এসব ঘটনার আড়ালে অনেক কার্যকারণ থাকলেও বৃটেনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিবদমান পক্ষগুলোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ৩টি আলাদা চুক্তিতে পরস্পর-বিরোধী অঙ্গীকার করে বৃটেন। এসব চুক্তির ফলে মুসলিমবিশ্বের একটি বিশাল অংশ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। যার বিষবাষ্প ও প্রতিক্রিয়া ক্রিয়াশীল এখনো পর্যন্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ১৯১৪-১৯১৮

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে ইউরোপজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের জটিল প্রক্রিয়া, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, উপনিবেশিক বাসনা ও সরকারগুলোর উচ্চপর্যায়ে অব্যবস্থাপনা প্রভৃতি মিলিয়ে সূচনা ঘটে এক প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধের। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলমান এই যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং অক্ষশক্তিতে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি।

প্রথমদিকে উসমানি খেলাফত নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা, তারা যুদ্ধরত জাতিগুলোর মতো অতোটা শক্তিশালী ছিল না এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা সমস্যায় আক্রান্ত ছিল। ১৯০৮ সালের শেষে শক্তিশালী খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে 'তিন পাশা' (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী ও নৌ-মন্ত্রী) উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করে। এরপর থেকে খলিফা পদটি কেবল প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই 'তিন পাশা' ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী 'তরুণ তুর্কি'[৫৭] গ্রুপের সদস্য। উসমানিয়রা আগে থেকে ইউরোপের নানা শক্তির কাছে বিশাল অঙ্কে ঋণগ্রস্ত ছিল। এসব ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা তখন তাদের ছিল না। ঋণ মুক্তির লক্ষ্যে দাতাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিশ্বযুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করা হয়। মিত্রশক্তিতে যোগদানে ব্যর্থ হয়ে ১৯১৪ সালের অক্টোবরে তারা অক্ষশক্তিতে (বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির পক্ষে) যোগ দেয়। শুরু থেকে বৃটিশের পরিকল্পনা ছিল উসমানি খেলাফতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে মধ্যপ্রাচ্যে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের। ১৭৫৭ সালে বাংলা ও এরপর

---

৫৭ তরুণ তুর্কি বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯০৮ সালে। তুর্কি জাতীয়তাবাদী, পাশ্চাত্যপন্থী সেক্যুলার, আরমেনিয় ও গ্রিকদের মতো সংখ্যালঘুসহ বেশ কিছু সংস্কারপন্থী গ্রুপ এই বিপ্লবের অনুঘটক ছিল। কথিত বিপ্লবের পর সংসদ ও ১৮৭৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করা হয়। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ১৮৭৮ সালে এগুলো স্থগিত করেছিলেন। এই বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যের সীমানা ভেঙে পড়ে।

ভারতবর্ষ এবং ১৮৮৮ সালে মিসরের দখল নেয় বৃটিশ ক্রুসেডাররা। উসমানি খেলাফতের অবস্থান ছিল তাদের এই দুটি উপনিবেশের ঠিক মধ্যখানে। ফলে বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে উসমানি খেলাফতকে ধ্বংস করতে একের পর এক চক্রান্তের জাল ফেলতে থাকে এরা।

আরব বিদ্রোহ : ১৯১৬

বৃটেনের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল উসমানি খেলাফতের আরব জনগণকে উস্কে দেওয়া। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমের এলাকা হেজাযের এক ব্যক্তিকে তারা তৎক্ষণাৎ পেয়েও যায়। মক্কার গভর্নর শরীফ হুসাইন বিন আলী উসমানি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শর্তে বৃটেনের সঙ্গে গোপনে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শরীফ হুসাইন নিজের মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করার এই বৃটিশ পরিকল্পনায় কেন অংশ নিয়েছিলেন তার নিশ্চিত কারণ জানা যায়নি। সম্ভাব্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- তিন পাশা কর্তৃক তুর্কি জাতীয়তাবাদ (ও সেক্যুলারিজম) বাস্তবায়নের চেষ্টায় তার অসন্তোষ, উসমানি সরকারের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মনোবাসনা। যে কারণেই হোক না কেন বৃটেনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে শরীফ হুসাইন উসমানিয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেন। অন্যদিকে বৃটেন বিদ্রোহীদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অর্থ ও অস্ত্র ছাড়া উসমানিয়দের সুসংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠা সম্ভব ছিল না। বৃটেন তাদের এও প্রতিশ্রুতি দেয়, যুদ্ধের পর শরীফ হুসাইনকে ইরাক ও সিরিয়াসহ সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ মিলিয়ে একটি বিশাল আরবরাজ্যের অধিপতি করা হবে। দুইপক্ষের (বৃটেন ও শরীফ) মধ্যকার এ সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি বিষয়ক চিঠিগুলো ইতিহাসে *McMahon-Hussein Correspondence* (ম্যাকমেহন-হুসাইন পত্রবিনিময়) নামে পরিচিত।

এই ম্যাকমেহন মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার হেনরি ম্যাকমেহন, যার সঙ্গে শরিফের গোপন আঁতাত চলছিল। ১৯১৬ সালের জুনে শরীফ হুসাইন তার সশস্ত্র আরব বেদুঈনদের নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন। কয়েক মাসের মধ্যে

বৃটিশ সেনা ও নৌ-বাহিনীর সহায়তায় আরব বিদ্রোহীরা মক্কা ও জেদ্দাসহ হেজাযের বেশ কয়েকটি শহর দখলে নিতে সক্ষম হয়। বৃটিশেরা সৈন্য, অর্থ, অস্ত্র, পরামর্শদাতা (যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'লরেন্স অব এ্যারাবিয়া'-খ্যাত বৃটিশ গোয়েন্দা এডওয়ার্ড লরেন্স) এবং একটি পতাকা দিয়ে বিদ্রোহীদের সহায়তা করে। এটি 'আরব বিদ্রোহীদের পতাকা' নামে পরিচিতি পায়। এই পতাকাই পরবর্তীতে অন্যান্য আরবদেশ যেমন- জর্দান, ফিলিস্তিন, সুদান, সিরিয়া, কুয়েত প্রভৃতির পতাকা তৈরিতে মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন আরব বিদ্রোহীরা উসমানিয়দের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর দখলে নিতে সক্ষম হয়। একদিকে বৃটিশেরা বাগদাদ ও জেরুসালেম দখল করে ইরাক ও ফিলিস্তিনে তাদের অবস্থান সংহত করে, অন্যদিকে আরব বিদ্রোহীরা আম্মান ও দামেশক দখল করে বৃটিশের কাজ সহজ করে দেয়। আরব জনসাধারণের অধিকাংশেরই এই বিদ্রোহে সমর্থন ছিল না। বরং এটি ছিল (ক্ষমতালোভী) কতিপয় নেতার নেতৃত্বাধীন একটি ছোট আন্দোলন যা ওই নেতাদের নিজস্ব ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। অধিকাংশ আরব যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে এবং উসমানিয় বা বিদ্রোহী কোনো পক্ষকেই তারা সমর্থন দেয়নি। শরীফ হুসাইনের *আরবরাজ্য* বানানোর বাসনা ঠিকঠাক এগিয়ে চললেও বৃটেনের সঙ্গে অন্যান্য পক্ষের করা আঁতাতগুলো চলছিল ভিন্ন পথে।

সাইক্স-পিকট (*Syches-Picot*) চুক্তি : ১৯১৫-১৯১৬

আরব বিদ্রোহ শুরুর আগেই এবং শরীফ হুসাইন তার আরবরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বৃটেন ও ফ্রান্সের ছিল ভিন্ন পরিকল্পনা। ১৯১৫-১৬ এর শীতকালে বৃটেনের *স্যার মার্ক সাইক্স* ও ফ্রান্সের *ফ্রান্সিস জর্জেস পিকট* উসমানি খেলাফত পরবর্তী আরববিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণে গোপন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। আরববিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার এই চুক্তিটি পরবর্তীতে *সাইক্স-পিকট চুক্তি* নামে পরিচিতি পায়। বৃটিশেরা বর্তমানে জর্দান, ইরাক, কুয়েত নামে পরিচিত এলাকাগুলোর দখল নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।

ফ্রান্সের জন্য থাকে বর্তমান সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্ক। জায়নিস্টদের ইচ্ছাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ফিলিস্তিনের দখল নেওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের দখলকৃত অঞ্চলগুলোর কিছু কিছু জায়গায় আরবদেরকে সীমিত মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তাদের ওপর ইউরোপিয় শাসনব্যবস্থাই কর্তৃত্বশীল থাকে। চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য এলাকায় বৃটেন ও ফ্রান্স নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব লাভ করে।

মুসলিমবিশ্বকে খণ্ডিত করেছিল দুই শয়তান। ফ্রান্সিস জর্জেস পিকট (বামে) ও মার্ক সাইকস (ডানে)

সাইক্স-পিকট ষড়যন্ত্র যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যে করণীয় বিষয়ক একটি গোপন চুক্তি ছিল, কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক সরকার একে সবার সামনে উন্মোচন করে দেয়। কেননা, রাশিয়াও ছিল চুক্তির অংশীদার। কিন্তু তারা ছিল দুর্বল পক্ষ। *সাইক্স-পিকট চুক্তি* প্রকাশ পাওয়ার পর বৃটিশের দ্বিচারিতা উন্মোচিত হয়ে যায়। এই চুক্তির আলোকে শরীফ হুসাইনকে দেওয়া বৃটেনের প্রতিশ্রুতির মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে বৃটেন ও আরব বিদ্রোহীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটিই বৃটেনের করা সর্বশেষ পরস্পর বিরোধী চুক্তি ছিল না চিত্রনাট্যের আরো অনেক অংশই তখনো অবশিষ্ট ছিল।

বেলফোর ঘোষণা : ১৯১৭

বৃটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়াই শুধু নয় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল জায়নিস্ট ইহুদি অপশক্তিও। জায়নিজম একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যারা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে 'ইহুদিরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। এই আন্দোলনের সূচনা ১৯ শতকে এবং এর লক্ষ্য ছিল ইউরোপের ইহুদিদের জন্য (পোল্যান্ড, জার্মানি ও রাশিয়ার বাসিন্দা) ইউরোপের বাইরে একটি আবাসভূমি খুঁজে বের করা।
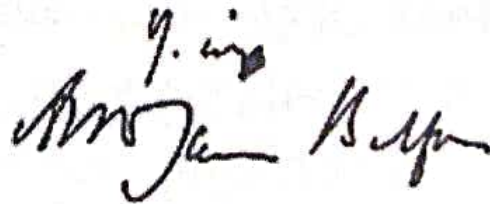
Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours sincerely,
Arthur James Balfour

ইহুদি রথসচাইল্ডকে লেখা ক্রুসেডার বেলফোরের চিঠি। ছবি : মিডিয়া কমন্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন জায়নিস্টরা বৃটিশ সরকারের কাছে যুদ্ধোত্তর ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা চায়। অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের ভেতরেও এমন অনেক কর্মকর্তা ছিলেন যারা এই রাজনৈতিক আন্দোলনের

প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদের অন্যতম ছিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব *আর্থার বেলফোর*। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বেলফোর জায়নিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা *ব্যারন রথসচাইল্ড*কে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে তিনি ফিলিস্তিনে 'ইহুদিরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সরকারি সমর্থন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বেলফোর ঘোষণায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়–

> 'মহামান্য (বৃটিশ রাজার) সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় বসতি স্থাপনের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, এমন কিছুই করা হবে না যাতে ফিলিস্তিনে বিদ্যমান অ-ইহুদি (অন্যান্য ধর্মাবলম্বী) সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হয় অথবা অন্য কোনো দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের উপভোগকৃত অধিকার ও রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষতিসাধন হয়'।

তিনটি পরস্পর-বিরোধী চুক্তি

বৃটিশরা ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনটি ভিন্ন পক্ষের সঙ্গে তিনটি আলাদা চুক্তি করে এবং এই তিনটি ভিন্ন চুক্তিতে আরববিশ্বের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়-

(১) বৃটেন আরবদেরকে আশ্বাস দেয়- তারা শরীফ হুসাইনের মাধ্যমে আরববিশ্বের কর্তৃত্ব পাবে।

(২) ফ্রান্স ও বৃটেন চুক্তি করে- ঠিক ওই এলাকাগুলোই বৃটেন ও ফ্রান্স ভাগ করে নেবে।

(৩) বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী জায়নবাদীরা (বৃটেন তথা ইউরোপিয়দের সাহায্যে) ফিলিস্তিন পাওয়ার আশা করে।

১৯১৮ সালে মিত্রশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে উসমানি খেলাফতের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে। উসমানিয়রা ১৯২২ পর্যন্ত নামেমাত্র টিকে থাকে। খলিফার পদটি প্রতীকীরূপে বহাল থাকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধপরবর্তী উসমানিয়দের অধীনে থাকা সমস্ত অঞ্চল পরিণত হয় ইউরোপিয় উপনিবেশে। একটি বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য আটকা পড়ে যায় তিনটি পক্ষের পরস্পরবিরোধী বিতর্কের মধ্যে।

কোন পক্ষ অবশেষে বিজয় লাভ করেছে?

প্রকৃতপক্ষে কেউ তাদের পূর্ণ চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী *লিগ অব নেশনস* (জাতিসংঘের আদিরূপ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। *লিগ অব নেশনসে*র অন্যতম দায়িত্ব ছিল বিজিত উসমানিয় অঞ্চলগুলোকে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়া। *লিগ অব নেশনস* সম্পূর্ণ আরব অঞ্চলকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে (যাকে ম্যান্ডেট বলা হয়)। এসব ম্যান্ডেট বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘোষণা করা হয়, এই ম্যান্ডেটগুলো বৃটেন ও ফ্রান্স দ্বারা শাসিত হবে যতোদিন না ওই ছোট অঞ্চল বা ম্যান্ডেটটি নিজেই নিজের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে সামর্থ্যবান হয়। এই *লিগ অব নেশনস*-ই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন সীমানা আরোপ করে যা আমরা বর্তমান মানচিত্রে দেখতে পাই। এই সীমানাগুলো আরোপিত হয় স্থানীয় জনগণের কোনো প্রকার মতামত ছাড়াই।

জাতিগত, ভৌগলিক অথবা ধর্মীয়- এই তিনটি পরিচয়ের কোনোটিই এর জন্য বিবেচনায় আনা হয়নি। এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী একটি সিদ্ধান্ত। আরববিশ্বের এই রাজনৈতিক সীমানাগুলো কোনোভাবেই বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি নির্দেশ করে না। ইরাকি, সিরিয়া, জর্দানি ইত্যাদি পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে ইউরোপিয় উপনিবেশবাদীদের কর্তৃক তৈরি করা হয় আরবদেরকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে ফেলার পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা থেকে। ম্যান্ডেট সিস্টেমের মাধ্যমে বৃটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তার কাঙ্ক্ষিত দখল বুঝে পায়। অন্যদিকে শরীফ হুসাইনের ক্ষেত্রে তার ছেলেরা বৃটিশের ছত্রছায়ায়

থেকে শাসনকাজ পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। প্রিন্স ফয়সালকে সিরিয়া ও ইরাকের রাজা বানানো হয় এবং প্রিন্স আব্দুল্লাহকে বানানো হয় জর্দানের রাজা। কিন্তু বাস্তবে বৃটেন ও ফ্রান্সই এসব এলাকার প্রকৃত কর্তৃত্বে ছিল।

অন্যদিকে বৃটিশেরা জায়নিস্টদেরকে শর্তসাপেক্ষে ফিলিস্তিনে বসতি গড়ার অনুমতি দেয়। শুরুর দিকে বৃটিশেরা আরবদের বিদ্রোহের ঝুঁকি নিতে চায়নি। এজন্য বৃটেন ফিলিস্তিনে আসা দেশান্তরিত ইহুদিদের সংখ্যাসীমা বেঁধে দেয়। এতে জায়নিস্টরা ক্ষেপে উঠে। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ইহুদিরা বৃটেনের শর্ত না মেনেই ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এসব ঘটনা আরবদের ক্ষোভও বাড়িয়ে দেয়। কেননা, তাদের কাছে ফিলিস্তিন এমন একটি ভূমি যা ১১৮৭ সালে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর বিজয়ের পর থেকে তাদের নিজেদের ছিল এবং এখন তা বসতি স্থাপনের ফলে ইহুদিদের বলপূর্বক দখলে চলে যাচ্ছিল।

আরববিশ্বে উসমানি খেলাফত ধ্বংসে জায়নিস্টদের লাঠিয়াল বাহিনী আরব গোপন সংগঠন *আল-ফাতাতের* সদস্যরা। ছবি : মিডিয়া কমন্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি করেছে তা আজো বিদ্যমান। পরস্পরবিরোধী চুক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট আলাদা

আলাদা দেশগুলো মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে এখনো পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজ করছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। জায়নিজমের উত্থান ও মুসলিমদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশিদের অনুগত জালেম সরকারগুলোর উপস্থিতি এ অঞ্চলে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এক উম্মাহ হওয়ার পরিবর্তে সৌদি, ইরাকি, জর্দানি, সিরিয়, মিসরি প্রভৃতি নানা উম্মাহ ও জাতীয়তায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। এই বিভাজনটি বিগত ১০০ বছরে ডাল-পালা ছড়িয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে আরো অনেক মানচিত্রে। উদ্ভব ঘটেছে আলাদা আলাদা পতাকার, টেনে দেওয়া হয়েছে বহু সীমান্ত রেখা। বৃটিশের তৈরি গভীর ও সূক্ষ্ম এই ষড়যন্ত্র মুসলিমবিশ্বে আজো ছড়াচ্ছে তার বিষবাষ্প এবং নিয়ত যেন তা হয়ে উঠছে শক্তিশালী। উম্মাহর সামগ্রিক ঐক্যের পথে এ যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর। (*Lost Islamic History*)

রেফারেন্স :

1. *Hourani, Albert Habib. A History Of The Arab Peoples. New York: Mjf Books, 1997.*
2. *Ochsenwald, William, and Sydney Fisher. The Middle East: A History. 6th. New York: McGraw-Hill, 2003.*

ইহুদি; নির্যাতিত থেকে নিপীড়ক হয়ে উঠার গল্প

জায়নিজমের উদ্দেশ্য ইহুদিদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসা এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিও টেস্টামেন্টে বর্ণিত 'প্রতিশ্রুত রাজা' (দাজ্জাল) আসার ক্ষেত্র তৈরি করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জায়নিস্টরা তাদের গোপন মতবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিশ্বের বড়ো বড়ো পর্যায়গুলোকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। শর্ত মতে রাজা আগমনের পূর্বে তাদের কথিত টেম্পল তৈরি করা লাগবে। যা তৈরির জন্য ইতোমধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়েছে...

ইহুদি সম্প্রদায় বা জুইশদের ইতিহাস ছয় হাজার বছরের পুরনো। মানবেতিহাসে ইহুদিরা সবচেয়ে অত্যাচারিত সম্প্রদায়, যারা বছরের পর বছর নিপীড়িত হয়েছে। একটি নির্যাতিত সম্প্রদায় কীভাবে নিজেরাই অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী হয়ে উঠল সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইহুদিধর্ম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্ম। মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে মিসর ইসরঈলিদের আদিনিবাস। তারা এখন যে জায়গা চিহ্নিত করেছে (ফিলিস্তিন), তা নিয়ে তাদের নিজেদের ভেতরেই যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম বা তাদের ভাষায় 'মোজেস' এই সম্প্রদায়ের অন্যতম একজন নবী। বনি ইসরঈলের সবচেয়ে সুন্দর সময় অতিবাহিত হয়েছে

খৃস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে দাউদ আলাইহিস সালাম বা 'ডেভিডে'র সময়। দাবি করা হয়, বর্তমান সময়ের লেবানন, সিরিয়া, জর্দান ও মিসরের বড়ো অংশই তখনকার 'কিংডম অব ইসরঈলে'র[৫৮] অংশ। ডেভিডের ছেলে 'সলোমন' বা সোলায়মান আলাইহিস সালামের সময়ও তাদের অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এ-জাতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ সময় 'আসিরিয়ান'রা[৫৯] ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলে ঢুকে পড়ে এবং তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। এরপর বিভিন্ন সময় ব্যাবিলনিয়, পার্সিয়ান, হেলেনেস্টিক, রোমান, বাইজেন্টাইন, তুর্কি, বৃটিশ শাসনসহ বিভিন্ন পর্যায় পাড়ি দেয় এই অঞ্চল। মুসলিমদের সময় ছাড়া প্রায় শাসকের অধীনে ইহুদিদের তাড়া খেতে হয়।

মিসরিয় ফারাওদের[৬০] সময় থেকে শুরু করে জার্মানির হিটলার পর্যন্ত ইহুদিদের তাড়া খেতে হয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এখন যেমন

---

৫৮ রাজা ডেভিড (দাউদ আলাইহিস সালাম) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় তিন হাজার বছর আগের ইহুদি রাজ্য। যাকে ইহুদিদের প্রথম স্বর্ণযুগ বলা হয়। ইহুদিরা বিশ্বাস করে দাজ্জালের নেতৃত্বে সেই রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। *Dr Michael Higger*-এর লেখা *'The Jewish Utopia'* বইয়ে বলা হয়েছে, '(দাজ্জালের আগমনের পর) ইসরঈল এবং এর অনুগত জাতিসমূহের সঙ্গে 'গগ ও মেগগ' (ইয়াজুজ-মা'জুজের) নেতৃত্বে বিরুদ্ধাবাদীরা যুদ্ধে লিপ্ত হবে। জেরুসালেমের আশেপাশে কোথাও সংঘটিত এই যুদ্ধে 'গগ ও মেগগ' সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হবে এবং এখান থেকে স্বর্গরাজ্য পত্তনের কাজ শুরু হবে।' দাজ্জালের প্রতি আনুগত্যশীলরাই শুধু স্বর্গরাজ্যে বসবাসের অনুমতি পাবে, অন্যদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। অ-ইহুদী কারো পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ সম্ভব নয়।

৫৯ আসিরিয় সভ্যতা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) অন্যতম সভ্যতা। এই সভ্যতার উদ্ভব ৬০০০ খৃস্টপূর্বে। সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চলে। আসুর নগর ছিল আসিরিয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। পরে রাজধানী নিনেভে সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রাচীন সভ্যতা হিসেবে আসিরিয় সভ্যতা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এর সামাজিক সংগঠন, বিশেষ করে সামরিক ব্যবস্থাপনা পরবর্তী সভ্যতাসমূহের আদর্শ হয়ে উঠে। নমরুদ ছিল আসিরিয় সম্রাট। ১২২৫ খৃস্টপূর্বে নমরুদ ব্যাবিলন দখল করে।

৬০ মিসরে নীল নদকে কেন্দ্র করে নগর সভ্যতা গড়ে উঠে খৃস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। সেসময় মিসর কতগুলো ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে বলা হতো 'নোম'। ৩২০০ খৃস্টপূর্বাব্দে 'মেনেস' নামের জনৈক রাজা সমগ্র মিসরকে একত্রিত করে একটি নগররাষ্ট্রে রূপ

ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত চলছে, তা এক সময় ছিল 'খৃস্টান-ইহুদি সংঘাত'। স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বে ইহুদিরা খুবই ভালো ছিল। তারা এ সময় বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ব্যাপক সুযোগ লাভ করে। মুসলমানদের এই উদারতার কথা ফুটে উঠেছে ইহুদিদের লেখা ইতিহাস-বইয়ের পাতায়।

শুরু থেকে বিভিন্ন সমাজে ইহুদিদের ঘৃণিত, অবহেলিত ও খারাপভাবে দেখা হতো। প্রায় প্রতিটি জায়গায় তাদের ওপর থাকতো নিষেধাজ্ঞা। উগ্র-খৃস্টানরা তাদেরকে কখনোই সহ্য করতে পারেনি। এদের অনেকেই যিশুর হত্যাকারী হিসেবে ইহুদিদের চিত্রিত করেছে। অনেকে তাদের মনে করে অভিশপ্ত জাতি। ইহুদিদের বসবাসের পরিবেশ ছিল নিম্নমানের। ভালো খাবার-দাবার তাদের ছিল না। ইহুদিরা যেহেতু তাড়া খেতো বেশি তাই যাযাবর জীবনে স্থায়ী কাজের চেয়ে বুদ্ধিনির্ভর ও কম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বেছে নিতো তারা। ব্যবসার প্রতি খৃস্টানদের অনীহা তাদের সামনে সুযোগ এনে দেয়। সুদী ব্যবসা, টাকা-পয়সা লেনদেন, দালালি- এসব কাজে ইহুদিরা এগিয়ে যায় বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে।

ইহুদি সম্প্রদায়কে ইউরোপে কীভাবে দেখা হতো তার ভালো উদাহরণ হতে পারে *উইলিয়াম শেক্সপিয়রের* 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের শাইলক চরিত্রটি। শরীরের মাংস কেটে ইহুদি শাইলক পাওনা আদায়ের দাবি জানায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা রুশ লেখক *নিকোলাই গোগল* 'তারাস বুলবা' উপন্যাসে আরেক ইহুদি সুযোগসন্ধানী চরিত্র 'ইয়ানকেল'কে

দেন। দক্ষিণ মিসরের 'মেম্ফিস' ছিল এর রাজধানী। মিসরে রাজবংশের সূচনা হয় এভাবে। *ফারাও* বা *ফেরাউন* গ্রিক-রোমান বিজয়ের পূর্বপর্যন্ত প্রাচীন মিসরিয় রাজাদের প্রচলিত উপাধি। প্রাচীন মিসরে ফেরাউনরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিল। এরা নিজেদেরকে মনে করত সূর্যের বংশধর। নিজেদেরকে দেবতা মনে করায় বংশের বাইরে কাউকে বিয়ে করতো না তারা। ফলে ভাইবোনের মাঝেও বিবাহ সম্পন্ন হতো। মুসা আলাইহিস সালামের সময়ের ফেরাউন ছিল তৃতীয় রামেসিস। পবিত্র কোরআনের একাধিক সুরায় এই ফেরাউনের ঔদ্ধত্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition. Merriam-Webster, 2007. p. 928)

সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তখনকার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব।

বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত তাড়া খেয়ে একসময় ইহুদিরা মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হতে থাকে। এতে ইউরোপিয়দের একটি চালও সক্রিয় ছিল। খৃস্টানরা যেহেতু ইহুদিদের পছন্দ করতো না, তাই তারাও চাচ্ছিল মুসলমানদের এলাকায় তাদের ঢুকিয়ে দিতে। আর প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে যাযাবর জীবনেরও অবসান চাচ্ছিল ষড়যন্ত্রপ্রিয় এই জাতি। এতোগুলো বছর তাদের ঐক্য ধরে রাখার বড়ো শক্তি ছিল ধর্ম। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদি সম্প্রদায়ের সব সময়ের স্বপ্ন ছিল, তারা তাদের নিজ দেশ 'ইসরঈলে' ফিরে যাবে, যদিও তখনো এর কোনো ভৌগলিক অস্তিত্ব ছিল না। 'ইসরঈল' তাদের মাতৃভূমি ও ধর্মভূমিই শুধু নয়, তাদের স্বপ্নভূমিও বটে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বপ্ন দেখেছে 'ইসরঈল' নামের দেশটির। 'নেক্সট ইয়ার ইন ইসরঈল'- এই শ্লোগান মাথায় রেখে বহু ইহুদি মারা গিয়েছে। ইসরঈলের জন্য তারা সাধ্যমত দান করেছে, নিজেদেরকে এক করে রেখেছে ধর্ম ও বিশ্বাস দিয়ে। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়ার পরও ক্ষুরধার বুদ্ধি, কৌশল ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের বসিয়েছে।

মেধাবী ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার জন্য চিন্তা করতে হয় না। বহু ওয়েবসাইটে এদের জন্য দান গ্রহণ করা হয়। তারা প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখে। কমিউনিটির কেউ বিপদে পড়লে সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে ইহুদি পরিবারগুলোর 'বংশলতিকা' বা 'ফ্যামিলি ট্রি' তৈরিতে সহায়তা করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধাওয়া খেয়ে ইহুদিরা বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের স্বপ্নভূমির কথা কখনো ভোলোনি। এক্ষেত্রে তারা কট্টর ও চরমপন্থা অবলম্বনেও দ্বিধা করেনি। তিন হাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক জায়গা তাদের জন্মভূমি ছিল সেই যুক্তিতে একটি জায়গার দখল নেওয়া যৌক্তিক হতে পারে না। এর সুনির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিও নেই। কিন্তু

ইহুদিরা তা তৈরি করে নিয়েছে। বিশ্বশক্তিকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগিয়েছে তারা। কুয়েত দখল করে সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন, কুয়েত ঐতিহাসিকভাবে ইরাকের অংশ। কিন্তু সে যুক্তি বাতিল হলেও ইহুদিদের যুক্তি বাতিল হয়নি।

বর্তমান বিশ্বে ইহুদির সংখ্যা দেড় কোটির উপরে। বিভিন্ন দেশে এরা ছড়িয়ে আছে। সবচে বেশি আছে আমেরিকায়, ৭০ লাখ, ইসরঈলে ৬৪ লাখ, ফ্রান্সে ৪ লাখ, কানাডায় ৩.৫ লাখ, বৃটেনে ৩ লাখসহ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউক্রেন, ইথিওপিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে আছে ইহুদি নাগরিক। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে মতবাদটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সেই কমিউনিজমের প্রবক্তা *কার্ল মার্কস* ইহুদি সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করে রাখা যাদুশিল্পি *হুডিনি* ও বর্তমানে *ডেভিড কপারফিল্ড* এসেছেন একই কমিউনিটি থেকে। মনোবিজ্ঞানী *ফ্রয়েড*, লেখকদের মধ্যে *আর্থার মিলার*, *ফ্রানজ কাফকা*, *জন স্টাইনব্যাক* যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন সাইন্স ফিকশন জগতের সবচেয়ে আলোচিত লেখক *আইজাক আসিমভ*। মিউজিকে ইহুদি *মেনুহিনের* অসাধারণ ভায়োলিনের পাশাপাশি *রিঙ্গো স্টার*, *মার্ক নাফলারের* মতো বাদক যেমন এসেছেন, তেমনি *বব ডিলান*, *বব মার্লির* মতো গায়কও এসেছেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও আইজাক নিউটনের কথা কে না জানে। এধরনের নাম অসংখ্য আছে।

ইহুদি কমিউনিটির সদস্যদের হাতে মেডিসিন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকোনোমিক্স, লিটারেচার ও পিস বিভাগে এখন পর্যন্ত ১৮৫টিরও বেশি নোবেল প্রাইজ উঠেছে। এ থেকে তাদের মেধার বিস্তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব। ইসরঈলের প্রয়োজনে এসব বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, মিডিয়ামোঘল, রাজনীতিবিদ সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসেন। তারা যে যে মতেরই হোন না কেন, ইসরঈল নিয়ে তাদের কোনো মতভেদ নেই। ফলে হাজার অপরাধ করার পরও ইসরঈলকে স্পর্শ করা যায় না। শুধু আবেগ বা অভিশাপ দিয়ে

ইসরাঈলকে দমন করা সম্ভব নয়। কেননা, এর ভূমিটুকু মধ্যপ্রাচ্যে হলেও, এর নিয়ন্ত্রকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে।

মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যে ছোট্ট একটি রাষ্ট্র হলেও ইসরাঈলকে স্পর্শ করতে পারে না কেউ। ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার সময় ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ এবং ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরবদের সঙ্গে ইসরাঈলের যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে ইসরাঈল বরং আরব ভূমির ওপর আরো বেশি করে জবরদখল কায়েম করে। আরবরা এর মোকাবেলায় কিছুই করতে পারেনি নিজেরদের ভূমি খোয়ানো ছাড়া।

ফিলিস্তিনিদেরকে নিজ আবাস ভূমি থেকে উৎখাত করে জুইশ (*Jewish*) কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব আবাসভূমি ইসরাঈল সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করার প্রতিটি পর্যায়ে পশ্চিমাশক্তি, বিশেষ করে আমেরিকা সর্বদাই সমর্থন যুগিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় পরোক্ষভাবে ইহুদিরাই বিশ্বকে শাসন করছে। একটি সম্প্রদায়ের অল্পকিছু মানুষ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা হয়ে থাকে, আমেরিকা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে, আর আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে জুইশ লবি।

অস্ত্র, মিডিয়া, ব্যাংক, কর্পোরেট বাণিজ্য- প্রতিটি ক্ষেত্রে জুইশ কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ষোলআনা। এ কারণে বিগত এক শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর যে নিপীড়ন তারা চালাচ্ছে, *Clash of Civilization* বা 'সভ্যতার সংঘাতে'র মোড়কে তা বৈধ করে নিয়েছে পশ্চিমা সমাজ।[৬১]

---

৬১ ইহুদি বংশোদ্ভূত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন (১৮ এপ্রিল ১৯২৭- ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮) মার্কিন সরকারের বিভিন্ন কৌশলগত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মেয়াদে উচ্চপদে আসীন এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি 'ফরেন পলিসি জার্নাল' প্রতিষ্ঠা করেন। হান্টিংটন নব্য রক্ষণশীলদের ঘাঁটি *আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের* এক বক্তৃতায় প্রথম 'সভ্যতার সংঘাত' শব্দসমষ্টি ব্যবহার করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ '*The Clash of Civilizations and the*

আমেরিকা-ইসরাঈল মধুচন্দ্রিমা

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্টরা বরাবরই প্রকাশ্যে ইহুদিদের সমর্থন করে এসেছেন। চলতি শতকে উগ্ররূপ ধারণ করে এটি। এই উগ্রতার শুরু বাচ্চা বুশের আমল থেকে। মার্কিন প্রশাসনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছে জুইশ কমিউনিটির সদস্যরা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার, চিফ পলিসি ডিরেক্টর, পলিটিক্যাল এডভাইজার, মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা, বাজেট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, ফরেন সার্ভিস ডিরেক্টর, হোয়াইট হাউজের স্পিচ রাইটারসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও পলিসি নির্ধারণের জায়গাগুলোতে আছে এদের অবস্থান। মহাশূন্যে কাজ করার প্রতিষ্ঠান নাসার এডমিনিস্ট্রেটর (ইহুদি) *ডেনিয়েল গোল্ডিন* ইসরাঈলের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকগুলো ইহুদিদের দখলে। কয়েক বছর আগে 'দি ইউনাইটেড জুইশ কমিউনিটি' ঘোষণা দিয়েছিল, ২০০৭ সালে 'ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'তে তারা ২৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ফান্ড দেবে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা *ফেডারেল রিজার্ভের* মালিকানা ইহুদি রথসচাইল্ড[৬২] পরিবারের। এই কম্যুনিটি এমনই

Remaking of World Order'-এ তত্ত্বটিকে আরো সম্প্রসারিত করে প্রকাশ করেন। হান্টিংটনের ভাষ্যে, সোভিয়েত উত্তর এই নতুন বিশ্বে সংঘাতের মূল উৎস ধর্ম। পশ্চিমাদের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতের কথা তিনি জোরালোভাবে তুলে ধরেন। হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বকে অনেক বিশ্লেষক আধুনিক ক্রুসেডের বাইবেল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই খুনী তত্ত্বের মাধ্যমে *নিও ওয়াল্ড অর্ডারের* সেবাদাস হান্টিংটন গং কার্যত পশ্চিমা বিশ্বকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

৬২ *রথসচাইল্ড ফ্যামেলি* জার্মান ইহুদি আশমের রথসচাইল্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬০ সালে এই ইহুদি জার্মানিতে বিশ্বের প্রথম ব্যাংকিং ব্যবসা চালু করেন। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা রথসচাইল্ডের হাত ধরে। পরবর্তীতে তার পাঁচ সন্তান লন্ডন (বৃটেন), প্যারিস (ফ্রান্স), ফ্রাঙ্কফুট (জার্মান), ভিয়েনা (জার্মান) ও নেপলসে (ইতালি) আলাদা আলাদাভাবে ব্যাংক ব্যবসা ও সুদী কারবার শুরু করে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে সম্পদশালী ও প্রভাব

দাপুটে আমেরিকার কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে পারবে না। অবস্থা এমন হয়েছে, জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদায়কে হাতে না-রাখলে ক্ষমতায় টেকা যায় না। এটি আমরা ক্লিনটন[৬৩] প্রশাসনের সময় দেখেছি। এসব কারণে শুধু জুইশ কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যেতে হয়।

বিস্তারকারী ফ্যামেলি হিসেবে রথসচাইল্ড পরিবার বিখ্যাত। বিশ্বের ১৭টি দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম রয়েছে এই পরিবারের। ২০০৮ সালের হিসেবে রথসচাইল্ড পরিবার এককভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১০০ বিলিয়ন ইউরো অর্থায়ন করেছে। জায়নবাদী 'কন্সপারেসি থিওরির' জন্য পরিবারটির কুখ্যাতি আছে। ১৮০০ সালের পর পৃথিবীতে যতো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তাতে রথসচাইল্ড পরিবারের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বৃটিশ ও ফরাসির যুদ্ধে তারা নেপোলিয়নকে যেমন সহায়তা দিয়েছে তেমনি বৃটিশদেরকেও আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েছে। একই সময় তাদের অন্য অংশটি আমেরিকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করেছে। রথসচাইল্ড পরিবার *ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের* মালিক। তারা আমেরিকার রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ব্যাংক *ফেডারেল রিজার্ভেরও* মালিক। রথসচাইল্ড পরিবার এই গ্রহের শীর্ষ ধনীদের অন্যতম। তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯১৪ সালে ফিলিস্তিনে যখন ইহুদিদের সংখ্যা মাত্র ৯০ হাজার আর অভিবাসীদের কয়েকটি বসতিতে ১৩ হাজারের মতো, তখন রথসচাইল্ড পরিবার সেখানে একটি *ইহুদি কলোনি* প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ইহুদি অভিবাসীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল 'ব্রাউন এডমন্ড রথসচাইল্ড' নামের জনৈক ফরাসি ইহুদি। জায়নবাদের উদ্ভাবন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। আরবদের থেকে জমি কিনে অভিবাসী ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে উপশহর ও বসতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য ইহুদিদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন এই ইহুদি ধনকুবের। ফিলিস্তিনে অভিবাসী ইহুদিদের জন্য প্রথম উপশহর নির্মাণে তিনি ব্যয় করেন ১৬ লাখ লিরা স্টার্লিং। রথসচাইল্ড পরিবারের আরেক সদস্য ব্যারন রথসচাইল্ডকে 'ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি প্রতিষ্ঠার জনক' বলা হয়। বৃটিশেরা ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করেছিল।

৬৩ উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন (*William Jefferson Clinton*, ১৯ আগস্ট, ১৯৪৬) বিল ক্লিনটন নামে সমধিক পরিচিত। ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম রাষ্ট্রপতি। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সিনেটর হিলারি ক্লিনটনের স্বামী তিনি।

আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মূলত কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট বানাতে পারে, চাইলে সরাতেও পারে। এসব কর্পোরেট হাউজের মালিক ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জুইশ কমিউনিটির সদস্য। একথা *মাইক্রোসফটের* ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি জাপানি কম্পানি *সনি*র আমেরিকান অফিসের জন্যও সত্য। প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে জুইশ আমেরিকানরা কাজ করছেন।

মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ : হাতের মুঠোয় পৃথিবী

বিশ্বের এবং বিশেষ করে আমেরিকার জনগণের মূল নিয়ন্ত্রক 'মিডিয়া'। এরা টিভি দেখে, মুভি দেখে, অনলাইনে নির্দিষ্ট কিছু সাইট দেখে এবং পত্রিকা পড়ে। স্কলারদের বাদ দিলে সাধারণ আমেরিকানদের মন ও মনন পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে মিডিয়া, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো।

আমেরিকার অন্যতম বড়ো মিডিয়া গ্রুপের নাম 'টাইম-ওয়ার্নার'। এ গ্রুপের অধীনে পত্রিকা, অনলাইন বিজনেস, মুভি প্রডাকশন হাউজ এবং টিভি চ্যানেল আছে। যারা নিয়মিত টিভি বা মুভি দেখেন, তাদের কাছে 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স' নামটি খুবই পরিচিত। ১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই কম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন ইহুদি এবং বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা সিইও *জেরাল্ড লেভিন*সহ এর গুরুত্বপূর্ণ সব পদই ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। টাইম-ওয়ার্নারের আরেক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অনলাইন 'এওএল' (*AOL*)। এটি ৩৪ মিলিয়ন আমেরিকান সাবস্ক্রাইবার (*Subscriber*) নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। টিনএজার, নারী ও শিশুদের টার্গেট করে নামা এওএল (*AOL*) জুইশ কমিউনিটির প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

নব্বই দশকে ইরাক যুদ্ধ কভার করে আমেরিকায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে 'সিএনএন' (*CNN*) টিভি চ্যানেলটি। এর মালিক *টেড টার্নার* বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেলেও একপর্যায়ে চ্যানেলটি চালাতে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেন টাইম-ওয়ার্নার গ্রুপের কাছে। তিনি নামে থাকলেও মূল ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে

টাইম-ওয়ার্নার। ৭০ মিলিয়ন[৬৪] দর্শকের চ্যানেল ঈঘঘ কিভাবে খবর বিকৃত করে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ হতে পারে নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরের ঘটনাটি। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল প্রতিক্রিয়া হিসেবে। হঠাৎ দেখা গেল ফিলিস্তিনিরা আকাশে গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। এতে বোঝা যায়, তারা টুইন টাওয়ার ধ্বংসে খুশি। কিছুদিন পর ঈঘঘ খুবই গুরুত্বহীনভাবে জানায়, ফিলিস্তিনি ফুটেজটি ছিল পুরনো। ভুল করে সেটি দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ততোদিনে পৃথিবীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে গিয়েছে।

---

৬৪ এই পরিসংখ্যানগুলো কয়েক বছর আগের।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকজন ইহুদি। বৈশ্বিক মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ইহুদি এই কুশীলবরা।

আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো প্লে-টিভি চ্যানেলের নাম 'এইচবিও' (*HBO*)। বাংলাদেশেও এটি বেশ জনপ্রিয়। আমেরিকায় এর দর্শক ২৬ মিলিয়ন। *HBO* চ্যানেলটি টাইম-ওয়ার্নারের মালিকানাধীন অর্থাৎ পুরোপুরি ইহুদি নিয়ন্ত্রিত এবং এর কথিত প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি চ্যানেল *সিনেম্যাক্স* (*CINEMAX*) টাইম-ওয়ার্নারেরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো মিউজিক রেকর্ড কম্পানি 'পলিগ্রাম মিউজিক'ও তাদের দখলে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ম্যাগাজিনের নাম এলে প্রথমেই উচ্চারিত হয়, 'টাইম' ম্যাগাজিনের নাম। এই পত্রিকাসহ টাইম-ওয়ার্নার গ্রুপে আছে *লাইফ*, *স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড*, *পিপল*-এর মতো বিশ্বনন্দিত পত্রিকাসহ ৫০টি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন। টাইমসহ এ ম্যাগাজিনগুলোর মাথার ওপরে বসে এডিটর *ইন চিফ* হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন 'নরম্যান পার্লস্টেইন' নামের ইহুদি।

বিশ্বজুড়ে শিশু-কিশোরদের মনে রঙিন স্বপ্ন তৈরি করে 'ওয়াল্ট ডিজনি' নামের প্রতিষ্ঠান। এই কম্পানির *ওয়াল্ট ডিজনি টেলিভিশন*, *টাচস্টোন টেলিভিশন*, *বুয়েনা ভিসতা* (*Buena Vista*) টেলিভিশনের আছে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন নিয়মিত দর্শক। সিনেমা তৈরিতে কাজ করছে *ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স*, *টাচস্টোন পিকচার্স*, *হলিউড পিকচার্স*, *ক্যারাভান পিকচার্স*সহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান। ইনডিপেনডেন্ট মুভি তৈরিতে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান *মিরাম্যাক্স ফিল্মস* (*Miramax Films*)-ও কিনে নিয়েছে ডিজনি। বিকল্প ধারার মুভি তৈরিতে *Miramax* অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওয়াল্ট ডিজনি কম্পানির বর্তমান সিইও *মাইকেল আইসনার* একজন ইহুদি।

আমেরিকার আরেকটি প্রভাবশালী মিডিয়া গ্রুপের নাম 'ভায়াকম' (*Viacom*)। এর প্রধান নির্বাহী *সুমনার রেডস্টোন*সহ অধিকাংশ পদেই আছেন ইহুদিরা। জনপ্রিয় *সিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্ক*সহ ৩৯টি টেলিভিশন স্টেশন, ২০০টি সহযোগী স্টেশন, ১৮৫টি রেডিও স্টেশন, সিনেমা তৈরির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'প্যারামাউন্ট পিকচার্স' তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভায়াকমের আরেক ইহুদি কো-প্রেসিডেন্ট *টম ফ্রেসটনে*র নিয়ন্ত্রণে আছে মিউজিক চ্যানেল 'এমটিভি'। মুভি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ইউনিভার্সাল' মিলে গিয়েছে 'এনবিসি' গ্রুপের সঙ্গে। এনবিসি খুবই প্রভাবশালী টিভি চ্যানেল। এদের মূল সংগঠন 'সিগ্রাম' (*Seagram*)-সহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদি মিডিয়ামোগল *এডগার ব্রনফম্যান জুনিয়র*। তার বাবা *এডগার ব্রনফম্যান সিনিয়র ওয়ার্ল্ড জুইশ কংগ্রেসের* প্রেসিডেন্ট।

ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনকে মার্কিনিদের কাছে বৈধ চিত্রায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে 'ফক্স নিউজ'। ফক্স নিউজের

পরিচালক পিটার শেরনিনও একজন ইহুদি। এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিশ্বখ্যাত মিডিয়ামোগল *রুপার্ট মারডক*। মারডকের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই জুইশদের সমর্থন দিয়ে এসেছে। মারডকের মা ছিলেন ইহুদি। মিডিয়া জগতের একচ্ছত্র এই বাদশাহ *নিউজ করপের* চেয়ারম্যান। নিয়ন্ত্রণ করেন বিশ্বের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকা, সংবাদসংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তার এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দিয়ে এশিয়া পর্যন্ত। বাংলাদেশে জনপ্রিয় 'স্টারপ্লাস'-সহ বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের এমনকি বিপরীতধর্মী চ্যানেলও তিনি পরিচালনা করেন। ভারত থেকে প্রচারিত 'স্টারপ্লাস' চ্যানেলের লোগো এবং ইহুদিদের প্রধান ধর্মীয় প্রতীক 'স্টার অব ডেভিডে'র সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্বের অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল। তিনি বিশ্বব্যাপী ১২৭ সংবাদপত্রের মালিক, যেগুলোর দৈনিক সার্কুলেশন চার কোটি। মারডকের বিশাল সংবাদ-সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ- লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি সান*, *দি সানডে টাইমস* এবং অধুনালুপ্ত *নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড* (বৃটেন), *ফক্স নিউজ*, *দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এবং *দি নিউইয়র্ক পোস্ট* (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। সম্প্রতি বিস্কাইবি (স্কাই নিউজ) টেলিভিশনটি পূর্ণ মালিকানায় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল *নিউজ করপ*।

টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে 'এবিসি', স্পোর্টস চ্যানেল 'ইএসপিএন', ইতিহাসবিষয়ক 'হিস্ট্রি' চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী অধিকাংশ টিভি ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি। জাতীয় ও স্থানীয় মিলিয়ে দৈনিক দেড় হাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকাসহ বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকা যে নিউজ সার্ভিসের সাহায্য নেয় সেটি 'দি এসোসিয়েটেড প্রেস' বা *এপি (AP)*। এ প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং এডিটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট *মাইকেল সিলভারম্যান* একজন ইহুদি। নিত্যদিনের খবরে কী যাবে, কী যাবে না, তা ঠিক করেন এই সিলভারম্যান।

আমেরিকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী তিনটি পত্রিকা হলো- 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং 'ওয়াশিংটন পোস্ট'। এ তিনটি পত্রিকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে।

ওয়াটারগেট কেলেংকারির[৬৫] জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগে বাধ্য করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'। পত্রিকাটির বর্তমান সিইও *ডোনাল্ড গ্রাহাম* ইহুদি মালিকানার তৃতীয় প্রজন্ম। উগ্রবাদী ইহুদি হিসেবেও তিনি পরিচিত। ওয়াশিংটন পোস্টগ্রুপ আরো কিছু পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে শুধু আর্মিদের জন্য রয়েছে ১১টি পত্রিকা। এই গ্রুপের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত। পত্রিকাটির ইন্টারন্যাশনাল এডিশনের সম্পাদক মুসলমান নাম *ফরিদ জাকারিয়া* দেখে বা কিছু ক্ষেত্রে এর উদারতার জন্য অনেকে একে 'লিবারেল' পত্রিকা মনে করেন। টাইম সাময়িকীর পরে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সপ্তাহিকটির নাম 'নিউজ উইক'।

আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে প্রভাবশালী পত্রিকা *নিউইয়র্ক টাইমসের* মালিকানা কয়েক প্রজন্ম থেকে ইহুদিদের হাতে। বর্তমান প্রকাশক ও চেয়ারম্যান *আর্থার শুলজবার্জার*, প্রেসিডেন্ট ও সিইও *রাসেল টি লুইস* এবং ভাইস চেয়ারম্যান *মাইকেল গোল্ডেন* সবাই ইহুদি।

---

৬৫ *ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি* ১৯৭০-এর দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে ১৭ জুন ১৯৭২ সালে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দল ও প্রশাসনের ৫ ব্যক্তি ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটারগেট ভবনস্থ বিরোধী ডেমোক্র্যাট দলের সদর দফতরে আড়িপাতার যন্ত্র বসায় এবং নিক্সন প্রশাসন কেলেঙ্কারিটি ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ঘটনার ফলে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ৯ আগস্ট ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন। (*Dickinson, William B.; Mercer Cross, Barry Polsky (1973), Watergate: chronology of a crisis 1 Washington D. C.: Congressional Quarterly Inc. p: 8 133 140 180 1881*)

বিশ্বের অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*। আঠারো লাখেরও বেশি সার্কুলেশনের এই পত্রিকার ইহুদি প্রকাশক ও চেয়ারম্যান *পিটার আর কান* তেত্রিশটিরও বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমেরিকার মুভি ইন্ডাস্ট্রি হলিউডের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, মুভি নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছে ইহুদিদের প্রাধান্য। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ট্যালেনটেড পরিচালক *স্টিভেন স্পিলবার্গ* আরো দুই ইহুদি ব্যবসায়ী *ডেভিড গেফিন* ও *জেফরি ক্যাজেনবার্গ*-কে নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'ড্রিমওয়ার্কস এসকেজি' নামের মুভি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। হলিউডে এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছেন, যারা জুইশ কমিউনিটি থেকে এসেছেন। এই তালিকায় আছেন পরিচালক *বিলি ওয়াল্ডার*, *স্ট্যানলি কুবরিক*, *রোমান পোলানস্কি*, *উডি এলেন*, *কার্ক ডগলাস*, *মাইকেল ডগলাস*, *পিটার সেলার্স*, *জেসিকা টেনডি*, *এলিজাবেথ টেইলর*, *পল নিউম্যান*, *বিলি কৃস্টাল*, *জাস্টিন হফম্যান*, *জেরি লুইস*, *রবিন উইলিয়ামস* প্রমুখ। মায়ের দিক থেকে জুইশ কমিউনিটি থেকে এসেছেন *রবার্ট ডি নিরো*, *হ্যারিসন ফোর্ড*, *ড্যানিয়েল ডে লুইসের* মতো সুপারস্টাররা। এই তালিকা যথেষ্ট লম্বা। সহজে শেষ হবে না।

এসব স্টারের অংশগ্রহণ ও জুইশদের পক্ষে জনমত গঠনে হলিউড বা অন্যান্য অঞ্চলের মুভিগুলো ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এসব মুভির নির্মাণকৌশল, গুণগতমান, বুদ্ধির প্রয়োগ ও বক্তব্য সবই উঁচুমাপের। ইহুদিদের নিয়ে যে বিষয়টি বেশি জায়গা করে নিয়েছে তাহল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ইহুদি নির্যাতন' বা কথিত 'হলোকস্ট' (*Holocaust*)। বলা হয়, এ সময় '৬০ লাখ' ইহুদিকে 'হত্যা' ও অসংখ্য ইহুদি নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্যাতন করে হিটলার-মুসোলিনির অক্ষশক্তি। যুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বখ্যাত মুভি নির্মাতা *চার্লি চ্যাপলিন* 'দি গ্রেট ডিকটেটর' নির্মাণ করে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেন। 'হিটলার' এবং 'গরিব ইহুদি নাপিত' দুই চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। জুইশদের প্রতি তিনি অনুরক্ত কি-না এধরনের প্রশ্ন করা হলে চ্যাপলিন

উত্তর দিয়েছিলেন, 'হিটলারের বিরোধী হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

জুইশ লবির হাতে আমেরিকার মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ। ইহুদিদের সমর্থন ছাড়া প্রেসিডেন্ট হওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকা সেখানে অসম্ভব।

যুদ্ধের ৬০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো 'হলোকস্ট' নিয়ে অসংখ্য মুভি তৈরি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্কার পেয়েছে এধরনের একাধিক মুভি। এসব মুভির ক্ষমতা এতো বেশি, যে-কোনো দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারে। তারা যেভাবে চিন্তা করতে বলবে, সবাইকে সেভাবেই চিন্তা করতে হবে।

বলা হয়ে থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে ব্যাপক ইহুদি নিধন শুরু হয়। এ সময় অনেক ইহুদি জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিগত শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী *আলবার্ট আইনস্টাইন*। বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, *There are no*

German Jews, there are no Russian Jews, there are no American Jews ... There are in fact only Jews.

অর্থাৎ, 'জার্মান, রাশিয়ান বা আমেরিকান ইহুদি বলে কিছু নেই... ইহুদিরা সবাই এক।'

মাত্র ৫০-৬০ বছর পেরিয়ে কথার মানেটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। আসলেই জুইশরা এক। তারা আর নির্যাতিত হচ্ছে না। নিজেরাই বরং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতন করছে অন্যকে।

আরব-ইসরঈল সংঘর্ষের কারণ

ইহুদি-খৃস্টানদের মধ্যে স্বজাতির প্রতি উগ্র-শ্রেষ্ঠত্বের (*Racism*) অনুরাগ জন্মেছে বাইবেলের বিকৃত পাঠ থেকে। দেখুন-

But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the free woman was by promise.

Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.

So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. (Galatians 4:23,28, 31): Bible, King James Version: 18 Feb 1997)

'ইবরাহিম আলাইহিস সালামের (বাইবেলে *Abraham*) সারা (*Sarah*) ও হাজেরা (*Hagar*) নামে দু'জন স্ত্রী ছিলেন। ইহুদিরা 'সারার' মাধ্যমে এবং আরবেরা 'হাজেরার' মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিদের ধারণা এই 'সারা' ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্বাধীন স্ত্রী এবং 'হাজেরা' তাঁর বাঁদী। কাজেই ইহুদিদের বদ্ধমূল ধারণা, স্বাধীন স্ত্রীর ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালাম (*Issac*)-এর বংশধর 'ইহুদি'রা উৎকৃষ্টতর আর বাঁদীর ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর 'আরবেরা' নিকৃষ্ট।' (বাইবেল, কিং জেমস ভার্সন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)

প্রকৃতপক্ষে হাজেরার বংশ-আভিজাত্য কম নয়। তিনি ছিলেন মিসর সম্রাটের কন্যা। সম্রাট নম্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় কন্যাকে খাদেমা বলে সারার হাতে তুলে দিলেও পরে তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্বাধীন স্ত্রী হয়েছিলেন। (ফয়জুল বারী, সহিহ বুখারি)

বাইবেলেও এর স্বীকৃতি আছে। দেখুন– এবহ.১৬ (৩, ১৫, ১৬)

(3) And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

(15) And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael.

(16) And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদি পিতা ইসমাইল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাওরাতের বিকৃত বর্ণনায় ইহুদি রেসিজমের নিকৃষ্ট নমুনা দেখুন-

(12) his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. (Gen 16:12)

(...তার হাত ও কাজ পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের বিরুদ্ধে এবং পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের ঘৃণা ও প্রতিরোধ তার বিরুদ্ধে...)

পবিত্র কোরআনে ইসমাইল আলাইহিস সালামের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

'এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল ও নবী। তিনি তাঁর পরিবারকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।' (সুরা মরিয়ম, আয়াত : ৫৪-৫৫)

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরলপথ প্রদর্শন করেছি।' (সুরা আনআম, আয়াত : ৮৭)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'অতঃপর সে যখন পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহিম তাকে বললেন, বাছা! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।' (সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০২)

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ট টেস্টামেন্টে স্বজাতির উগ্র-শ্রেষ্ঠত্বের (*Racism*) আরো একটি নমুনা দেখুন- 'তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের সামনে জাতির পর জাতিকে পতন ঘটিয়ে দেবে। তোমরা তোমাদের চাইতে সংখ্যায় বৃহত্তম জাতিকে পদানত করবে। পৃথিবীর যে স্থানে তোমাদের পদচিহ্ন পড়বে, তোমরা সেসব স্থানের মালিকানাপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের ভূমিটির সীমানা হবে লেবাননের বনাঞ্চল ও নদী হতে ইউফ্রেটিস (ইরাক) নদী পর্যন্ত। কোনো জাতি

তোমাদের সামনে দাঁড়াবে না। তোমাদের প্রভু জগৎবাসীর মনে তোমাদের সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করে দেবেন...'। (*Deuteronomy 11:18-25*)

অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাইবেল কী বলছে দেখুন- '(হে মুসা) আমি তাদের জন্য তাদের (ইহুদিদের) ভ্রাতৃ (আরবগণের) মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (নবী) প্রেরণ করব।' (*Deut 18:18*)

একই কথা বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে-

For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. (The Acts 3:22)

This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. (The Acts7:37)

তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের আরব ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা পোষণ করে আসছে। বিশেষ করে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুত (*Promised*) নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি বংশ হতে না এসে আরবদের মধ্য থেকে আসায় ইহুদি-খৃস্টানদের বৈরী মনোভাব চরমে পৌঁছে যায়। তারা ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিকৃত করে না-হয় মুছে ফেলে বাইবেলে রদবদল শুরু করে। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের দিনক্ষণ সম্পর্কেও ইহুদিরা অবগত ছিল। এজন্য তারা মক্কা-মদিনায় ভিড়ও জমাতো। ইহুদিরা গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল কখন প্রতিশ্রুত নবী আসবেন। এই ঘটনাটি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

'বনি ইসরঈলের পণ্ডিতগণ পূর্ব থেকে এ-সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিল। এটি তাদের জন্য একটি নিদর্শন নয় কি?' (সুরা শোয়ারা, আয়াত : ১৯৭)

সময়ক্ষণ অনুসারে জন্মটি একটি অ-ইহুদি পরিবারে ঘটলে ইহুদিরা চরম হতাশ হয়ে পড়ে। তারা পেছনে ফিরে যায়। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোরআন এই সত্য ও তথ্যকে তুলে ধরেছে-

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

'যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রি করছে তা খুবই মন্দ। যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা অস্বীকার করছে এই হঠকারিতার দরুণ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাজিল করেন। অতএব তোমরা ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করেছো। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৯০)

ইহুদিরা ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। খায়বরে বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার চেষ্টা করেছে। বিশর রাদিআল্লাহু আনহু ও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসঙ্গে খাবার মুখে দিয়েছিলেন। কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশর রাদিআল্লাহু আনহু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ থেকে খাবার ফেলে দেন। যদিও আল্লাহ তাঁকে বিষাক্ততা থেকে বাঁচিয়েছেন, তবু মৃত্যুঅবধি এই বিষের ক্রিয়া নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহন করতে হয়েছিল যা তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম জাতির কাছে একটি আপিল

হিসেবে রেখে গিয়েছেন, 'হে আমার জাতি! জেনে রেখো! খায়বরে ইহুদিদের দেওয়া বিষ মৃত্যুশয্যায় যেন আমার হৃদয়-শিরাকে কেটে দিচ্ছে'।

ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও তড়িৎ স্বীকৃতি

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ডেভিড বেনগুরিয়ন ইসরাঈলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ১০ মিনিটের মাথায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান একে একটি 'রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। পরেরদিন এই 'স্বাধীনতাকে' স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানায়। আমেরিকা ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ মোট ৩৩টি দেশ ইসরাঈলকে 'রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৩টি দেশ এর বিরোধিতা করেছে। এই ১৩টি দেশই ছিল মুসলিম।

পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র কোনো দেশ থাকবার নজির নেই। একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে জড়ো করা হয়েছে ইহুদিদেরকে। বৃদ্ধি করা হয়েছে তাদের সংখ্যা। এমন ঘটনা ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইহুদি ও জায়নবাদ

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশধারা থেকে ইহুদি জাতির উদ্ভব। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের একটি উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। হিব্রু ভাষায় ইসরাঈল অর্থ- 'আল্লাহর বান্দা'। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নামে এদেরকে বলা হয়, 'বনি ইসরাঈল'। ইংরেজিতে এই জাতি 'জু' (*JEW*) নামে এবং তাদের ধর্ম 'জুডিজম' (*Judaism*) নামে পরিচিত। বর্তমানে তারা জায়নিস্ট (*Zionist*) নামেও পরিচিত। জেরুসালেমে অবস্থিত 'জায়ন' (*Zion*) পাহাড়ের নামানুসারে এই নামকরণ। ১৮৮০ সালে অস্ট্রিয়ান ইহুদি নাকান

বেরেনবুয়ান পবিত্র ভূমি জেরুসালেমে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি আন্দোলনের প্রস্তাব করে এবং 'জায়ন' নামে আন্দোলন গড়ে তোলে। এরপর ১৮৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার ইহুদি সাংবাদিক থিওডর হার্জেল[৬৬] (১৮৬০-১৯০৪) *The Jewish State* গ্রন্থের মাধ্যমে জায়নিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং *International Zionist Organization* নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে।

ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাস, লক্ষ্য ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে হলে ইহুদি ও জায়নবাদকে বুঝতে হবে। জায়নিজম (*Zionism*) ইহুদিদের রাজনৈতিক আন্দোলন। ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে বিকৃত তাওরাতে বর্ণিত কথিত 'প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড' (*Promised Land*) প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ইহুদিনেতা ও দার্শনিক থিওডর হার্জেলের নেতৃত্বে ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের বাসিল (*ইধংষব*) নগরীতে অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মেলনে জায়নিস্ট আন্দোলনের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা হয়। এরপর বিশ্বের ৩০টি ইহুদি সংগঠনের ৩০০ ইহুদি নেতা ইহুদিবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি সুদূরপ্রসারী ও পরিকল্পিত নীলনকশা প্রণয়ন করে। এটি পরে '২৪ প্রটোকল' আকারে প্রণীত হয়। কাকতালীয়ভাবে জনৈক খৃস্টান মহিলা সেই প্রটোকলের একটি কপি পেয়ে যান এবং পৃথিবীবাসীর সামনে অনেক পরে এর রহস্য উন্মোচিত হয়।

---

৬৬ অস্ট্রিয়ার একটি পত্রিকার সম্পাদক থিওডর হার্জেল জায়নিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রিধারী হার্জেল বিশ্বাস করতো ইহুদিরা পৃথিবীর যেখানেই বসবাস করুক না কেন তারা সবাই একই সম্প্রদায় বা জাতিভুক্ত। তারা কোনোক্রমে তাদের প্রতিবেশী জাতিসমূহের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে না। হার্জেল তার সমচিন্তার কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রতিভাবান ইহুদিদের খুঁজে বের করে জায়নিস্ট আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯০৪ সালে মৃত্যুবরণ করে হার্জেল।

জায়নিজমের উদ্দেশ্য ইহুদিদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসা এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিও টেস্টামেন্টে বর্ণিত 'প্রতিশ্রুত রাজা' (দাজ্জাল) আসার ক্ষেত্র তৈরি করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জায়নিস্টরা তাদের গোপন মতবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিশ্বের বড়ো বড়ো ক্ষেত্রগুলো নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিচ্ছে। শর্ত মতে রাজা আগমনের পূর্বে তাদের কথিত টেম্পল তৈরি করতে হবে। যা তৈরির জন্য ইতোমধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়েছে। ইহুদি ছাড়াও অনেক উগ্র-খৃস্টান এই মতবাদে বিশ্বাসী।

জুডিজম (*Judaism*) মূল ইহুদি ধর্ম, যেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের কথা বলা হয়েছে। ইহুদিরা শুরু থেকে তাঁকে হিংসার চোখে দেখেছে। এরপর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটলে তাঁকেও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর মূলে আছে 'ত্রাণকর্তার' ব্যাপারে তাদের বিকৃত ও ভুল ধারণা। ইহুদি ধর্ম অনুযায়ী 'ত্রাণকর্তা' এসে সমগ্র বিশ্বে ইহুদিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। 'ত্রাণকর্তা' বলতে তারা 'দাজ্জাল'কে বোঝায় যাকে 'মাসিহা' বলা হয়। মার্কিন মিশনারি ওয়েনের ভাষায়, 'আমরা বিশ্বাস করি, ইসরঈল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জেরুসালেমকে এর রাজধানী করার পর শুধু হাইকেল তথা 'তৃতীয় টেম্পল' (থার্ড টেম্পল) পুনঃনির্মাণ অবশিষ্ট আছে। এর ফলে মাসিহার (দাজ্জাল) আগমন ঘটবে। ইহুদিরা খৃস্টানদের সহযোগিতায় মসজিদে আকসা ভেঙে সেখানে তাদের তৃতীয় টেম্পল[৬৭] তৈরি করবে। ইহুদি সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের পবিত্র স্থানকে গুড়িয়ে দেবে এবং ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদেরকে উস্কানি দেবে। এর ফলে 'মাসিহা' আসবে এবং তাতে

---

৬৭ ইহুদিদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থ ইজাখিলে জেরুসালেমের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত টেম্পলকে ইসরঈলি ঈশ্বরের (*God of Israel*) চিরস্থায়ী বাসস্থান বলা হয়েছে। (ইজাখিল, ৪১:১৮-১৯) ইহুদিরা সুযোগের অপেক্ষায় আছে তৃতীয় টেম্পল পুনঃনির্মাণের।

হস্তক্ষেপ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, তৃতীয় টেম্পল নির্মিত হওয়া উচিত।' (*Prophecy & Politics by grace halsell,USA*)

১৯০৫-০৭ সালে বৃটেনে ২ বছরব্যাপী একটি গোপন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়- 'মুসলিমবিশ্বকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করতে সুয়েজ খাল ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে মুসলিমবিশ্বের অন্তঃস্থলে এমন একটি জাতিকে পুনর্বাসিত করা হবে, যারা মুসলমানদের চিরশত্রু। এরা মুসলিম ভূমির ভূগর্ভস্থ সম্পদ লুণ্ঠন ও মিডিয়াকে নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে।'

শুরুর দিকে জায়নিস্টরা 'গ্রেটার ইসরঈল'[৬৮] প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যান্য ইহুদি সংস্থার বিরোধিতার সম্মুখীন হলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তারকারী জায়নিস্ট আন্দোলন বিরুদ্ধবাদী ওই সব সংস্থার মোকাবেলায় শক্ত পদক্ষেপ নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকাকে টেনে আনার শর্তে জায়নিস্টরা বৃটিশের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে, যুদ্ধ শেষে জার্মানির মিত্র উসমানি সরকারের পরাজয় ঘটলে ফিলিস্তিনকে *ইহুদি রাষ্ট্রে* পরিণত করা হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস সরকারিভাবে উসমানিয়দের হাতে ছিল। জায়নিস্ট অপচেষ্টা ফলবতী হয় এবং তারা বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। অন্যদিকে মার্কিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তদের অনেকেই ছিল ফ্রি-ম্যাসন। ফলে জায়নিস্টরা সহজে আমেরিকার শীর্ষনেতৃত্বকে হাত করে নেয়।

---

৬৮ 'গ্রেটার ইসরঈল' জায়নবাদের নীলনকশাকৃত 'মিসরের নীলনদ থেকে ফোরাত ও মদিনা তাইয়্যেবা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি।'

বৃহৎ মধ্যপ্রাচ্য প্রকল্প কী?

ফেরাউনের সময় বনি ইসরঈল যখন চরম জুলুম-নির্যাতনের স্বীকার তখন তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়া ও ধৈর্য্যশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনৈক ইহুদি একটি বই লেখে। এটি *কাবালা*[৬৯] বা কাব্বালা বা কেবলা নামে পরিচিত। *কাবালায়* বলা হয়, 'হে বনি ইসরঈল! ফেরাউনের এই জুলুমের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। এ-সমস্ত জুলুম ও নির্যাতন কালের পরিক্রমা মাত্র। এসব ঘটনা ক্ষণস্থায়ী। ফেরাউন নিজেকে খোদা দাবি করলেও তোমরা এমন এক জাতি যারা আল্লাহ তায়ালাকেও পরাজিত করেছো! (নাউযুবিল্লাহ)। সুতারাং তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো। তোমরা ফেরাউনকেও পরাজিত করতে পারবে। তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা আল্লাহ তায়ালার আসল বান্দা যাদেরকে আল্লাহ মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন। আর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন বানর রূপে। পরবর্তীতে তারা মানুষ হয়েছে।'

এ-কথাগুলো ইহুদি ধর্মযাজকেরা তাওরাতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ঈমানের স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ হিসেবে জায়নবাদের ঈমানের স্তম্ভ হলো-

১. তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তারা হবে পৃথিবীর শাসক।

২. পৃথিবীর অন্যসব মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের গোলাম রূপে।

৩. তারা বৃহৎ ইসরঈল প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের মাসিহা আসবে। দুনিয়ার শাসক হিসেবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে সে।

৪. পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাদের গোলামী করবে।

---

৬৯ *কাবালা* বা *কাব্বালা* ইহুদিদের গোপন গুপ্তবিদ্যার জ্ঞান। এটি রচিত হয় মিসরে বনি ইসরঈলিদের ওপর ফেরাউনি কর্তৃত্বের সময়। ইহুদিদের গোপন সংগঠন ফ্রি-ম্যাসনরা কাব্বালার চর্চা করে। কাব্বালা মূলত প্যাগানদের রীতি-নীতি থেকে উদ্ভূত। কেউ কেউ একে *ব্ল্যাক ম্যাজিক* বলেও মনে করেন।

এ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জায়নিস্টরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে-

১. পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেশে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে একত্রিত করা।

২. বৃহৎ ইসরঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

৩. 'প্রতিশ্রুত ভূমি' অর্থাৎ, ফোরাত ও নীল নদের[৭০] মাঝখানের সমস্ত জায়গা থেকে মদিনা পর্যন্ত ভূমির দখল নেওয়া।

৪. এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে সেলজুক রাষ্ট্র ও উসমানি খেলাফতের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। অর্থাৎ, তুরস্ক নামে কোনো দেশ থাকবে না।

৫. বায়তুল মোকাদ্দাসে সোলায়মানের গম্বুজ (*The Temple of sulayman*) পুনঃস্থাপন।

এ-কাজগুলো করতে পারলে তাদের মাসিহার আগমনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হবে পৃথিবী। এরপর দাউদ আলাইহিস সালামের বংশধারা থেকে তাদের মাসিহা (দাজ্জাল) আসবে এবং সিংহাসনে বসার মধ্য দিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় তাদের শাসন কায়েম হবে।'[৭১]

জায়নিস্টরা তাদের পিতৃপুরুষের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যের (ইউরোপ-আমেরিকা) মদদে দ্রুততার সঙ্গে বৃহত্তর ইসরঈল গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা। এ অঞ্চলে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ মূলত জায়নবাদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার একেকটি পর্যায়কে বাস্তবায়িত করছে। এপর্যন্ত

---

৭০ ফোরাত ইরাকে এবং নীল নদ মিসরে অবস্থিত।

৭১ *What Is The Great Middle East Project* : Prof Dr *Najibuddin Erbakan*

ইসরঈলের সঙ্গে আরবদের চারটি যুদ্ধ হয়েছে। চারটি যুদ্ধেই কার্যত ইসরঈল তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে-

(১) ১৫ মে ১৯৪৮ সালে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইসরঈল পশ্চিম জেরুজসালেম পর্যন্ত দখল করে।

(২) ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় আরব-ইসরঈল যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জায়নিস্টরা মিসরের সিনাই উপত্যকা দখল করে।

(৩) ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের তৃতীয় আরব-ইসরঈল যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইসরঈল-

(ক) মিসরের নিকট থেকে গাজা দখল করে।

(খ) সিরিয়ার নিকট থেকে জিলান মালভূমির কিছু অংশ দখল করে।

(গ) জর্দানের নিকট থেকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং

(ঘ) পূর্ব জেরুসালেম ও ওল্ড সিটি বা প্রাচীন নগরী দখল করে।

(৪) ১৯৭৩ সালের চতুর্থ আরব-ইসরঈল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সিরিয়ার জিলান মালভূমি ও কানিত্রা শহর দখল করে।

জায়নবাদের এই বিস্তৃতি কোনো তাৎক্ষণিক চিন্তার ফল-ফসল নয়। নীলনদ থেকে ইউফ্রেটিস (মিসর-ইরাক) পর্যন্ত রাষ্ট্র গঠন করতে হলে তাকে দখল করতে হবে লেবাননের একটি অংশও। এরপর ফিলিস্তিন, মিসর, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান ও লেবানন নিয়ে গঠিত হবে সেই কথিত 'প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড'। জায়নবাদী দখলদারীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের জিহাদি আন্দোলনগুলো। এজন্য আমেরিকার সাহায্যে আফগানিস্তান ও ইরাককে পদানত করেছে মূলত জায়নবাদ। ইয়েমেন, সোমালিয়া ও বিশ্বের আরো কিছু মানচিত্রকে বিপজ্জনক চিহ্নিত করে সেসব অঞ্চলে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা ছড়াচ্ছে ইহুদিবাদের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ষড়যন্ত্র চলছে পুরো মধ্যপ্রাচ্য নিয়েও।

ইতিহাস ভুলে গিয়েছে মুসলিম

ইহুদিরা পৃথিবীতে শিকড়হীন জাতি। কোরআনের নীতি ব্যবহার করে তারা এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তারা এখন ভীতিপ্রদর্শন করছে। ইহুদিরা কীভাবে রাষ্ট্র, নেতৃত্ব ও জগৎভীতি সৃষ্টির কৃতিত্বে এসেছে তার চিত্রটি ফুটে উঠে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

'আমি ইচ্ছে করলাম, দুনিয়াতে যাদের হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদের নেতৃত্ব দান করতে, তাদেরকে রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী এবং পৃথিবীতে ক্ষমতাসম্পন্ন করতে। ফেরাউন-হামান বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে যাদের নিকট থেকে ভীতির শঙ্কা ছিল।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৫-৬)

এই নীতি অনুসারে 'যাদের হীনবল করা হয়' (ইহুদিরা এই বিপাকে পড়েছিল) এবং দুর্বলতার কারণে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের পরিচয় থাকে না, পৃথিবীর ক্ষমতার মঞ্চে যাদের স্থান নেই তারাও পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্বে আসতে পারে। দুনিয়ায় যারা অপরাপর শক্তির নিকট ভীত, তারা সৃষ্টি করতে পারে বিপরীত ভীতিপ্রবাহ। অর্থাৎ, পরিণামে তাদেরকে সব রাষ্ট্রীয় শক্তি ভয় করবে- এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব। ইহুদিরা এই নীতিকে কাজে লাগিয়েছে জিহাদের ফর্মূলায়-

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

(সুরা সফ, আয়াত : ১১)

যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজন দুটি জিনিস। একটি 'সম্পদ', অপরটি 'ব্যক্তি'। ১৫ মিলিয়ন ইহুদি ১৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক। দুনিয়ার বেশিরভাগ সম্পদের মালিকও আজ তারা। তারা আমেরিকারও মালিক। আমেরিকা ছাড়া ইহুদি জাতি পৃথিবীতে অন্য যেসব রাষ্ট্রের ওপর অসামান্য প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার করেছে তার অন্যতম অস্ট্রেলিয়া। এই দেশটিতে বসবাসরত ইহুদিরা নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের যে সংগঠন তৈরি করে, তার সর্বনিম্ন সংগঠনকে তারা বলে 'স্টেট'। প্রতিটি স্টেটে বসবাসকারী ইহুদিরা তাদের মাসিক আয়ের ৫% অত্যাবশ্যকীয়ভাবে 'স্টেট'-এর নিকট জমা রাখে। অধিক আয়সম্পন্নরা বাধ্যতামূলক এই দানের বাইরেও অর্থায়ন করে। এই অর্থ সরাসরি বিশ্বজোড়া জায়নবাদী প্রচার ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় হয়। এই অর্থ ব্যয় হয় ইসরাঈল রাষ্ট্রের সংহতিকরণ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে। এভাবে দীর্ঘদিনের সাধনায় আজ তারা এমন একটি অবস্থানে এসেছে, বিশ্বের তথ্য, সম্পদ, যুদ্ধ, অর্থনীতি সবই এখন ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। খোদ আমেরিকা একটি ক্ষুদ্র ইসরাঈল রাষ্ট্রের বাধ্যতার দাস।

সাধারণত ইহুদিরা চাকুরির চাইতে ব্যবসার প্রতি বেশি আকর্ষণবোধ করে। যখনই 'স্টেটে' নতুন কোনো ইহুদি ব্যবসা বা দোকান খোলে, তখন 'স্টেট' থেকে তার সমস্ত অধিবাসীর জন্য এটি ধার্য হয়ে যায়- এই নতুন ব্যবসায়ী যে ব্যবসা শুরু করেছে ৩ মাসের জন্য প্রত্যেক ইহুদি নাগরিক তার থেকে ন্যূনতম ২০০ ডলারের পণ্য কিংবা সেবা ক্রয় করবে। এই বাধ্যবাধকতাপ্রসূত 'খরিদ' নতুন ইহুদি ব্যবসায়িকে শুরু করার মুহূর্ত থেকেই একটি সাবলীল সমর্থন ও শক্তি যোগায়। পরবর্তীতে এটি তাকে সফল ব্যবসায়ী হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, বর্ণিত 'স্টেটে'র এক হাজার ইহুদি যদি ৩ মাসে সেই নব্য ব্যবসায়ির নিকট থেকে মাত্র ২০০ ডলারের পণ্য ক্রয় করে তাহলে তিন মাসে সে প্রায় ২ লাখ ডলারের ব্যবসা পেয়ে যায়।

বর্তমানে ইহুদিরা বিপুল অর্থ ব্যয় করছে ইসলামবিষয়ক *এক্সপার্ট* তৈরির কাজে। ২০০২-০৩ সালের মার্কিন বাজেটে 'ইসলামবিষয়ক এক্সপার্ট' তৈরির

জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যা গণচিনের পূর্ণ সামরিক বাজেটের সমান। এই টাকায় বাংলাদেশের একুশ বছরের বাজেট সংকুলান হয়। এতোগুলো টাকা শুধু *এক্সপার্ট* তৈরি ও গবেষণার জন্য ব্যয় করা হবে! কী গবেষণা হয় এবং কী করে এক্সপার্টগণ?

২০০২-০৩ সালে চিনের সামরিক বাজেট ছিল ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার পরিমাণ মাত্রাটি বড় হয়ে গেছে বলে আমেরিকা চিনের ওপর আপত্তি তুলেছিল। অথচ একই বছর আমেরিকা ইসলামবিষয়ক 'গবেষণা ও এক্সপার্টিজ'-এর জন্য যে বাজেট করেছে তার পরিমাণও ৩৫ বিলিয়ন ডলার। কি হয়েছে আমেরিকার? পৃথিবীতে শত ধর্ম রয়েছে, আর কারো বিষয়ে নয়, শুধু মুসলমানদের বেলায় তাদের এতোটা যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয় কেন? উত্তরটি যদিও বিশাল এককথায় বললে *কিং ডেভিডের* 'কিংডম অব ইসরঈল' প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী জায়নবাদী ব্যবস্থার মূলে তা প্রোথিত। ইহুদিরা অর্থের মালিক। ইহুদিরা ইসলামের চিরশত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ। ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের অন্য অর্থ, ইরাকে ইহুদিদের ভাড়াটে শক্তির আগ্রাসন। জন্মগতভাবেই তাদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণার প্রেষণা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এই প্রেষণায় তাড়িত হয়ে তারা দুনিয়াময় যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে যাবে (দেখুন সুরা মায়েদা, আয়াত : ৬৪)। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘরে-বাইরে। এই যুদ্ধ চলতে থাকবে তার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত। এরপর হয়তো বিশ্ব ইহুদিবাদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হবে। বাসযোগ্য হবে মানুষের পৃথিবী। (-আশরাফ মাহমুদ/আসিফ আরসালান ও ইন্টারনেট)

‘শান্তি আলোচনার’ প্রহসন

সাত দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্য ক্ষত-বিক্ষত জায়নবাদের বিষাক্ত দন্তনখরে। এ অঞ্চলে অশান্তির দাবালন জ্বালিয়ে, ইহুদিদেরকে মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর ‘শান্তি আলোচনার’ নাটক মঞ্চস্থ করেছে পশ্চিমা বিশ্ব।[৭২] এসব আলোচনা ইসরাঈলকে সুযোগ করে দিয়েছে আরো বেশি ফিলিস্তিনি ভূমি জবরদখলের। ফুরসৎ এনে দিয়েছে দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করবার। পশ্চিমাদের ভাষায়, এর মধ্যে কতগুলো ‘ফলপ্রসূ’ আলোচনা হয়েছে। ইসরাঈল-মিসর ও ইসরাঈল-জর্দান আলোচনার মাধ্যমে পৃথক ‘শান্তি’ চুক্তিতে উপনীত হলেও সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু ‘ইসরাঈল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষ’ শেষ হয়নি আজো।

অ্যাথনিক ক্লিংজিং অব ফিলিস্তিন গ্রন্থে ইলান পেপে (*Ilan Pappe*) লিখেছেন, ‘ফিলিস্তিন ও ইসরাঈলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য দশকের পর দশক ধরে যে প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, তা আসলে একধরনের ধোঁকাবাজি এবং ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্নকরণ অব্যাহত রাখতে ইসরাঈলি কূটকৌশল। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর নিজেদের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতা প্রবলতর হয়ে ওঠায় জায়নিস্ট রাষ্ট্রটি কথিত এই শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় কুটিলতার আশ্রয় নেয়। ইসরাঈল ১৯৬৭ সালের আগের সীমারেখায় ফেরৎ যাওয়ার বিষয়ে অস্বীকৃতি জানায়, যা পশ্চিম তীর ও গাজার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এই এলাকাগুলো যেহেতু ফিলিস্তিনের মাত্র ২২ শতাংশ, সেহেতু ইসরাঈল এক ধাক্কায় শান্তিপ্রক্রিয়াকে মূল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ক্ষুদ্র একটি অংশে সীমিত করে ফেলে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম তীর ও গাজায় দৃশ্যমান সবকিছুই ভাগ করা, যাকে শান্তি স্থাপনের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়। ইসরাঈলের জন্য দৃশ্যমান সবকিছুর ভাগ শুধু ভূখণ্ড নয়, বরং মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, ১৯৬৭ সালের আগে নাকবা, জাতিগত নিধনসহ

---

৭২ খৃস্টবাদের ধারক-বাহক দেশ যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটিশ পশ্চিমা বিশ্বের অন্তর্গত।

যা কিছু ঘটেছে, সেগুলো কখনোই আলাপ-আলোচনায় না আনা। এর তাৎপর্য পরিষ্কার: এটি শান্তি আলোচনা থেকে শরণার্থীদের বিষয়টি পুরোপুরি সরিয়ে ফেলে এবং ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার অধিকারকে নাকচ করে দেয়। ইসরাঈলি দখলদারির সমাপ্তিকে সংঘাতের সমাপ্তির সঙ্গে সমর্থক করে তোলা হয় এসব কূটকৌশলের মাধ্যমে। ফিলিস্তিনিদের জন্য অবশ্যই ১৯৪৮ সাল হলো সবকিছুর প্রাণ এবং কেবল অতীতের অন্যায়গুলোকে সংশোধন করা হলেই এই অঞ্চলে সংঘাতের অবসান হতে পারে।'

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ; প্রস্তাব নম্বর-২৪২ : ১৯৬৭

ইসরাঈল-ফিলিস্তিন 'সংঘর্ষ' নিরসনে ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ২৪২ নম্বর প্রস্তাবনা পাস হয়। এই প্রস্তাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক- দুই পক্ষের মধ্যে ভূমি বিনিময়। প্রস্তাবনায় যুদ্ধ চলাকালে ইসরাঈলি সেনাবাহিনী কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া, ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘ সনদের পঞ্চম চ্যাপ্টার অনুযায়ী প্রণীত হয় ২৪২নং প্রস্তাব। কিন্তু এসব কাগুজে উদ্যোগ কখনোই মেনে নেয়নি ইসরাঈল।

১৯৭৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২নং প্রস্তাবনার আলোকে ৩৩৮নং প্রস্তাব পাস করে, যার উদ্দেশ্য ২৪২নং প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন। কিন্তু এ প্রস্তাবনাও খুশি থাকতে পারেনি ইসরাঈল।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর নতুন বাস্তবতায় ফের 'শান্তি' আলোচনার আয়োজন করে জায়নবাদের পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী মেনাশেম বেনিনের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় দুটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রথম চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য' একটি সমন্বিত কর্মপন্থা প্রণয়ন

এবং দ্বিতীয় চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্প ডেভিড কর্মপন্থার আলোকে মিসর-ইসরাঈলের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। আইজাক রবিন (বামে), ইয়াসির আরাফাত (ডানে), মাঝখানে ক্রুসেডার বিল ক্লিনটন। ছবি : জুইশ ভার্চুয়াল লাইব্রেরি
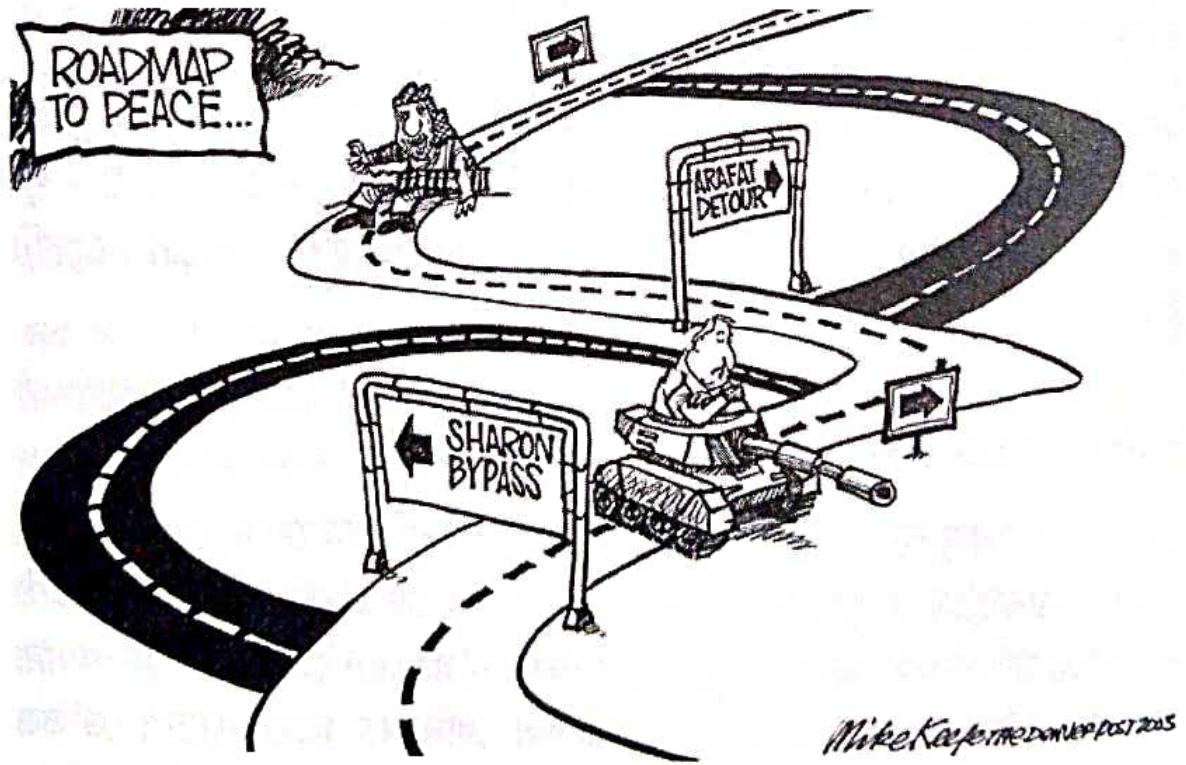
মাদ্রিদ সম্মেলন : ১৯৯১

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির আলোকে ইসরাঈলের সঙ্গে অন্য আরব দেশগুলোর 'শান্তি' চুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ১৯৯১ সালে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা *মাদ্রিদ সম্মেলন* নামে পরিচিত।

অসলো চুক্তি : ১৯৯৩

ইসরাঈল-ফিলিস্তিনের মধ্যে সরাসরি চুক্তির জন্য অসলোতে[৭৩] একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর সূত্র ধরে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে হোয়াইট হাউসে বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ইয়াসির আরাফাত ও ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন। এর মাধ্যমে পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয় ইসরাঈল। বিনিময়ে পিএলও'র তরফে দখলদার সন্ত্রাসীরা লাভ করে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

ক্যাম্প ডেভিড : ২০০০

২০০০ সালে বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় আমেরিকার ক্যাম্প ডেভিডে ফের অনুষ্ঠিত হয় 'শান্তি' আলোচনা। এতে অংশ নেন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইয়াসির আরাফাত, ইসরাঈলি পক্ষে প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক। আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ ছাড়া কোনো চুক্তিই হয়নি সে সময়।

তাবা : ২০০১

মিসরের তাবা শহরে অনুষ্ঠিত 'শান্তি' আলোচনা। শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা ছিলেন না এখানে। এ আলোচনারও উদ্যোক্তা বিল ক্লিনটন।

আরব শান্তি উদ্যোগ : ২০০২

২০০২ সালের মার্চে সৌদি আরবের উদ্যোগে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অনুষ্ঠিত 'শান্তি' উদ্যোগ। কোনো ফলাফল না এলেও ২০০৭ সালে রিয়াদে এ উপলক্ষে আরেকটি সম্মেলনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

রোড ম্যাপ : ২০০৩

---

৭৩ নরওয়ের রাজধানী।

জিমি কার্টারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইইউ[৭৪] ও জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে ২০০৩ সালে একটি কথিত 'রোড ম্যাপ' ঘোষণা করা হয়।

অ্যানাপোলিস : ২০০৭

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের অ্যানাপোলিসে অবস্থিত মার্কিন নৌ-একাডেমিতে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইসরঈল ও আরব রাষ্ট্রগুলো নিয়ে আলোচনায় বসেন। এ আলোচনা থেকে ইসরঈল একটি রাষ্ট্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'শান্তি' প্রক্রিয়া কার্যত এগোয়নি।

ওয়াশিংটন : ২০১০

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিন ও ইসরঈলের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় যোগ দেন মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও জর্দানের বাদশা আবদুল্লাহ। আলোচনা এগোলেও শেষপর্যন্ত চুক্তি ছাড়াই থমকে যায় এই উদ্যোগ।

ওয়াশিংটন : ২০১৩

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেরির মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিন-ইসরঈলের মধ্যকার সরাসরি আলোচনা শুরু হয় ১৪ আগস্ট, ২০১৩ সালে। কেরির আশাবাদ, নয় মাসের মধ্যে দু'দেশ শান্তি চুক্তিতে পৌঁছতে সক্ষম হবে। (-বিবিসি)

---

৭৪ ইউরোপিয় ইউনিয়ন। ইউরোপের ২৮টি খৃস্টান দেশ এর সদস্য।

সৈন্যরা পরাজিত হয় মানুষের

চেতনা পরাজিত হয় না

"...বারিজের ওই প্রতিরোধে পুত্রহারা পিতা সেদিন গণজমায়েতের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি খুশি, আমার ছেলে নিজে জীবন দিয়ে অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।"

ইরাক আক্রমণের ঠিক আগে এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড বার্সামিয়ান[৭৫] অধ্যাপক নোয়াম চমস্কিকে[৭৬] জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুদ্ধ থামাতে সাধারণ মানুষ কী করতে পারে? চমস্কির উত্তর ছিল, 'দুনিয়ার কোনো কোনো এলাকায় মানুষ প্রশ্ন করে না- আমরা কী করতে পারি? যা করার তা তারা করে ফেলে।'

যার জন্ম ও বেড়ে উঠা গাজার উদ্বাস্তু শিবিরে, চমস্কির এই ধোঁয়াটে কথার মানে বুঝতে তার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ১৯৮৯ সালে গাজার *বারিজ* উদ্বাস্তু শিবিরে কঠিন সামরিক কারফিউ চাপিয়ে দেয় ইসরঈল। এক ইসরঈলি সৈন্য মেরে ফেলার শাস্তি ছিল সেটি। *বারিজের* শত শত মানুষকে মেরে ফেলার স্বাভাবিক প্রতিশোধের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন হচ্ছিল। পরের কয়েক সপ্তাহে *বারিজের* আরো কিছু মানুষকে হত্যা করা হলো। ধ্বংস করা হলো উদ্বাস্তুদের ঘর-'খুপরিবাড়ি'। বৈশ্বিক গণমাধ্যমে এসবের খুব সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে।

---

৭৫ আর্মেনিয়ান-আমেরিকান রেডিও ব্রডকাস্টার, লেখক ও অলটারনেটিভ রেডিওর প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম : ১৯৪৫।

৭৬ আবরাম নোয়াম চমস্কি, জন্ম ৭ ডিসেম্বর ১৯২৮। মার্কিন তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সমালোচক। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির এমিরেটাস (সংখ্যাতিরিক্ত) অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজেনার সাম্মানিক (*Laureate*) অধ্যাপক।

পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তু শিবির *নুসিরিয়া* ছিল মূসার আবাস। দারিদ্র্যে জর্জরিত এ উদ্বাস্তু শিবিরগুলো হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধের জননভূমি। মূসার বাড়ি ছিল *শহিদি গোরেস্তানের* পাশে। জায়গাটি ছিল উঁচু। অতো উঁচু জায়গায় বসে শিশুরা ইসরাঈলি সৈন্যদের গতিবিধি নজরে রাখতো। সৈনিকদের দেখতে পেলে শিস বাজিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে খবর পাঠাতো শিবিরে। এছাড়া তাদের আর কি-ইবা করার ছিল? নিরন্তর এই সংগ্রামে খুন হয় মূসার বন্ধু আলা, রায়েদ, ওয়ায়েলসহ আরো অনেকে।

অবরুদ্ধ বারিজ থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেতো মূসাদের শিবির থেকেও। সবাই একত্র হয়ে কি করা যায় ভাবতে লাগলো। কিন্তু কোনোটিই কাজের কথা ছিল না। যদিও ওখানে দরিদ্র ও বন্দী মানুষদের হত্যা করা হচ্ছিল। ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না রেডক্রসকেও। অথচ যা করার এখনই করতে হবে এবং হঠাৎ তা শুরুও হয়ে গেলো। বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা সম্মেলনের ডাক থেকে নয়, অকস্মাৎ পরিস্থিতির আঘাতে কিছু চিন্তা না করে নারীরাই বেরিয়ে এলেন। তাঁরা হাঁটা দিলেন বারিজের মৃত্যুপুরীর দিকে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আরো নারী-পুরুষ-শিশু। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বারিজের সামনে জড়ো হলো। একজন বলে উঠলো, 'ওরা কতো মারবে? ১০০ জনকে মেরে ফেলার আগেই আমরা ওদের ছেয়ে ফেলবো।'

ইসরাঈলি সৈন্যরা প্রতিবাদমুখর গণমানুষের সামনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। মিছিলের অনেকেই আহত হলো, কিন্তু সেদিনের ঘটনায় নিহত হলো শুধু একজন। সৈন্যরা তাদের ব্যরিকেডের পেছনে চলে গেলো এবং এই ফাঁকে রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্স ও জাতিসংঘের গাড়িগুলো বিক্ষুব্ধ মানুষের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সবাই মিলে অবরোধ ভেঙে ফেললো।

মূসার এখনো পষ্ট মনে আছে, বারিজের বাসিন্দারা প্রথমে জানালা খুললো। তারপর ভয়ে ভয়ে খুললো দরোজা। এরপর পায়ে পায়ে এসে মিছিলে শামিল হলো তাঁরা। কি ঘটছে তা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিল না। একসময় সবাই আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। সেই স্মৃতি-উল্লাস, কান্না, মৃতদের

ধরাধরি করে কবর দিতে ছোটা, অনেক হাতে আহতের শুশ্রুষা, বাইরের লোকদের খাবার ও শুভেচ্ছা- আজো মূসার মনে মানবিকসংহতির মহত্তম ছবি হিসেবে জ্বলজ্বল করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার (গণঅভ্যুত্থান) সময় এ দৃশ্য ফিরে ফিরে এসেছে। বরাবর ভয়ঙ্কর অন্যায় ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অতিসাধারণ পন্থায় রুখে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মনে হলেও সেগুলো ছিল সত্যিকারের অসাধারণ ও মানবিকপ্রতিরোধ। বারিজের ওই প্রতিরোধে পুত্রহারা পিতা সেদিন গণজমায়েতের কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি খুশি, আমার ছেলে নিজে জীবন দিয়ে অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।'

পরেরদিন। বারিজের ঘটনার শাস্তি দিতে ইসরঈলি সৈন্যরা মূসাদের শিবিরে চড়াও হয়। কেউ অবাক হয়নি। যা করেছে তার জন্য অনুতপ্তও নয়। তাঁরা জানতো, কী করতে হবে এবং তাঁরা সোজাসুজি তাই করেছে। জনগণ যখন একসঙ্গে যাত্রা করে, দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম শক্তিও তাঁদের রুখতে পারে না। এ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচে বড়ো জেল ভাঙার ঘটনা। অনেক বিশ্লেষক হয়তো এই ঘটনা নিয়ে তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের কাছে যা করার, তাঁরা তাই করেছেন। সৈন্যরা পরাজিত হয়। মানুষের চেতনা পরাজিত হয় না। গাজাবাসীর এ সামষ্টিক সাহসিকতা আমাদের সময়ের ইতিহাসে সবচে বড়ো প্রতিবাদ। রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক আবেদন-নিবেদন যা করতে পারেনি, ফিলিস্তিনি জনগণ বরাবর তাই করেছে। সমস্যা সমাধানের ভার তাঁরা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। যদিও এতেই তাঁদের অশেষ দুর্দশা শেষ হবে না। কিন্তু এ ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, জনতার প্রতিরোধকে খাটো করে দেখা চলবে না। (-*ফিলিস্তিন ক্রনিকলের* সম্পাদকীয় কলামের ছায়াবলম্বনে)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও

রথসচাইল্ডদের প্রক্সিওয়ার

...ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেও কোনো দেশেই তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলে-মিশে যায়নি। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার প্রবণতা এবং খৃস্টান জনসাধারণ কর্তৃক 'যিশুর হত্যাকারী হিসেবে' চিহ্নিত করার ফলে ইহুদিরা খৃস্টানদের সঙ্গে মিলে-মিশে একক সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি।

ফিলিস্তিন প্রশ্নটি উচ্চারণে যতোটা সহজবোধ্য সমস্যার নিরীখে ততোটাই জটিল ও গুরুতর। এ সমস্যার মূল একই ভূখণ্ডের ওপর আরব ও ইহুদিদের দাবি এবং পরিণামে আরব-মুসলিম ও ইহুদি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সহিংস সংঘাত। এ দুটি জাতির পরস্পর-বিরোধী দাবির প্রেক্ষিতে সংঘর্ষ হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে বিশ শতকের প্রারম্ভে খৃস্টধর্মাবলম্বী আরবলেখক *নজিব আজুরি* ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত পুস্তকে আজুরি এই দুটি জাতির সংঘাতকে অনিবার্য বলে মন্তব্য করেন।

ফিলিস্তিন নিয়ে আরব ও ইহুদিদের দাবির ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া ফিলিস্তিন-ইসরঈল সংঘর্ষ সম্পর্কে ধারণা লাভে আবশ্যকীয় বটে। ইহুদিদের দাবি প্রধানত ঐতিহাসিক স্মৃতি। অতীত এ স্মৃতির একদিক হচ্ছে, ওল্ড

টেস্টমেন্টে (*Old-Testament*) বর্ণিত বিশ্ব প্রভুর সঙ্গে তার 'মনোনীত' ইহুদি জাতির 'পবিত্র অঙ্গীকার'।

ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ঘটনাবলি গিডিয়ান, বোয়াজ ও ডেভিডের বীরত্ব, রূথের প্রেম ও আত্মত্যাগ, দেবোরা, লিয়াহ, রেবেকা, র‍্যাসেল ও অন্যান্য নারীর কীর্তিকাহিনি এবং সল, ডেভিড (দাউদ) ও সলেমান (সোলায়মান) কর্তৃক ফিলিস্তিনে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের স্মৃতি যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

আরবদের দাবির ভিত্তি দুটি ঐতিহাসিক স্মৃতি ও বাস্তব পরিস্থিতি। ইহুদিদের উদ্বেলিত করা ঐতিহাসিক স্মৃতির একটি বড়ো অংশের উত্তরাধিকারী আরবগণও। বহু মহাপুরুষ দুই ধর্মাবলম্বীদের নিকট প্রেরিত পুরুষরূপে[৭৭] সম্মানিত। তাছাড়া কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতি মুসলমানদের একান্ত নিজস্ব। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ গমনের সঙ্গে জেরুসালেমের সম্পৃক্ততা, ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ফিলিস্তিনে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন, কুব্বাতুস সাখরা ও মসজিদে আকসার ন্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপনা এবং দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ক্রুসেডারদের নিকট থেকে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহ ও মামলুক সুলতানগণ কর্তৃক ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার এ স্মৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাস্তব পরিস্থিতিও এই দাবি সমর্থন করে।

প্রথমত, সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আরব মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিন আরবজাহানের অবিচ্ছেদ্য অংশ গণ্য হয়ে আসছে। মাত্র ৯০ বছর (১০৯৯-১১৮৯) এই দেশের কিয়দংশ ক্রুসেডারদের দখলে ছিল। দীর্ঘকাল আরব শাসনাধীনে থাকার ফলে এখানে ইসলামি মূল্যবোধে পরিচালিত সমাজ সৃষ্টি হয়।

---

৭৭ পয়গম্বর হিসেবে স্বীকৃত।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের আরব (খৃস্টান-মুসলমান) এখানে বসতি স্থাপন করে। সবদিক বিবেচনায় নিলে আরব মুসলিমদের দাবিই অধিক যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হয়।

ফিলিস্তিন সমস্যার শেষ অঙ্কে দেখা যায়, এই দেশটির ওপর কোন দেশের দাবি কতটা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কিংবা ঐতিহাসিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়নি। বরং, লক্ষ্য অর্জনে কোন দল কতটা সুসংগঠিত হতে পেরেছে এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের ওপর চাপ প্রয়োগে কতটা সক্ষমতা অর্জন করেছে, তাকে সাফল্যের ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ইহুদিরা অধিকতর সাফল্যের দাবিদার।

ক্রুসেড আমলে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কোনো দেশেই তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে একীভূত হয়নি। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার প্রবণতা এবং খৃস্টান জনসাধারণ কর্তৃক 'যিশুর হত্যাকারী হিসেবে' চিহ্নিত করার ফলে ইহুদিরা খৃস্টানদের সঙ্গে মিলে-মিশে একক সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধে মার্কিন অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ ও বৃটিশ সরকারের মাঝে পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে রচিত চুক্তির ফল বৈ আর কিছু নয়। ১৯১৬'র দিকে বৃটিশরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং মার্কিন সাহায্য তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। জায়নিস্টরা মার্কিন সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ১৯১৭'র বেলফোর ডিক্লারেশন (*Belfur Declaration*) আদায় করে নেয়।

বেলফোর ঘোষণাতে ফিলিস্তিনে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেওয়া হয়। *স্টেটস সিক্রেটস* (১৯৭৫) গ্রন্থে *লীওন দোঁ পনসাঁ* একজন সুবিখ্যাত বৃটিশ জায়নবাদীর নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি এই গোপন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'দি জায়নিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক *স্যামুয়েল ল্যান্ডম্যান* বৃটিশ জায়নিস্ট কাউন্সিলের সচিব ছিলেন। জায়নিস্ট এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় তার বই 'গ্রেট বৃটেন' এবং 'দি জিউস এন্ড প্যালেস্টাইন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। এই দুটি বইয়ে বৃটেনকে তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। ল্যান্ডম্যান উল্লেখ করেন, 'উইড্রো উইলসনকে ১৯১৭'র প্রথম মহাযুদ্ধে প্ররোচিত করার একমাত্র উপায়- 'এখন পর্যন্ত সংশয়াতীতভাবে শক্তিশালী আমেরিকা এবং অন্যান্য জায়গায় অবস্থানরত জায়নবাদী ইহুদিদের 'পারস্পরিক বিনিময়' চুক্তির ভিত্তিতে মিত্রশক্তির পক্ষে জড়ো করা এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের চালিত করা।'

গ্রেট বৃটেনের পক্ষ থেকে কেবল স্বতঃস্ফূর্ত, মানবতাবাদী কিংবা রোমান্টিক মহানুভবতা থেকে নয়– ১৯১৭'র বেলফোর (*Belfur*) ঘোষণা ছিল মূলত ১৯১৬'য় সম্পাদিত 'ভদ্রলোকদের' গোপন সমঝোতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি...। (লিওন দোঁ পনসাঁ, পৃষ্ঠা ১৩ - *Emphasis mine*)

দোঁ পনসাঁ অধ্যাপক *এইচ এম ভি টেমপারলিয়*র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বেলফোর ঘোষণা (*Declaration*) অবশ্যই বৃটিশ সরকার ও সংঘবদ্ধ ইহুদিবাদের মধ্যকার একটি চুক্তি'...। (*History of the Peace Conference in Pari*ঃ- পৃষ্ঠা ১৭৩)

কোনো হিটলার[৭৮], দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মানবিক বিপর্যয় এবং ইসরঈলের সম্ভাবনাই ছিল না, যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানি জয়ী হতো। জায়নবাদের ক্ষমতার উৎস কোথায়? মার্কিন প্রেসিডেন্ট *উইড্রো উইলসন* ছিলেন রথসচাইল্ড এজেন্ট এডওয়ার্ড হাউসের ক্রীড়নক। বেলফোর ঘোষণা একটি চিঠির আকারে লর্ড লিওনেল রথসচাইল্ডের ঠিকানায় প্রেরিত হয়। শুরু থেকে ইসরঈল ছিল রথসচাইল্ডের ব্যক্তিগত প্রকল্প। ইহুদিদের 'আবাসভূমি' হিসেবে এর কখনোই প্রয়োজন ছিল না। কমিউনিজম এবং ইসরঈল রাষ্ট্রের ধারণা ছিল *লুসিফারে*র

---

৭৮ অ্যাডলফ হিটলার (*Adolf Hitler*) ২০ এপ্রিল ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ সালে বার্লিনে বাঙ্কারে স্বপরিবারে আত্মহত্যা করেন বলে ধারণা করা হয়। হিটলার অস্ট্রিয় বংশোদ্ভূত জার্মান রাজনীতিবিদ। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৩৩-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর এবং ১৯৩৪-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে দেশের ফিউরার ছিলেন। ১৯৩৯ সালে জার্মানরা পোল্যান্ড অধিকার করলে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে সূচনা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

(ফ্রি-ম্যাসনদের সর্বদর্শী আরাধ্য দেবতা) উদ্দেশ্যে নিবেদিত রথসচাইল্ডের দ্বারা শাসিত বিশ্বরাষ্ট্রের অহং-স্ফীত ধারণার দুটি শক্তিশালী বাহু। পৃথিবীর ভবিষ্যত রাজধানী ইসরঈলের অর্থায়নের জন্য রথসচাইল্ড[৭৯] মার্কিন সরকারের

---

৭৯ কথিত আছে, পৃথিবী সমস্ত সম্পদের চার ভাগের তিন ভাগ অংশের মালিকানা রথচাইল্ড ফ্যামেলির হাতে! বিশ্বের ধনী তালিকায় এই পরিবারের কারোর নাম না থাকার কারণ বাইরের কেউ জানেই না এদের মোট সম্পদের পরিমাণ কত। আঠারো শতকের ষাটের দশকে ব্যাংকিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আজকের অবস্থানে উঠে আসে এই ইহুদি পরিবার। রথচাইল্ড পরিবারের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি মায়ার আমসেল বাউয়ার। ১৭৪৪ সালে জার্মান ইহুদি পরিবারে তার জন্ম। পেশায় মহাজনী ব্যবসায়ী ছিলেন এই বাউয়ার। ১৭৬০ সালে বিশ্বে প্রথম আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তিনি এবং তার ৫ ছেলে। ইউরোপের সর্বত্র ব্যাংকিং অন্যকথায়, চড়া সুদে ঋণ ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্য আনে বাউয়ার রথচাইল্ড ফ্যামেলি। ইউরোপের ওই সময়কার সবচে সমৃদ্ধ শহরগুলো ছিল নেপলস (ইতালি), প্যারিস (ফ্রান্স), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) ও লন্ডন (ইংল্যান্ড)। মায়ার রথচাইল্ডের এক ছেলে ফ্রাঙ্কফুটে ব্যবসা দেখভাল করতো। অন্য চার ছেলে চারটি শহরে ব্যাংক খুলে ব্যবসা শুরু করে। এই শহরগুলো থেকে ইউরোপের সমস্ত রাজকীয় পরিবারের সঙ্গে সুদী কারবারে জড়ায় রথচাইল্ডরা। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহকে উচ্চ সুদে ঋণ ও বন্ড দিত তারা।

গত দুই শতাব্দী ধরে রথচাইল্ডদের নিয়ে আছে নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। ফরাসি বিপ্লব, ওয়াটারলু যুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, ইসরঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, এমনকি হিটলারের হলোকাস্ট- এর সব কিছুর পেছনে ভূমিকা আছে রথচাইল্ড পরিবারের। নিজেদের ব্যবসার স্বার্থেই এসব করেছে তারা। ছিল ধর্মীয় অনুভূতিও।

১৯১৯ সালের ২৯ মার্চ বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে বৃটিশ গণমাধ্যম *টাইমস অব লন্ডনের* এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বলশেভিক বিপ্লবের সবচে কৌতূহলোদ্দীপক দিক হচ্ছে- এর নেতাদের অধিকাংশই রুশ নয়। বিপ্লবে ভূমিকা রাখা ২০-৩০ নেতার মধ্যে ইহুদির হার ৭৫ ভাগ। ভ্লাদিমির লেনিন নিজেও ইহুদি।' যদিও পরে রুশদের সঙ্গে আর মিলে থাকা সম্ভব হয়নি রথচাইল্ডের। কারণ বিপ্লবের সময় কথা ছিল, কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না সরকার। কিন্তু সে কথা রাখেনি বলশেভিকরা।

ইসরঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে রথচাইল্ডের ভূমিকা ছিল সবচে বেশি। ইসরঈলকে যাতে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়া হয় সেজন্য ৩৩তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যানকে ২০ লাখ ডলার দিয়েছিল তারা। নির্বাচনী প্রচারণা তহবিলের নামে দেওয়া হয়েছিল ওই অর্থ। ইতিহাস বলে, ইসরঈল 'রাষ্ট্র ঘোষণার' মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ যুক্তরাষ্ট্র। চিনের মাও জে দংয়ের বিপ্লবেও অর্থ ঢেলেছিল রথচাইল্ডরা!

ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়েছে। মার্কিনিরা ইরাক-আফগানিস্তানে বেঘোরে মারা পড়ছে তাদের এজেন্ডা এগিয়ে নিতে। আর এখন? ইউএস ওয়ান ডলারে খোদিত 'নোভাস অরডো সেকলোরাম' বা *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার*[৮০] বাস্তবায়নের

পৃথিবীর একমাত্র ট্রিলিয়নিয়ার রথচাইল্ড ফ্যামেলির নামে ১৫৩টি পতঙ্গ, ৫৮টি পাখি, ১৮টি স্তন্যপায়ী, ১৫টি উদ্ভিদ ও ২টি সরীসৃপের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- প্রজাপতির বৈজ্ঞানিক নাম- *Ornithoptera Rothschildi*। ইসরাঈলি বিভিন্ন রাস্তাঘাটের নাম এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে রাখা। এন্টারটিকা মহাদেশে রথচাইল্ড আইল্যান্ড নামে একটি দ্বীপ আছে। ১৭৬০ থেকে পরিবারটি কঠোর গোপনীয়তা ও নিয়মকানুনের কারণে আজও টিকে আছে প্রভাবের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠাতা মায়ার রথচাইল্ড মারা যাওয়ার আগে উইলে স্পষ্ট উল্লেখ করেন, তাদের ব্যবসা কোনোভাবেই পরিবারের বাইরে যাবে না। পরিবারের বড় ছেলেই হবে ব্যবসার প্রধান। এমনকি বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে পরিবারের বাইরে কোনো সদস্যের বিয়ে দেয় না রথচাইল্ডরা। বর্তমানে এরা ঠিক কি পরিমাণ সম্পদের মালিক কেউ জানে না তা। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের নামে সরাসরি ব্যবসার পরিমাণও কম। বিভিন্ন কোম্পানির নামে দুনিয়াজুড়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এরা।

ব্যাংকিং ব্যবসা, তেল ব্যবসা ও টুরিজমসহ আরো বহু দৃশ্য-অদৃশ্য ব্যবসার মালিক রথচাইল্ডরা। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভেরও মালিক এরা। এছাড়াও বহু রাষ্ট্রীয় ব্যাংক তাদের কাছে জিম্মি। তাদের পরিবারের ক্ষমতা এতটাই, বিশ্বের যেকোনো দুর্যোগ থেকেই এরা ফায়দা লুটে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া, বিবিসি, ইনভেস্টোপিডিয়া, ডেইলি বাংলাদেশ)

৮০ ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক জায়নবাদ একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে। এই রূপরেখা দাজ্জাল কর্তৃক একক বিশ্বব্যবস্থা বা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার নীলনকশা। একে বলা হয় *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার* (New World Order)| শুরুর দিকে যদিও এই সিস্টেমটি অর্থনৈতিক বিষয়াষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে একে একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধানের রূপ দেওয়া হয়। পৃথিবীর সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্তে এনে নতুন এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে 'জাতিসংঘ' নামক প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। সুদি কারবার *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডারের* গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার* বা এক বিশ্ব তত্ত্বের মূল কথিত ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার ওপর গৃহীত। এটি নিছক আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে নয় বরং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই রাষ্ট্রের সীমারেখা পৃথিবীর সীমারেখার সমান। অর্থাৎ, এখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র থাকবে না। সমস্ত পৃথিবী মহাবিশ্বের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একত্রিত হবে এবং এক 'মহান নেতা'র অনুগত হয়ে 'সত্য' ও 'ন্যায়ের পথে' নিজেদেরকে পরিচালিত করবে।

নতুন এই ধর্মের ব্যাখ্যায় ডক্টর জন কোলেমান (*Dr. John Coleman*) *Conspirators Hierarchy: The committee of 300* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- 'আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করে নানাবিধ সংগঠনের মাধ্যমে এই নতুন ধর্ম মানুষের

অশুভ আকাঙ্ক্ষা সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে নিয়তই রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত করছে গোবেচারা পৃথিবীটাকে।

মাঝে প্রবেশ করাচ্ছে। *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার* কেবল আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতিই নয়, বরং পূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা বা একটি নতুন ধর্ম। এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা, যাকে একটিমাত্র আন্তর্জাতিক সরকার শাসন করছে অনির্বাচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু ব্যক্তির নির্দেশনায়। সম্ভবত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার আকারে এরা নিজের চাহিদামত বিষয় নির্বাচন করছে। *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডারের* তাৎপর্য হচ্ছে- প্রতিটি ব্যক্তি বৈশ্বিক নাগরিক। নতুন এ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পৃথিবীজুড়ে নাগরিকদের সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং প্রতি বংশে সন্তান সংখ্যার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপিত হবে। কোনো অঞ্চলে বেশি থাকলে যুদ্ধ কিংবা মহামারি ছড়িয়ে সেখানকার জনসংখ্যা কন্ট্রোল করা হবে। শুধু ওই পরিমাণ অবশিষ্ট রাখা হবে, যে পরিমাণ থাকলে সেখানকার সরকার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।... নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে শুধু একটি ধর্মই পালন করার অনুমতি থাকবে। এটি আন্তর্জাতিক আধুনিক আকৃতিতে হবে, যার সূচনা ১৯২০ সাল থেকে হয়েছে। শয়তানি ও ইবলিসি জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে, যেখানে কাউকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান করা হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির (পুরুষ বা মহিলা) অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া হবে, সে এক সরকারের সৃষ্ট ব্যক্তি। তার ওপর লাগিয়ে দেওয়া হবে একটি পরিচয়পত্র (আইডি নম্বর)। এই পরিচয় নম্বরটি একটি কেন্দ্রীয় তথ্যাগারে (*Central server*) থাকবে, যা তদারকি করবে একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সি।'...

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার* দাজ্জালের এডভান্স ফোর্সের (অগ্রগামী বাহিনীর) বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের আগাম প্রস্তুতি। *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে* এগিয়ে নিতে জাতিসংঘের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে, ভিসাবিহীন রাষ্ট্র বা সীমানাহীন পৃথিবী। *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডার* দাজ্জালের এডভান্স ফোর্সের বিশ্বব্যাপী আগাম প্রস্তুতি মাত্র। দাজ্জাল এসে যখন নিজেকে রব (প্রভু) দাবি করবে, তখন যেন সহজে তারা বিশ্বের ওপর একক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে *নিও ওয়ার্ল্ড অর্ডারের* প্রতিভূরা। যদিও প্রতিটি মুসলমানই জানেন এবং বিশ্বাস করেন, দাজ্জাল ওই সময়ই বের হতে পারবে, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তা চাইবেন। দাজ্জালের এই ক্ষমতা নেই, স্বীয় ক্ষমতা বলে বের হয়ে আসবে। যদিও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে অনুমিত হচ্ছে, গোটা মুসলিম উম্মাহ দ্রুততার সঙ্গে এই চূড়ান্ত পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। (-আমিন বেগ)

জায়নিস্ট সন্ত্রাস মোকাবেলায়

হামাস প্রতিরোধ আন্দোলন

ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা-পিএলও যে স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৮৭ সালে *হামাস* নামে নতুন একটি দলের উৎপত্তি হয় ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়। *হামাস* শব্দের আক্ষরিক তরজমা- 'আশা' বা 'উদ্দীপনা'। দলটির পুরো নাম *হরকত মুকাওয়ামাতুল ইসলামিয়া* (حركة المقاومة الاسلامية)। প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ আহমদ হাসান ইয়াসিন (১৯৩৭-২২ মার্চ ২০০৪)। শুরুতে অতো আলোচিত ছিল না দলটি। ফাতাহ'র ব্যর্থতার সূত্রকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠে তারা।

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

শায়েখ ইয়াসিন কিছু যৌক্তিক কারণে পিএলও'র ওপর ছিলেন বিরক্ত। তিনি এও বুঝতে পারেন, ইসরঈল কখনোই ফিলিস্তিনকে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি দেবে না। ১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে যতোগুলো কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল নিষ্ফল। 'আলাপ-আলোচনার' অসারতা বুঝতে পেরে শায়েখ ইয়াসিন জায়নবাদী আগ্রাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ডাক দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার করে একটি কথা বলেন-

> 'ফিলিস্তিন মুসলমানদের জন্য শেষবিচারের দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং কোনো আরব নেতার অধিকার নেই এর এক টুকরো অংশও মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের মানুষদের ভোগ করতে দেবে।'

১৯৮৮ সালে গৃহীত হয় 'হামাস চার্টার' যার লক্ষ্য ছিল- অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে দখলদারিত্বের অবসান ঘটানো। পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত

শুরুতে ছিলেন আপোষহীন। '৮৮ সাল পর্যন্ত *পিএলও* ছিল দুর্দান্ত গেরিলা সংগঠন। কিন্তু জাতিসংঘের প্রস্তাবে আরাফাত অস্ত্র পরিত্যাগ করে ইসরাঈলের সঙ্গে 'শান্তি' আলোচনায় বসলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। শান্তি আলোচনার নামে ইসরাঈল একদিকে সময়ক্ষেপণ করে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনি ভূমি দখল ও অবৈধ বসতি স্থাপনের কাজ চালিয়ে যায় দুর্বার গতিতে। আরাফাতের 'শান্তি আলোচনার' ফলাফল, ফিলিস্তিনি জমিতে নতুন নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণ! আজকের ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে ইহুদি বসতি। ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো, পশ্চিম তীর ও জেরুসালেম মৌমাছির চাকের মতো ছেয়ে গেছে ইহুদিতে।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইউরোপিয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইসরাঈল ও জাপান হামাসকে 'সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পশ্চিমাদের আবদার, ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিতে হবে হামাসের এবং অতীতের কয়েকটি 'শান্তি' চুক্তিও মেনে নিতে হবে তাদের। স্বভাবতই হামাস এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাসের প্রতি রয়েছে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপক সমর্থন। শুধু কট্টর ইসরাঈল বিরোধীই নয় জনহিতকর ও সামাজিক নানা কর্মসূচির সঙ্গেও দলটি সম্পৃক্ত।

হামাসের মূল শাখা তিনটি- *রাজনৈতিক শাখা*, *সমাজকল্যাণমূলক শাখা* ও *সামরিক শাখা*। মজলিশে শূরা হামাসের প্রতিনিধিদের মিলনস্থল, যার মাধ্যমে হামাস সমগ্র ফিলিস্তিনে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। হামাসের নীতিনির্ধারণী পরিষদ পনেরো সদস্যের 'পলিটিক্যাল ব্যুরো'। বর্তমানে হামাসকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন খালেদ মাশাল।

নির্বাচনে বিজয়

২০০৪ সালে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সেটি চরম আকার ধারণ করে ২০০৬-এর নির্বাচনের পর। ২০০৬-এর জানুয়ারিতে ফিলিস্তিনি সংসদীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে বিস্ময়করভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় হামাস। ১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৪টিতে বিজয়ী হয় তারা। 'মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের' প্রবক্তা আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন একযোগে হামাসের সরকার গঠনের অধিকারকে

অস্বীকার করে। যদিও 'গণতন্ত্রে'[৮১] ফেরানোর প্রচেষ্টা থেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়- ইরাক, আফগানিস্তান ও আরো কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রকে! কিছুদিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও ইসরাঈলের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের শিকার হয় দলটি। হামাস নেতৃত্বাধীন সরকারকে পশ্চিমারা কখনো স্বীকৃতি দেয়নি।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবের হস্তক্ষেপে হামাস ও ফাতাহ'র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ওই বছরের মার্চে *Palestinian Legislative Council* (পিএলসি) গঠিত হয়। ফাতাহ'র প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশ্চিম তীরে ফাতাহ ও গাজা হামাস নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই শপথগ্রহণ রামাল্লা (পশ্চিম তীর) ও গাজায় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও ফাতাহ'র একপেশে সিদ্ধান্তে আবারো শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১৫ জুন গাজায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে হামাস। গাজার জনসাধারণ হামাসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বীরের মতো বরণ করে নেয় তাঁদের। এরপর গাজা থেকে ফাতাহ'র সরকারি আমলারা ফিরে যায় পশ্চিম তীরে।

---

৮১ গণতান্ত্রিক কুফুরি ব্যবস্থার মুলো ঝুলিয়ে মুসলিমবিশ্বকে বশীভূত ও আজ্ঞাবহ করে রাখতে চায় আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো। সমাজতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রের উদ্গাতাও আন্তর্জাতিক জায়নবাদ।

নুড়ি হাতে ট্যাঙ্কের মোকাবেলা। এ এক অসম যুদ্ধ, যাতে শরিক হয়েছে বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে সবাই।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

৩৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একচিলতে গাজায় জনসংখ্যা প্রায় আঠারো লাখ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে তেরো হাজার মানুষ। মিসরের সঙ্গে ১১ কিমি. ও ইসরাঈলের সঙ্গে ৫২ কিমি. স্থল-সীমান্ত আর একদিকে আছে অবারিত ভূমধ্যসাগর, যা ইসরাঈলি নৌ-বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ। গাজার ১৮ লাখ মানুষের ১০ লাখ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত উদ্বাস্তু। এমন একটি ভূখণ্ডে দশ বছরব্যাপী অবরোধের মধ্যে থেকেও দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করছে হামাস।

ইসরাঈলি বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উঠে এসেছে হামাসের কার্যক্রমের ৯০% সামাজিক, শিক্ষা বিস্তার, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক এবং এই সামাজিক কাজের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা, মসজিদ স্থাপন, স্কুল ও শিশুশিক্ষায় অর্থায়ন ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা অন্যতম। বার্ষিক ৭০-৯০ মিলিয়ন ডলারের একটি বাজেট দিতে সক্ষম হয় দলটি, যার ৮৫% অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সামাজিক

ও জনকল্যাণমূলক কাজে। প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে তাদের বরাদ্দ ১৫%।[৮২]

ইসরাঈলি আগ্রাসনে শহীদ ফিলিস্তিনিদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এককালীন ও নিয়মিত অর্থ সহায়তা দেয় হামাস (যার পরিমাণ ৫০০ থেকে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত)। ধ্বংস হওয়া বাড়ি-ঘর, স্কুল বা মসজিদ মেরামত করার জন্য তাদের আছে আলাদা সেল। সরকারের ধর্মমন্ত্রনালয়ের অধীনে 'ফাদেলা' বা '*Virtue Committee*' নামে নাগরিক কমিটি আছে, যারা বিভিন্নভাবে জনসাধারণকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহবান জানায়।

শিক্ষাব্যবস্থা

টানা দশ বছরের অবরোধ এবং নানা ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও গাজা উপত্যকায় শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে হামাস। ২০১২ সালের হিসেবে গাজায় শিক্ষার হার ৯৯%। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও চার লাখ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬৮৩টি স্কুল রয়েছে যার ৩৮৩টি সরকার অর্থাৎ হামাস পরিচালনা করে। শিশুদের জন্য অসংখ্য নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা, যেখানে শিশুদের একবেলা খাবারও সরবরাহ করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবায় হামাস নিজেকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য অবস্থানে। অব্যাহত অবরোধে খাদ্যের মান কমে যাওয়ায় গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে শৈশবকালীন অপুষ্টির হার মারাত্মকহারে বেশি। এছাড়া প্রতিনিয়ত ইসরাঈলি আগ্রাসনে আহত মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা তো রয়েছেই। হামাস পরিচালিত হাসপাতালে কম খরচে বা বিনা খরচে সুচিকিৎসা দেওয়া হয়। মৃত্যু উপত্যকা গাজায় বর্তমান জন্মহার ৪%। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও দাতা দেশ থেকে আসা সাহায্য ও আর্থিক অনুদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছে দলটি যেখানে ফাতাহ গোষ্ঠী আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্নীতিতে। হামাসের সামাজিক কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা শুধু গাজা উপত্যকায়

---

৮২ কিংডম অফ গড-২০০৭, রুভন পাস।

নয়, বরং ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীর এমনকি আশেপাশের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও সুনাম কুড়াচ্ছে।

মিডিয়া উইং

২০০৬ সালে হামাস চালু করেছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল 'আল-আকসা টিভি'। হামাস সদস্য *ফাতহি হাম্মাদের* মিডিয়া হাউজ 'আর-রেবাত কমিউনিকেশন্স'-এর নেতৃত্বে রয়েছে নিজস্ব রেডিও স্টেশন 'ভয়েস অব আল-আকসা' এবং সংবাদ পত্রিকা 'দ্য ম্যাসেজ'। অনলাইন জগতে টুইটার এবং ফেসবুকসহ সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে রয়েছে দলটির সরব উপস্থিতি। লন্ডন থেকে *আল-ফাতেহ* নামে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের হয় নিয়মিত।
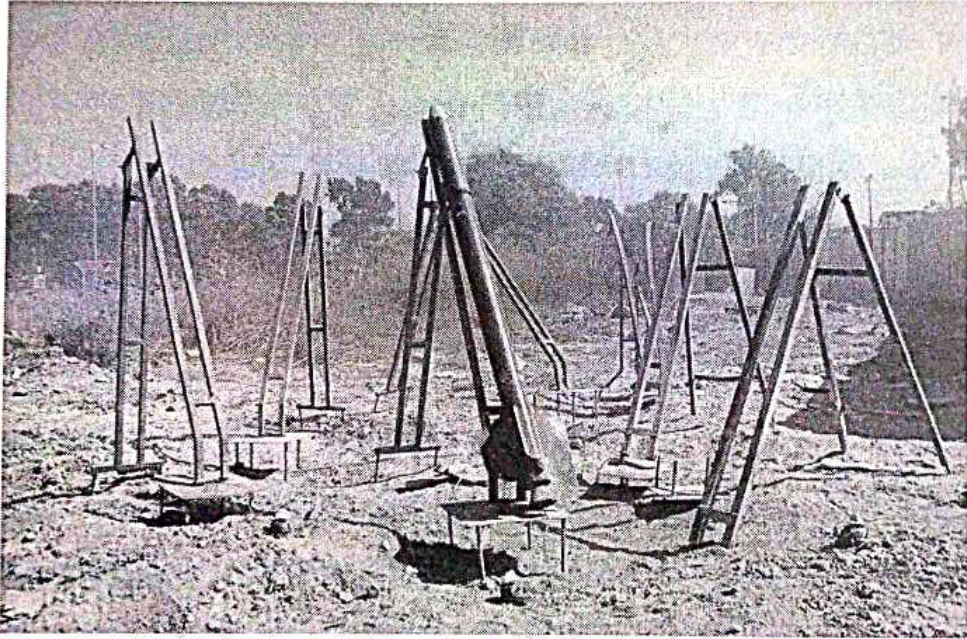
হামাসের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বানানো কাসাম রকেট। দূরতম পাল্লা ১৬ কিমি.! ফিলিস্তিনের পাশাপাশি সিরিয়া যুদ্ধে আগ্রাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে এধরনের রকেট এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। ছবি : আইডিএফ

সামরিক শাখা

হামাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইং এর সামরিক শাখা *শায়েখ* ইজ্জুদ্দীন *আল-কাসসাম ব্রিগেড*। সংক্ষেপে 'আল-কাসসাম ব্রিগেড'। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরাঈলকে সামরিকভাবে তটস্থ রেখেছে ইজ্জুদ্দীন *আল-কাসসাম*। সীমিত সাধ্যের মধ্যেও নিজস্ব প্রযুক্তি ও অর্থায়নে *কাসসাম রকেট* দিয়েই

জায়নবাদের বিলিয়ন ডলারের আয়রন ডোম[৮৩] অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করছে হামাস। ইসরঈলের প্যাট্রিয়ট মিসাইল[৮৪] এবং এফ-১৬'র[৮৫] মোকাবেলায় *কাসসাম ব্রিগেডের* ব্যবহার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে স্বল্প মাত্রার

---

৮৩ ইসরঈলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থার নাম 'আয়রন ডোম'। ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে ইসরঈলি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান 'রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস' এই আয়রন ডোম সিস্টেম তৈরি করেছে। ৪ থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে ছোড়া শত্রুপক্ষের রকেট এবং গোলা যাত্রাপথে ধ্বংস করে দেওয়া এর উদ্দেশ্য। পুরো প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। ফলে এই ব্যবস্থার আওতায় কোনো রকেট ধরা পড়লে সেটিকে ধ্বংস করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাল্টা গোলা ছোড়ে আয়রন ডোম। জায়নবাদীদের দাবি এর সাফল্যের মাত্রা ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত। ইসরঈলি সন্ত্রাসী বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আয়রন ডোমের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে। হামাসের ছোঁড়া রকেটের মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ ঠেকাতে পারছে ইসরঈল-মার্কিন যৌথপ্রকল্পে গড়ে তোলা এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। গাজা থেকে ছোঁড়া ১২০টি রকেটের মধ্যে মাত্র ৮টি ঠেকাতে পারছে *আয়রন ডোম*।

৮৪ শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধবিমান ধ্বংস করতে প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যবহার করা হয়। বর্তমান বিশ্বে অল্পকয়েকটি দেশের হাতে এধরনের অস্ত্র রয়েছে। একটি রাডার, নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, জ্বালানি সরবরাহকেন্দ্র, যোগাযোগ টাওয়ার ও নিক্ষেপকের (যে যন্ত্র থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়) সমন্বয়ে এই ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। নির্মাতাদের ভাষ্যে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থায় ১৬টি পর্যন্ত নিক্ষেপক থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত ৮ থেকে ১০টি ব্যবহার করে। আগে প্রতিটি নিক্ষেপকে চারটি করে ক্ষেপণাস্ত্র থাকত। সর্বাধুনিক 'প্যাক-৩' সংস্করণে ১৬টি পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। রাডার ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে নিক্ষেপকগুলো এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে থাকতে পারে। যোগসূত্রের কাজ করে বেতারতরঙ্গ। অতিসূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সুবিশাল এলাকায় নজরদারি করে রাডার। এর গতি খুব দ্রুত। প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার মাইল এলাকা ঘুরে আসতে পারে রাডারের এই 'চোখ'। ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে আটকালেই রাডার সংকেত পাঠায় নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র সেই অস্বাভাবিকতা বা শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্য করে ছুটে যায়। পাঁচ মিটার লম্বা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শব্দের গতির চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুততাসম্পন্ন। প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র ৯০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বহন করতে পারে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো সংকট, নিক্ষেপের পর ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর সক্রিয় হতে ৯ সেকেন্ড সময় লেগে যাওয়া। প্যাট্রিয়টের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৮১ সালে। আর নাম ছড়ায় ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়। ইরাকের স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় প্যাট্রিয়টকে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, জাপান, ইসরঈল, সৌদি আরব, কুয়েত, তাইওয়ান ও গ্রিসের কাছে এ ব্যবস্থা রয়েছে।

'আল-বানা, আল-বাতার এবং আল-ইয়াসিন' রকেট। আছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গোলাসহ কিছু হালকা যুদ্ধাস্ত্র। তাঁদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র, 'অকুতোভয় ঈমান, দৃঢ়তা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি ভরসা ও ভালবাসা'।
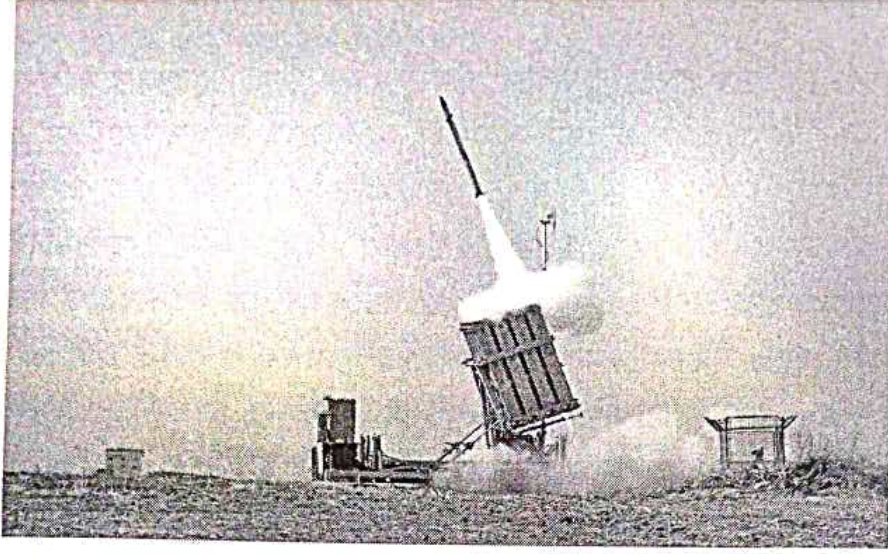
আয়রনডোম। হামাসের রকেট মোকাবেলায় কাজ দিচ্ছে না ইসরঈলি সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরের তলদেশ দিয়ে ইসরঈলে পৌঁছে এক দুঃসাহসিক কমান্ডো অভিযানের চেষ্টা চালিয়েছে হামাস যোদ্ধারা। মুসলিম দেশ হিসেবে সফলভাবে ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তারা, যা তেলআবিবের (ইসরঈলের রাজধানী) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। স্থলযুদ্ধে হামাসের যোদ্ধারা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত। একারণে একাধিকবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী দিয়ে আগ্রাসন চালিয়েও ৩৬০ বর্গকিলোমিটারের গাজাকে হার মানাতে পারেনি ইসরঈল।

২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত হামাসের ছোড়া রকেট হামলায় ১০ বছরে মারা গিয়েছে মোট ১৫ ইসরঈলি নাগরিক। এই 'নির্বিচার' রকেট হামলার ঘটনাকে

---

৮৫ এফ-১৬ ফাইটিং জেট ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্সের অন্যতম ফাইটার এয়ারক্রাফট। এটি ফোর্থ জেনারেশন মাল্টিরোল ডেটাইম ফাইটার। মার্কিন এয়ারফোর্সের পক্ষে এফ-১৬'র ডিজাইন এবং ডেভলপ করেছে *জেনারেল ডায়নামিকস*। ভিয়েতনাম ও কোরিয়া যুদ্ধের পর আমেরিকা ১৯৬৯ সালে নতুন যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য কঠোর গোপনীয়তায় 'এফএক্স' নামে একটি প্রোগ্রাম হাতে নেয়। এই প্রোগ্রামের আওতায় হেভিওয়েট ফাইটার হিসেবে এফ-১৫ ও লাইটওয়েট ফাইটার হিসেবে এফ-১৬ ডিজাইন করা হয়। বর্তমানে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও জায়নিস্ট ইসরঈল এধরনের যুদ্ধবিমান ব্যবহার করছে।

'যুদ্ধাপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিভিন্ন 'মানবাধিকার' সংস্থা। মুদ্রার অপরপিঠ সবারই জানা। শুধু তিন ইসরাঈলি কিশোরকে হত্যার 'সন্দেহে' চলা *অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজের* মারণযজ্ঞে নিহত হয়েছে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি, যার মধ্যে রয়েছে চার দিন বয়সী শিশুও।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সীমাহীন আত্মত্যাগ, সততা-দক্ষতা ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও আমরণ লড়াইয়ের অদম্য মানসিকতাই হামাসকে দাঁড় করিয়েছে এক অনন্য অবস্থানে। শুধু ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ে নয় পৃথিবীর সব মজলুম ও সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে তাঁদের জন্য আছে অনন্য স্থান। সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৫২% ফিলিস্তিনি তাদের সমর্থন জানিয়েছে হামাসের পক্ষে, অপরদিকে ফাতাহ'র জনসমর্থন মাত্র ১৩%। *Pew Research Center*-এর একটি সমীক্ষা বলছে, জর্দানের ৬০% এবং লেবানন ও মিসরের ৫০% মানুষ হামাসের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। (-ইন্টারনেট, শায়েখ মাহদি/অন্যান্য)

বধ্যভূমি গাজা

ফিলিস্তিনের বঞ্চিত এক জনপদ গাজা। এখানকার মানুষগুলোর অপরাধ- তারা মুসলিম এবং হামাস নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাসিন্দা। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুর্দশার শুরু ফিলিস্তিনিদের। গাজাবাসীর দুর্দশা যেন একটু বেশিই। পান থেকে চুন খসলে তাদের ওপর নেমে আসে গুলি-বোমা-হত্যা। ৯ জুলাই ২০১৪ ছিল তেমন একটি দিন। লিফলেটগুলো ভোরের শিশিরের মতো সকালের মৃদু আলোয় আলতোভাবে নেমে আসছিল। লিফলেটের সবকটি বর্ণ পড়ে শেষ করবার আগেই পড়তে শুরু করলো বোমা। ভবনগুলো মুহূর্তের মধ্যে মিশে যেতে লাগলো ধুলোয়। 'শূন্য বোমা'র আঘাতে। মনে হলো প্রস্তর যুগ ফিরে এসেছে। শিশু, কিশোর, নারী- সব বয়সী মানুষই মৃত্যুর কোলে ঢলে ঢলে পড়তে লাগল একে একে। গাজায় ইসরাঈলি সন্ত্রাসের এমন দৃশ্য নিতান্ত স্বাভাবিক।

ইসরাঈলি সন্ত্রাসীদের হুঁশিয়ারির পর গাজার মানুষ পালাতে শুরু করে। সন্ত্রাসীদের ঘোষণা ছিল, জিএমটি সময় ৫টার মধ্যে ঘর-বাড়ি খালি করতে হবে সবাইকে। এ হুঁশিয়ারির পর গাজাবাসী অনেকেই ছুটতে শুরু করে। প্রচণ্ড আতঙ্কে ছোট্ট শিশুটি দৌড়াতে থাকে তার চেয়েও ছোট বোনটিকে কাঁধে নিয়ে। মা তার বাচ্চাদের আগলে নিতে থাকে। কোনোভাবে সরিয়ে নেওয়া হতে থাকে অসহায় বৃদ্ধ আর চলৎশক্তিহীনদেরকেও। কিন্তু কোথায় যাবে তারা?

৩৬০ বর্গকিলোমিটারের গাজা উপত্যকায় ১৮ লাখ লোকের বসবাস। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অন্যতম এটি। অধিবাসীদের বেশিরভাগই শিশু। ইসরাঈলিদের কঠোর অবরোধে আগে থেকেই এটি বিশ্বের সবচে বড়ো 'উন্মুক্ত কারাগার'। জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলো সেখানে পৌঁছানোর তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। উন্মুক্ত এই *কারাগার* এখন পরিণত হয়েছে বধ্যভূমিতে। আঠারো দিনের টানা আগ্রাসনে গাজার প্রতিটি ইঞ্চি

জায়গাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে ইসরাঈলি সন্ত্রাসীরা। হাজার হাজার লক্ষ্যবস্তুতে ফেলা হয়েছে বোমা। নিহত হয়েছে দুই হাজার মানুষ। আহত আট হাজারেরও বেশি। 'যুদ্ধের' পুরোটাই একতরফা। দুই হাজার ফিলিস্তিনির অনুপাতে ইসরাঈলি নিহতের সংখ্যা ৬৭। ফিলিস্তিনি পক্ষে আহতদের বেশিরভাগই শিশু। সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে রেহাই মেলেনি গাজার হাসপাতালগুলোরও। *বাইত জাহিয়ার* হাসপাতালে হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে তিন রোগী ও এক নার্সকে। গাজার অধিবাসীরা প্রশ্ন করছেন– তাঁরা কি মানুষ নন? শাতি উদ্বাস্তু শিবিরে ৬৫ বছর বয়স্ক আবু আশরাফ *সিএনএন*কে বলেন, 'আমরা এখানে বড়ো এক কারাগারে আছি। আমরা মুক্ত নই। আমরা কেন অন্য স্বাধীন মানুষের মতো বাস করতে পারবো না। আমরা কি মানুষ নই?'

ইহুদি সন্ত্রাসীরা সত্যিই গাজার অধিবাসীদের মানুষ মনে করে না। সুস্থ মানুষ তো দূরের কথা, পঙ্গু, অসুস্থ, বৃদ্ধ– একচিলতে গাজায় অবরুদ্ধ সবাই। ইতিহাস বলছে, এখন যেখানে ইসরাঈলিদের বসতি সেখানেই ছিল গাজার মানুষদের পৈতৃক-ভিটে। ইহুদি আবাসভূমি নির্মাণের জন্য তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল ভিটে-মাটি থেকে। এখন গাজাতেও তাদের থাকতে দিচ্ছে না ইসরাঈল। এ মানুষগুলো যাবে কোথায়?

ইসরাঈলি সেনাদের বোমা হামলায় গাজার একটি বাড়ি বিধ্বস্ত হলে দুই নারী নিহত হন। এদের একজন অন্তঃসত্ত্বা। মহিলা নিহত হলেও তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে বাঁচানো গেছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল সূত্র। যুদ্ধ, বোমা ও সন্ত্রাসের মাঝে চোখ মেলে এই শিশু কাকে ডাকবে মা? রাফাহ-তে অন্য একটি বিমান হামলায় *ইসলামি জিহাদের* এক মিডিয়া কর্মী সালাহ হাসনাইন ও তাঁর ১২ এবং ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলে নিহত হয়েছেন। *ইসলামি জিহাদ* মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করে বলেছে, হাসনাইন যুদ্ধের মিডিয়া কর্মী। খান ইউনিসে আগের গোলাবর্ষণে মারা গেছেন আরো দু'জন। ফিলিস্তিনের এক জরুরি স্বাস্থ্যকর্মীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু একদিনের ইসরাঈলি হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত একশজন। জাতিসংঘ পরিচালিত একটি 'আশ্রয়কেন্দ্রে' ইসরাঈলি বোমায় কমপক্ষে পনের ফিলিস্তিনি খুন হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে 'তীব্র নিন্দা'র মুখে

ইসরাঈলিরা আরো তিনশ 'হেলফায়ার' ছুড়ে মেরেছে গাজার ওপর। জাতিসংঘের এক কর্তা বলেছেন, 'গাজায় ইসরাঈলি হামলা শুরু হওয়ার পর এপর্যন্ত দেড় লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে।' ইসরাঈলি হামলায় শহীদদের ৭৭ শতাংশই নারী ও শিশু। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের হামলায় নিহত ৬৭জনের মধ্যে ৬৪জনই আগ্রাসী সৈনিক।

১৮ দিনের টানা আগ্রাসনে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসে গেছে গাজার পানি ও পয়োনিষ্কাশন-ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির প্রধান *জ্যাক ডি ম্যাইয়ো* জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যে উপত্যকা জুড়ে দেখা দেবে তীব্র পানি সংকট। ইসরাঈল আস্ফালন করছে, সমগ্র গাজাকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। গাজা নিশ্চিহ্ন হলে কি মিটবে তার রক্ত পিপাসা? ক্রুসেডার আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী *জন কেরি* ও তার নিয়োগদাতা *ওবামার* অভিযোগ, 'ইসরাঈলের দিকে 'রকেট' ছুড়েছে হামাস। তাই নিজেদের 'নিরাপত্তার' স্বার্থে হামলার 'অধিকার' রয়েছে ইসরাঈলের।'

'চিরতরেই মেরে ফেলুক'

২০০৮ সালে ইসরাঈলি হামলায় উম্মে সামের মারুফের বাড়িটি ভেঙে গিয়েছিল। প্রাণভয়ে সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন তিনি। এরপর কোনোমতে ওই বাড়ির কিছুটা অংশ নির্মাণ করেছিলেন, এবারের হামলায় ধ্বসে পড়েছে সেটুকুও। সাত সন্তান নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন উম্মে সামের। কিন্তু কোথায় যাবেন? কোথায় মিলবে নির্বিচার গণহত্যা থেকে আশ্রয়? উম্মে সামের বলছেন, 'তারা আমাদের মেরে ফেলুক অথবা আমাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুক।' গাজায় এমন অনেক পরিবার আছে ইতোমধ্যে যাদের সব সদস্য নিহত হয়েছেন। উম্মে সামেরের মেয়ের জামাই হামলায় একটি পা হারিয়েছেন।
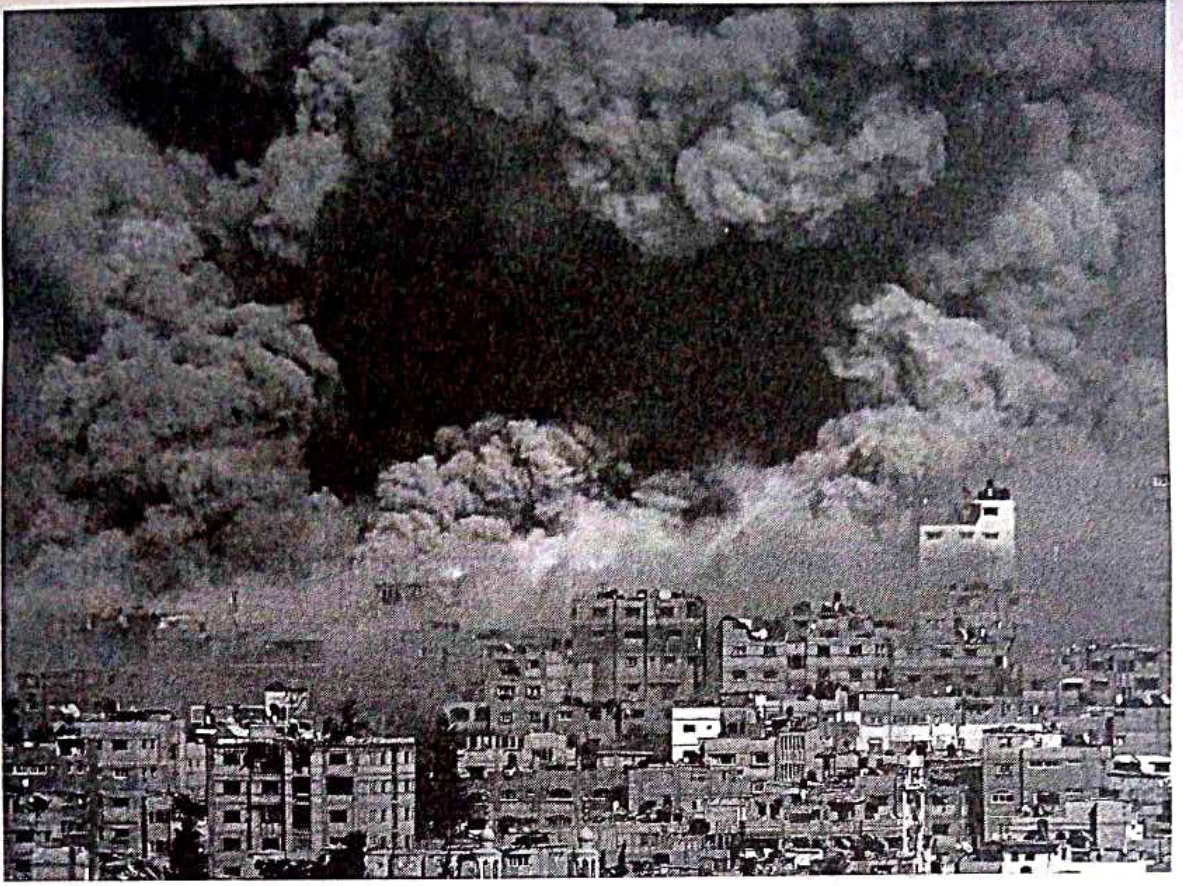
ইহুদি সন্ত্রাসীদের নিক্ষিপ্ত 'শূন্যবোমা'। শক্তিশালী ভবনকেও ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে মুহূর্তে।
২০১৪ সালে গাজায় ইসরাঈলি আগ্রাসনের চিত্র।

গাজায় এক কড়ি মূল্যও নেই মানব জীবনের। নেই মাথা গোঁজার ঠাঁই, খাবার বা পানি। ইফতারি কিংবা সেহরি- ঠিক নেই কোনোটিরই। জীবনেরই নিশ্চয়তা নেই যেখানে, সেখানে খাবার-পানির মূল্যইবা কী? দোকান-পাট বন্ধ, রাস্তায় গাড়ি নেই। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে অবিরত ভীতি ছড়ানো ইসরাঈলি বোমারু বিমান। কানে তালা লাগানো শব্দের সঙ্গে আগুনের আতশবাজি গাজার অন্ধকার আকাশে থেকে থেকে ছড়িয়ে দেয় আলোর ফুলকি। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে গাজাবাসীর জন্য হাজির হয় মেইড ইন আমেরিকার 'হেলফায়ার'। আর বেঁচে থাকাদের আছে ক্ষুধা, ভয়, বিভীষিকা! গাজার এই দুঃখ শেষ হবে?

গাজার অধিবাসীদের দুঃখগাঁথা

কারাগারে মানুষ নিতান্ত তিনবেলা খাবার পায়। পানি পায়। মাথার ওপরে থাকে ছাদ। সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে হয় না কারাবন্দীদের। কারাগারে মানুষদের দু'দিন পর পর চোখের জলে প্রিয়সন্তানকে কাফনের কাপড় পরিয়ে রেখে আসতে হয় না অন্ধকার কবরে। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সন্তানের মৃতদেহের কিছু অংশ হাসপাতালে রেখে এসে 'হারিয়ে ফেলা হাতটি' খুঁজতেও নামতে হয় না রাস্তায়।...

জুলাই, ২০০৭। গাজা উপত্যকা সবে নিজেদের আয়ত্তে এনেছে হামাস। ধীরে ধীরে আসতে শুরু করলো একের পর এক অমানবিক সিদ্ধান্তের খবর। আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন ঘোষণা দিল গাজায় যাবতীয় অর্থ সাহায্য বন্ধের। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হলো উগ্রপন্থী 'সন্ত্রাসী দল' হিসেবে হামাসকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করবার কাজও। দু'একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ছাড়া গাজায় অর্থ পাঠানোর অধিকার রইলো না কারো।

মধ্য জুলাইয়ে গাজার ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হলো গাজা উপত্যকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাকি বিশ্ব থেকে অবরোধের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে। গাজার সঙ্গে ইসরাঈলের তিনটি বর্ডার ক্রসিং- ইরেজ, কার্নি এবং কেরেম শালোম ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়া হলো। মিসরের সঙ্গে গাজার একমাত্র *রাফাহ ক্রসিং*টি হোসনি মোবারকের সময় থেকে অঘোষিতভাবে বন্ধ থাকলেও জুলাইয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো আনুষ্ঠানিকভাবে। গাজা পরিণত হলো প্রতি বর্গমাইলে তের হাজার মানুষের

উন্মুক্ত জেলখানায়! আগে থেকেই বিছিন্নভাবে বর্ডার সংলগ্ন এলাকায় নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতো ইসরাঈল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হত্যার অসংখ্য কারণ দেখাতো তারা। মাঝে মধ্যে হামাসের রকেট হামলায় দু'একজন ইসরাঈলি আহত কিংবা নিহত হলেই বৃষ্টির মতো মর্টার, আর্টিলারি ও মিসাইল হামলা চলতো গাজায়!

অবরোধ কার্যকর করার পর থেকে এপর্যন্ত মোট তিনবার গাজায় পূর্ণমাত্রার সামরিক হামলা চালিয়েছে ইসরাঈল-

১. অপারেশন কাস্ট লিড (*Operation Cast Lead*); ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৮-১৮ জানুয়ারি, ২০০৯ : এই আগ্রাসনে গাজার ১,৪১৭জন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৫,৩০৩জন। ৫০,৮০০ মানুষ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন ও বিধ্বস্ত হয়েছে ৪,০০০ বাড়ি। আনুমানিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের ক্ষতি সাধিত হয়েছে গাজায়। পক্ষান্তরে হামাসের হামলায় ইসরাঈলের নিহত হয়েছে ১৩ সৈন্য ও ৩ সাধারণ নাগরিক। যুদ্ধ বন্ধ হয় চুক্তির মাধ্যমে।

নিরস্ত্র মানুষদের খুন করতে গাজায় ঢুকছে ইসরাঈলি ট্যাঙ্কবহর।

২. অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স (*Operation Pillar of Defense*); ১৪-২১ নভেম্বর ২০১২ : এই আগ্রাসনে গাজায় ১৫৫জন নিহত

হন। গুরুতর আহত হন ৯৭১জন। ২৩,২০০ মানুষ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন এবং ২,০৫০টি বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে হামাসের হামলায় ইসরাঈলের নিহত হয় ৪ সৈন্য। যুদ্ধ বন্ধ হয় '*CEASE FIRE*' চুক্তির মাধ্যমে।

৩. অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ (*Operation Protective Edge*); ৮ জুলাই-২৬ আগস্ট ২০১৪ : গাজায় স্মরণকালের ভয়াবহ এই আগ্রাসনে ১,৯৯৪জন মানুষ নিহত হন। এর মধ্যে রয়েছেন ৪৩২ শিশু ও ২৪৩ নারী। গুরুতর আহত ৯,৮০০জনের মধ্যে ৩,০৭৬ শিশু ও ১,৯০৩জন নারী। পক্ষান্তরে হামাসের হামলায় নিহত হয়েছে ৬৪ ইসরাঈলি সৈন্য ও ৩ সাধারণ নাগরিক।

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)-এর ৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়- ৫,২০,০০০ মানুষ (গাজার মোট জনসংখ্যার ৩২ ভাগ) সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে ২,৭৪,০০০ মানুষ *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)* পরিচালিত ৯০টি শরণার্থী স্কুলে আশ্রয় নেন। শরণার্থী এই স্কুলগুলোতেও বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়ে ৪৮জনকে হত্যা করেছে জায়নিস্টরা, যাদের অধিকাংশই শিশু।

২৫ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৬ মাইল প্রস্থের একটি শহরে ৭ বছরে ৩বার এই মাপের ক্ষতি হলে সেখানে কেমন হতে পারে মানুষের জীবনযাত্রার মান? বিগত দশটি বছর (২০১৭ সাল পর্যন্ত) অবরুদ্ধ গাজা। ইসরাঈলি আর্মির অনুমোদন নিয়ে কেবল গুটিকয়েক আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে গাযায় ঢুকতে পারে। নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রবেশ নিষেধ এই শহরে!

উত্তর গাজার বাইত লাহিয়া এলাকার হামেদ আনসারীর ছোট্ট অভিব্যক্তি থেকেই বোঝা যায় তাদের মানবেতর জীবনের গল্প- 'আমার একটি ছোট্ট রুটি বানানোর কারখানা ছিল। ঋণ করে ব্যবসাটি দাঁড় করিয়েছিলাম কোনোভাবে। অবরোধ আরোপের পর থেকে আমার এই ছোট্ট রুটির কারখানা ৭ বছরে ৫বার

ধ্বংস হয়েছে ইসরাঈলি হামলায়। আমি অনেক কষ্টে গড়ে তুলি, শুধু ইসরাঈলিদের বোমা মেরে ভেঙে দেওয়ার জন্য? আমার বড় ভাই ৩বারের যুদ্ধে (২০০৮, ২০১২ ও ২০১৪) হারিয়েছেন তাঁর ৪ সন্তান। আমরা সন্তানদের জন্ম দেই ইসরাঈলিদের বোমার শিকার হওয়ার জন্য? আমাদের আল্লাহ আছেন। আমাদের আছেন মুজাহিদ ভাইয়েরা। কারো প্রয়োজন নেই আমাদের। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল! আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট!'

গাজার 'লাইফ লাইন'

বহির্বিশ্বের সঙ্গে গাজার একমাত্র সংযোগপথ *রাফাহ ক্রসিং* পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে মিসর। অন্য দুই দিকে আছে ইসরাঈল। চতুর্থ দিকে ভূমধ্যসাগর! গাজায় যাতে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য এমনকি খাদ্য পর্যন্ত ঢুকতে না পারে সেজন্য উচ্চপ্রযুক্তির কড়াকড়ি আরোপ করেছে জায়নিস্ট সন্ত্রাসীরা। বাধ্য হয়ে গাজাবাসী ইসরাঈল ও মিসরের রাফাহ বর্ডার ক্রসিং-এর নিচ দিয়ে টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। রাফার সঙ্গে গাজার আছে এরকম কয়েকশ' টানেল। এসব টানেল দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মিসর থেকে নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য, ওষুধ, কাপড়-চোপড়, জ্বালানি তেল, কম্পিউটার, গবাদিপশু থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় উপকরণ আসে গাজা পর্যন্ত। প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ টানেল ধ্বসে মারা যায় বহু মানুষ। তারপরও থেমে থাকে না জীবন। গাজাবাসীর কাছে এসব টানেল তার 'লাইফ লাইন'।

অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ (*Operation Protective Edge*) চালানো হয়েছিল উভয় প্রান্তের এসব টানেল ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। ইসরাঈলের দাবি- এসব টানেলে অস্ত্রের বিশাল মজুদ করেছে হামাস।

Operation Pillar of Defense (১৪-২১ নভেম্বর ২০১২) এবং *Operation Protective Edge* (৮ জুলাই, ২০১৪) চালানোর আগে *ওচা* (OCHA)-এর ২০১২ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে-

১. গাজা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ১৩ হাজার মানুষ বাস করছে।

২. গাজায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৪ ভাগ বেকার। যুবক শ্রেণির মধ্যে এটি ৫৬ শতাংশ।

৩. ৪৪ শতাংশ মানুষের খাদ্য অনিশ্চিত থাকে প্রতিদিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা জানে না- আজকে কোনো খাদ্য কপালে জুটবে কি না?

৪. ৭৯ শতাংশ মানুষ নির্ভরশীল ত্রাণের ওপর।

৫. ইসরঈল-গাজা বর্ডারের ৫০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় প্রবেশের অধিকার নেই গাজাবাসীর। ৩৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি বড়ো অংশ গাজাবাসীর প্রবেশের আওতার বাইরে।

৬. গাজার মোট কৃষিজমির ৩৬ ভাগ ইসরঈলি স্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট কারণে গাজাবাসীর আওতার বাইরে।

৭. গাজার একদিকে ভূমধ্যসাগর হওয়ায় সেখানে মৎসজীবী মানুষের হার বেশি। ইসরঈলি দখলদার নেভী উপকূল থেকে সর্বোচ্চ ৩ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জেলেদের মাছ শিকার করতে দেয়। এই ৩ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মোট এলাকার ৮৪ শতাংশে গাজাবাসী মাছ ধরতে পারে না।

৮. গাজায় প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা লোডশেডিং থাকে। (বর্তমানে মূল বিদ্যুত কেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল ছাড়া পুরো গাজা এখন অন্ধকারে)।

৯. অবরোধের কারণে গাজার পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সাপ্লাই পানির ৯০ ভাগ দূষিত। (২০১৪-তে এটি ৯৮ ভাগ)।

১০. গাজার ৮৫ শতাংশ স্কুল চলে ডাবল শিফটে।

১১. অবরোধ শুরুর পর থেকে টানেলে কাজ করতে গিয়ে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ১৭২ সাধারণ নাগরিক। আহত হয়েছেন ৩১৮জন।

১২. ইসরাঈলের সঙ্গে বিভিন্ন ক্রসিং দিয়ে ২০০৫ সালে যেখানে দৈনিক ২৬,০০০ মানুষ গাজা থেকে ইসরাঈলে দিনভিত্তিক কাজে যেত, ২০১২ সালে এই সংখ্যা দিনে সর্বোচ্চ ২০০জন। এই ২০০জনের অধিকাংশকেও নিম্নমজুরিতে কাজ করতে হয় ইসরাঈলি সেনাক্যাম্পে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আরো ২টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে ছোট্ট এই জায়গায়। গাজাবাসী তথা হামাস তাই 'অস্ত্রবিরতি'র চেয়ে 'অবরোধ' তুলে নেওয়ার বিষয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। কারণ গাজাবাসী জানে, 'সাময়িক কিংবা দীর্ঘমেয়াদী অস্ত্রবিরতি' আরো ১-২ বছর সময় দেবে তাদেরকে, যাতে এই সময়ে আবার শূন্য থেকে শুরু করে কিছু একটা গড়ে তুলবে তারা। তারপর কোনো এক সকালে ইসরাঈল তুচ্ছ কারণে হামলা করে ২ বছরের সব সঞ্চয়-কষ্ট-স্বপ্ন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এক নিমিষে!

দখলদারিত্বের সমান্তরালে চলছে অর্থনৈতিক শোষণ

অবরুদ্ধ গাজা ও পশ্চিম তীরের অর্থনীতি নিয়ে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে। এতে দেখানো হয়েছে, ইসরাঈলি দখলদারিত্ব বজায় না থাকলে ফিলিস্তিনের অর্থনীতি অন্তত দ্বিগুণ হতো, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য কমতো উল্লেখযোগ্য হারে। একাধিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে *আঙ্কটাড* বলছে, ফিলিস্তিনিদের জমিজমা, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত, মানুষ ও পণ্যের চলাচল সীমিত এবং সম্পত্তি ও উৎপাদনশীলতা ধ্বংস করে দেওয়ার পাশাপাশি ইসরাঈলি বসতি সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ বাজার বিভক্ত করে দেওয়া, আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ও ইসরাঈলি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে ইসরাঈলের দখলদারিত্ব ফিলিস্তিনি জনগণকে মানবাধিকার ও উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফাঁপা করে দিচ্ছে ফিলিস্তিনের অর্থনীতিকে। *আঙ্কটাডের*

হিসেব বলছে, ১৯৭৫ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ৪০ বছরে ফিলিস্তিনের জিডিপিতে বাণিজ্যযোগ্য কৃষি ও শিল্পপণ্যের হিস্যা নেমেছে অর্ধেকে। ৩৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ১৮ শতাংশে। আর কর্মসংস্থানে এর অবদান ৪৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ২৩ শতাংশে।

ইসরাঈলি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগ মোট যে পরিমাণ আমদানি পণ্য শুল্কায়ন ও ছাড় করে, তার মাত্র ৬ শতাংশ ফিলিস্তিনের আমদানি। অথচ এই আমদানির বিপরীতে চড়া হারে মাশুল আদায় করে ইসরাঈল, যা দিয়ে জায়নিস্টদের শুল্ক বিভাগের বাজেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নির্বাহ করা হয়। *আঙ্কটাড* বলছে, যদি ফিলিস্তিনের আমদানির আনুপাতিক হারে মাশুল আদায় করা হতো, তাহলে ফিলিস্তিন জাতীয় কর্তৃপক্ষ বছরে অন্তত পাঁচ কোটি ডলার বাড়তি ব্যয় থেকে রেহাই পেত আর তাদের রাজস্ব ঘাটতি কমত অন্তত সাড়ে ৩ শতাংশ।

ইসরাঈলি দখলদারিত্বে থাকা পশ্চিম তীরের ৬০ শতাংশ ও আবাদযোগ্য ৬৬ শতাংশ ভূমিতে[৮৬] ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে ২০১৫ সালে ফিলিস্তিনি জিডিপির (৪৪০ কোটি ডলার) অন্তত ৩৫ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। গাজায় উৎপাদকেরা চাষযোগ্য অর্ধেক জমিতে ও ৮৫ শতাংশ মৎস্য সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে তিনটি ইসরাঈলি সামরিক অভিযানে যে ক্ষতি হয়েছে, তা গাজার জিডিপির কমপক্ষে তিনগুণ।

ফিলিস্তিনিদের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস জলপাই। ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৮ লাখ জলপাই গাছসহ ২৫ লাখের বেশি ফলদ গাছ বিনষ্ট করা হয়েছে। শুধু ২০১৫ সালেই কেটে ফেলা ও উৎপাটন করা হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ ফলদ গাছ। ফিলিস্তিনিদের পানির উৎস পুরোপুরি ইসরাঈলি নিয়ন্ত্রণে। তারা নিজেরা কুয়া খনন করতে পারে না। ইসরাঈলি কোম্পানির কাছ থেকে চাহিদার অন্তত ৫০ শতাংশ পানি চড়া দামে কিনতে হয়। শক্তিশালী

---

৮৬ এটি এরিয়া-সি হিসেবে পরিচিত।

মোটর ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের অন্তত ৮২ শতাংশ ভূগর্ভস্থ পানি অসলো চুক্তিতে নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি মাত্রায় টেনে নিচ্ছে ইসরাঈল।

আঙ্কটাড প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বেকারত্ব ২৫ শতাংশ আর সেখানকার ৬৬ শতাংশ মানুষ ভুগছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায়। গাজার চিত্র আরো করুণ, যেখানে বেকারত্ব ৩৮ শতাংশ আর ৭৩ শতাংশ অধিবাসীর প্রয়োজন মানবিক সাহায্য।[৮৭]

ফ্রিডম ফ্লোটিলা; নিকৃষ্ট সন্ত্রাসের প্রত্যক্ষ উদাহরণ

৩১ মে ২০১০। গাজা অবরোধের তৃতীয় বছর। গাজার অসহনীয় অবরোধ সহ্য করতে না পেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু বিবেকবান মানুষ একত্রিত হন আর্তমানবতার ডাকে সাড়া দিতে। ১০ হাজার টন সাহায্য-সামগ্রীসহ ৩১ মে ২০১০ সালে *ফ্রিডম ফ্লোটিলা* নামের ৬টি জাহাজের একটি বহর নিয়ে সাইপ্রাসের একটি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেন তারা। লক্ষ্য অবরুদ্ধ গাজা। বহরের যাত্রীদের সবাই বিভিন্ন দেশের শান্তিবাদী ত্রাণকর্মী। ইউরোপিয় পার্লামেন্ট সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, গ্রিস, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সার্বিয়া, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আলজেরিয়া, তুরস্ক, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও ফিলিস্তিনের সাধারণ নাগরিক।

ভোরের আলো-আঁধারিতে জাহাজগুলো আন্তর্জাতিক পানিসীমায় ইসরাঈলের উপকূল থেকে তখনো ৪০ মাইল দূরে। আকস্মাৎ ইসরাঈলি কমান্ডো বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে জাহাজে নেমে শুরু করে নির্বিচার গুলি। খুন হন ২০জন। আহত ৬৬। নিহতদের অর্ধেক তুরস্কের নাগরিক। ইসরাঈলি সেনারা হতাহত ত্রাণকর্মী ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলো আটক করে নিয়ে যায় তাদের বন্দরে। 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়' এক মাস নিয়মিত 'তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে'।

---

৮৭ প্রতিচিন্তা; আসজাদুল কিবরিয়া।

এরপর 'অপরাধীদের যথাযথ আইনের আওতায় নিয়ে আসার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত' করে বরাবরের মতো দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে!

Save The Children-এর ২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী গাজায় সবচেয়ে নিগৃহীত ও মানবেতর জীবনযাপন করছে শিশুরা। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে পানিবাহিত রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত অপুষ্টিতে ভোগার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিশুদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা। ৮৭ শতাংশ শিশু মানসিকভাবে অসুস্থ। রাতের অন্ধকার নেমে এলেই ভয়ে তারা চিৎকার করে কান্না শুরু করে।

গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল অফিস ও হাসপাতালগুলো অবস্থিত পূর্ব জেরুসালেমে। সংকটাপন্ন রোগীদের এই হাসপাতালগুলোতে নিয়ে যেতে ইসরঈলের অনুমতি লাগে। ২০১১ সালের হিসেবে প্রতি কুড়ি শিশুর মধ্যে ১জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ট্রান্সফার করা হয় জেরুসালেমের হাসপাতালে। কিন্তু অধিকাংশ সময় মেলে না অনুমতি!

বিপজ্জনক টানেলগুলো গাজার 'লাইফ লাইন'। ছবি : এএফপি

World Health Organization (WHO) সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালে ইসরঈল উন্নত চিকিৎসার জন্য পূর্ব জেরুসালেম কিংবা অন্য শহরে পাঠানোর

আবেদন নাকচ করে দিয়েছে ১২,০০০ গাজাবাসীর। একই সময়ে এদের মধ্যে ৬১৮জনকে ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নিয়ে অত্যাচারও করেছে!

Euro-Mediterranean Human Rights Network-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন গাজাবাসীর জন্য টন টন জরুরি ঔষধ ও খাদ্য সাহায্য নিয়ে গিয়ে ইসরাঈলি বাধার মুখে ফিরে এসেছে। এক যৌথবিবৃতে মানবাধিকার সংস্থাগুলো পরিষ্কার করে বলেছে, 'ইসরাঈল গাজা অবরোধ করে গাজাবাসীকে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়'। অবাক হওয়ার মতো তথ্য হচ্ছে, গাজার অধিবাসীদের জন্য ইসরাঈলি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আলাদা ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ রয়েছে, যাদের কাজ হলো- গাজায় প্রতিদিন মাথা পিছু কত গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করলে গাজাবাসী মরবে না, কিন্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে- এই তথ্য গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করা!

জায়নিস্টদের কারাগারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। এমন অনেকেই আছেন শিশুকালে যাদের ধরে নিয়ে গেছে ইসরাঈল। কারাগারেই সম্পূর্ণ জীবন পার করে দিয়েছেন তাঁরা।

গাজাবাসীর বক্তব্য-

'গাজাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও উন্মুক্ত কারাগার বলেন অনেকে। আমরা (গাজাবাসী) বলি, তার থেকেও খারাপ। কারাগারে মানুষ নিতান্ত তিনবেলা খাবার পায়। পানি পায়। মাথার ওপরে থাকে ছাদ। সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে হয় না কারাবন্দীদের। কারাগারে মানুষদের দু'দিন পর পর চোখের জলে প্রিয়সন্তানকে কাফনের কাপড় পরিয়ে রেখে আসতে হয় না অন্ধকার কবরে। ছিন্ন-বিছিন্ন সন্তানের মৃতদেহের কিছু অংশ হাসপাতালে রেখে এসে 'হারিয়ে ফেলা হাতটি' খুঁজতেও নামতে হয় না রাস্তায়। আমাদের আগে তিন পুরুষ অমানবিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে পশুর মতো জীবন কাটিয়েছে। আমরাও একইভাবে পশুর জীবনযাপন করছি।

হয়তো একই পরিণতি হবে আমাদের সন্তানেরও। কিন্তু তাদের সন্তানের জন্য একটি মুক্ত ফিলিস্তিন আমরা রেখে যাবো ইনশা আল্লাহ!' (-জাভেদ কায়সার রাহিমাহুল্লাহ)

দখলদারির দেয়াল

'অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল' –জগতখ্যাত এই গানের রচয়িতা রজার ওয়াটার্স ২০০৫ সালে তেলআবিবে কনসার্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য ও বৈধ অধিকারের প্রতি সংহতি জানান। ইসরঈলি আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বয়কটের প্রস্তাবনা রেখেছেন এই গায়কি। এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে ওয়াটার্সের ফিলিস্তিন ভাবনা।

১৯৮০ সালে একটি গান লিখি, 'অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল পার্ট-দুই'। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই গানটি নিষিদ্ধ করে। সে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা সমঅধিকারের কথা তুলতে গানটি ব্যবহার করতো বলে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তখনকার বর্ণবাদী সরকার বেশকিছু গানের ওপর একধরনের সাংস্কৃতিক অবরোধ আরোপ করে। ২৫ বছর পর ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে এক উৎসবে যোগ দেওয়া ফিলিস্তিনি শিশুরা পশ্চিমতীরকে ঘিরে ইসরঈলের দেয়াল তোলার প্রতিবাদ জানাতে সেই গানটিই ব্যবহার করে। তারা গায়, 'উই ডোন্ট নিড নো অকুপেশন! উই ডোন্ট নিড নো রেসিস্ট ওয়াল!' আমি তখনো স্বচক্ষে দেখিনি, গানে তারা কিসের কথা বলতে চাইছে? পরের বছর তেলআবিবে গান পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়। চুক্তিটি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান কিছু ফিলিস্তিনি। তারা ইসরঈলকে শিক্ষায়তনিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের আন্দোলনে সক্রিয়। দেয়ালের বিরুদ্ধে আমি আগেই জোরালো অবস্থান নিয়েছিলাম। কিন্তু সাংস্কৃতিক বয়কটের পথ

ঠিক কিনা, তা নিয়ে তখনো আমি দ্বিধাগ্রস্ত। বয়কটের পক্ষের ফিলিস্তিনিরা আমার কাছে আহ্বান জানালেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বচক্ষে 'দেয়াল' দেখতে আমি যেন পশ্চিমতীর যাই। রাজি হলাম।
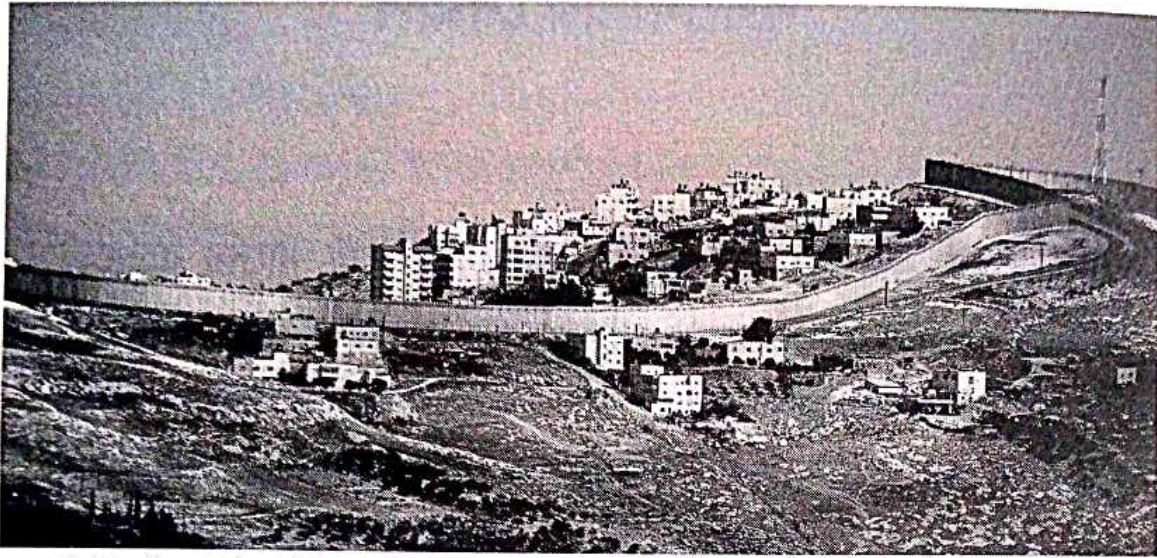
দেয়াল তুলে ফিলিস্তিনকে অবরুদ্ধ করেছে সন্ত্রাসবাদী ইসরাঈল। ছবি : মিডিয়া কমন্স

জাতিসংঘের নিরাপত্তাধীনে জেরুসালেম ও বেথলেহেম সফর করলাম। সেদিন যা দেখলাম, তার জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না। দেয়ালটি দেখতে মর্মান্তিক। ইসরাঈলি তরুণ সেনারা দেয়ালের পাহারায়। তারা আমাকে বাইর থেকে আসা নৈমিত্তিক কোনো দর্শক ভেবেছে। আমার প্রতি তাদের আচরণ ছিল ঘৃণাপূর্ণ ও আগ্রাসী। আমি বিদেশি, দর্শক। আমার প্রতি যদি এমন আচরণ হয়, তাহলে একবার ভাবুন, কেমন আচরণ করা হয় ফিলিস্তিনিদের প্রতি, নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি কিংবা পাসবুক বহনকারীদের প্রতি? তখন বুঝলাম, সেই দেয়াল থেকে, আমার দেখা সেই ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য থেকে আমাকে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে দেবে না আমার বিবেক। আমার দেখা সেই ফিলিস্তিনিদের জীবন নিত্য চূর্ণ হচ্ছে ইসরাঈলি দখলদারিত্বে। তাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে (কিছুটা অক্ষমতা থেকেও) সেদিন আমি দেয়ালে লিখলাম, 'উই ডোন্ট নিড নো থট কন্ট্রোল'। সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, তেলআবিবের মঞ্চে আমার উপস্থিতি ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে আমার দেখা নিপীড়নকেই বৈধতা দেবে। তাই তেলআবিব স্টেডিয়ামে গান

পরিবেশনের চুক্তি বাতিল করে সরিয়ে নিলাম 'নেবে শালমে'[৮৮]। এখানকার বাসিন্দারা কৃষিজীবী। মটরদানার চাষ ও বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে নিবেদিত। এখানে আরব, খৃস্টান ও ইহুদিরা পাশাপাশি সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করে।

সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে সংগীত আসরটি হয়ে উঠে ইসরঈলের ইতিহাসে সবচে বড়ো আয়োজন। যানজটের সঙ্গে লড়ে শেষ অবধি ৬০ হাজার ভক্ত জমায়েত হয়। আসর শেষে সমবেত তরুণদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, তারা প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং ইসরঈলে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের নাগরিক অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে সরকারের প্রতি যেন দাবি জানায়।

ইসরঈলি আরব ও ইহুদিদের সমান অধিকার দিয়ে প্রণীত আইন বাস্তবায়নে ইসরঈল সরকারের কোনো ইচ্ছাই নেই। দেয়ালই শুধু বাড়ছে। অবৈধভাবে পশ্চিমতীর দখলও অব্যাহত আছে। গাজার জনগণ কার্যত ইসরঈলের এই আগ্রাসী অবরোধের দেয়ালে বন্দী। তাদের কাছে দেয়ালের মানে, গুচ্ছ গুচ্ছ অন্যায়ের বোঝা। দেয়াল মানে ক্ষুধার্ত পেটে শিশুদের ঘুমোতে যাওয়া; ও চরম পুষ্টিহীন বহু শিশু। দেয়াল মানে বিধ্বস্ত অর্থনীতি; মা-বাবার কাজ না জোটা, পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে না পারা। দেয়াল মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পড়তে যাচ্ছে, তার আজীবনের তরে চলে যাওয়ার সুযোগ-সন্ধান। কেননা, তাদের আসা-যাওয়ার অনুমতি নেই।

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো যেহেতু একতরফা ও নির্লজ্জভাবে ইসরঈলি আগ্রাসনকে বৈধতা দিয়ে যাচ্ছে, তাই জনগণকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে; তাদের হাতে যে হাতিয়ারই থাকুক না কেন, তা নিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। এর অর্থ, ইসরঈলের বিরুদ্ধে বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংকশনস

---

৮৮ নেবে শালমে-শান্তির মরুদ্যান। ইসরঈলি আরব ও ইসরঈলি ইহুদিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টায় গড়ে তোলা সম্প্রীতির গ্রাম।

(বর্জন, বিনিয়োগ-প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা) প্রচারণায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে সংহতি জানিয়ে পাশে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় ঘোষণা। মৌলিক মানবাধিকার সবারই প্রাপ্য, এই ভাবনা থেকে আমার এই প্রত্যয়। আমার সহকর্মী ও অন্যান্য শিল্পের শিল্পীদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা এই সাংস্কৃতিক বয়কটে শরিক হোন। যতোদিন দখলদারির দেয়ালের পতন না ঘটবে, যতোদিন ফিলিস্তিনিরা শান্তিতে বাস করতে না পারবে, স্বাধীনতা ও তাদের প্রাপ্য ন্যায় ও মর্যাদা সহকারে, ততোদিন ইসরাঈলে কোনো অনুষ্ঠান করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমরাও ন্যায্য কাজই করবো। নতুন সেই দিন আসবে, নিশ্চয়ই।

সব হারানোর বেদনা

... হাজার হাজার মানুষের জীবন গেছে। মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য গ্রাম। ফিলিস্তিনিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতির মধ্যে ধুঁকছে। তারা লড়াই করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্দশা-অনিশ্চয়তার মধ্যে।

পনের মে ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যবিপর্যয়ের দিন। এ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে নাম দেওয়া হয়েছে- 'নাকবা' দিবস। ১৯৪৭-৪৮ সালের এই দিনে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের সর্বস্ব হারিয়েছিল। সবকিছুই। ভিটে-মাটি, স্বাধীনতা, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার। এই কালো দিনে ফিলিস্তিনকে ধ্বসে দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের হৃদয়চিরে সূচনা হয় *ইসরঈল* নামের দুষ্ট ক্ষতের। আজো, এতোগুলো বছর পরও আমরা *নাকবা* স্মরণ করছি। আমরা যা হারিয়েছি, তার জন্য শোক করাই যথেষ্ট নয়; সেই ক্ষতির মাত্রা ও ধরন বোঝাও আবশ্যক মনে করি। এমনকি অজস্র মানুষের কাছে এখনো তার কী অর্থ, তা উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করি।

উপনিবেশিক বৃটিশের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত শত শত ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরের ধ্বংসস্তুপের উপর *ইসরঈল রাষ্ট্র* প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না- এ সত্যটি অস্বীকার করা যাবে না। সেসময় একটি আন্তর্জাতিক 'অনুমোদন' বলে ইসরঈলের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ভারও বৃটেনের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ওই ওয়াদা পূরণ করার জন্য দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে ভুলে যাওয়ার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশিক শাসনের কবলে সেসময়ের মধ্যপ্রাচ্য ছিল নিষ্পেষিত। এই দুটি উপনিবেশিক শক্তি এ অঞ্চলে তাদের

স্বার্থমত ভাগ-বাটোয়ারা সম্পন্ন করে। ১৯১৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত *সাইক্স-পিকট* নামে 'ভদ্রলোকদের' গোপন চুক্তিই এর বড়ো উদাহরণ। এই ষড়যন্ত্র-চুক্তির ফলে বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া অন্য দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের পরে বৃটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শীর্ষ বৃটিশ জায়নিস্ট *স্যার এডওয়ার্ড রুথসচাইল্ডের* কাছে একটি গোপনপত্র প্রেরণ করে। ওই পত্রে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি 'জাতীয় আবাসভূমি' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ফিলিস্তিন নিয়ে বৃটিশের ভাবনার বিষয়টি ওই পত্র থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে! এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদভাষ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফিলিস্তিনিদের তখন অভিহিত করা হতে থাকে, ফিলিস্তিনের 'অ-ইহুদি' অধিবাসী হিসেবে। পরের তিন দশক বৃটিশেরা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে সুরক্ষা দিয়েছে কোনোপ্রকার রাখঢাক ছাড়াই। এখনকার আমেরিকার ভূমিকায় ছিল ওই সময়ের বৃটিশ। গোড়া থেকে বৃটিশেরা ফিলিস্তিনে গণহারে ইহুদি অভিবাসনের নীতি সমর্থন করে আসছিল।

নাকবার বিপর্যয়ের পরের চিত্র। জায়নবাদী দখলদার কর্তৃক বাস্তুচ্যুত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে শরণার্থী শিবিরে। ছবি : মিডিয়া কমন্স

৪৭-এর শেষের দিকে ফিলিস্তিন অঞ্চলে প্রধান মোড়ল হয়ে আবির্ভূত হয় জাতিসংঘ। স্থানীয় আরবেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার

তিন ভাগের দুই ভাগ। বাকিরা ছিল বহিরাগত ইহুদি। অভিবাসী। একেবারে প্রথমে ফিলিস্তিনিরা ছিল জনসংখ্যার নব্বই ভাগ। পরে বৃটেনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'জাতিগত নিধন' (*Ethnic Cleansing*) অভিযানে আনুপাতিক এই অসম হারটি সমানুপাতিক হতে থাকে। এছাড়া অশুভ প্রক্রিয়ায় ক্রয় ও জবরদখলের বহু ঘটনাও ঘটে। জলের মতো তরল সত্যটি হচ্ছে, জমির মালিকানার বড়ো অংশই ছিল ফিলিস্তিনিদের।

বৃটেনের ইহুদি-সমর্থক নীতির জন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'মিশ্রতা' এলেও ভূমি মালিকানা মিশ্র ছিল না। '*অ্যাথনিক ক্লিনজিং অব ফিলিস্তিন*' (ফিলিস্তিনের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ) বইয়ে ইলান পেপে (*Ilan Pappe*) লিখেছেন, '১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনের সব আবাদি ভূমি ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকারে। ইহুদি মালিকানায় ছিল মাত্র ৫ দশমিক ৮ শতাংশ ভূমি।' কিন্তু এ পরিসংখ্যানও কাউকে ফিলিস্তিনিদের রক্ষার তাগাদা দেয়নি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের বিপুল চাপের মুখে ১৮১ নম্বর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ওই প্রস্তাবে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র, একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং অধিকৃত জেরুসালেমকে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলা হয়। আমরা জানি, এই কাগুজে প্রস্তাবনাও বাস্তবায়ন করেনি ক্রুসেডাররা। একেবারে শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিরা সবধরনের বিভাজনের বিরোধিতা করে এসেছে।

১৯৩৭ সালের বৃটিশ প্রস্তাবে আরবরা ক্ষিপ্ত হয় আর ৪৭'-এর সিদ্ধান্তে হয় বিপর্যস্ত। এই প্রস্তাবে ইহুদি রাষ্ট্রকে সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল ভূমি দেওয়ার কথা বলা হয়। বিপরীতে সাড়ে চার হাজার বর্গমাইল বরাদ্দ হয় ফিলিস্তিনিদের জন্য। যদিও তারাই ছিল ফিলিস্তিনের ৯৪ দশমিক ২ শতাংশ ভূমির মালিক এবং জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ। অন্যদিকে বাস্তবে প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের মাত্র ৬০০ বর্গমাইল এলাকার অধিকার ছিল ইহুদিদের। এসব তথ্যের কোনোটিই জাতিসংঘের ৩৩ রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিন-বিভাগের পক্ষে ভোট দেওয়া থেকে নিবৃত করতে পারেনি।

জাতিসংঘের এ বঞ্চনামূলক বিভাজন সত্ত্বেও জায়নিস্ট নেতারা চেয়েছিলেন আরো বেশি কিছু। এবং উৎসব করবার মতো উপলক্ষও পেয়ে গেলো তারা। 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়' যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে জায়নিস্ট রূপরেখাকে বিরাট উদারতার সঙ্গে বাস্তবায়নে লেগে যায়। ফিলিস্তিনিদের দুঃখ-বঞ্চনার দিকে ফিরেও তাকায়নি কেউ।

ঘরহারা উদ্বাস্তুর দীর্ঘসারি। ১৯৪৭-৪৮ সালে জায়নবাদের আগ্রাসনের মুখে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি জনতা।

ফিলিস্তিনি ও আরবরা ভেবেছিল মার্কিন ক্রুসেডাররা যেহেতু বারবার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলছে, সেহেতু তাদের চাপে বৃটেনের কলঙ্কিত নীতি আরবদের পক্ষে ঘুরে যাবে। কিন্তু তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো চরম আঘাতে জেগে উঠবার মুহূর্ত। বিচার ও বিবেকের সব সম্ভাবনা শেষপর্যন্ত তিরোহিত হয়ে যায়। ফিলিস্তিনিরা যখন আসন্ন যুদ্ধের অনিবার্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, জায়নিস্ট নেতৃত্ব তখন ফিলিস্তিনজুড়ে দখলদারীর পরিকল্পনা হাতে নেয়। সে সময় জায়নিস্টদের প্রধান যুদ্ধ-সংগঠন ছিল হাগানাহ,

পরিচালিত হতো জুইয়িশ এজেন্সি থেকে। এই এজেন্সি শুরু থেকে সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এভাবে *হাগানাহ* হয়ে উঠে তার সামরিক বাহিনী। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কমিটি হিসেব করে দেখে, ইহুদিদের রয়েছে ৬২ হাজার সুপ্রশিক্ষিত যোদ্ধা। আরবদের একজনও না। তারা আরবদের এই অক্ষমতার ব্যাপারে সজাগ ছিল। জাতিসংঘের মাধ্যমে দেশভাগ পরিকল্পনা পাস হওয়ামাত্রই ফিলিস্তিনি নিধন ও বিতাড়ন শুরু হয় মহা-উৎসাহে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে স্বদেশ বিভাজনের প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনি গণবিক্ষোভকে 'দাঙ্গা' আখ্যায়িত করে জায়নিস্টরা শুরু করে সর্বাত্মক আক্রমণ। গণআক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কায় ৭৫ হাজার ফিলিস্তিনি হন বাস্তুচ্যুত।

আরবদের সহযোগিতার গতি এতো শম্বুক ও শ্লথ ছিল, ফিলিস্তিনিরা আরো মুষড়ে পড়ে। তারা হয়ে পড়ে বিশ্বের সবচে অরক্ষিত জনগোষ্ঠী। লাখ-লাখ ফিলিস্তিনি পরিণত হয় শরণার্থীতে। হৃদয়বিদারক এই ঘটনার পরিণতি দাঁড়ায় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ। মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয় শত শত গ্রাম। ফিলিস্তিনিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম মর্মান্তিক এই ঘটনার স্মৃতির মধ্যে ধুঁকছে। তাঁরা লড়াই করছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্দশা, অনিশ্চয়তার মাঝে। তাই 'নাকবা' শুধু স্মরণের বিষয় নয়। এটি এমন এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবী যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর কোনো পথ খোলা নেই। (-ফিলিস্তিন ক্রনিকল)

যে অপরাধ ক্ষমা করা যায় না

মুসলিমদের রক্তের চেয়ে আরবদের তেল বেশি মূল্যবান? -এমন প্রশ্ন ফিলিস্তিনিদের। বছরের পর বছর ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করার ইসরাঈলি বর্ণবাদী আগ্রাসনের মুখে আরবরাষ্ট্রগুলোর নিষ্ক্রীয়তা চোখ জ্বালা করে। চারটি আরবরাষ্ট্র- সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার মিলে দৈনিক দুই কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদন করে। আনুমানিক বাজারমূল্য হিসেবে প্রাত্যহিক উত্তোলিত তেলের মূল্য ২০০ কোটি ডলার (২০১০ সালের বাজারদর)। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাসে ছয় হাজার কোটি এবং বছরে ৭২ হাজার কোটি ডলারের তেল উত্তোলন করে এই চারটি রাষ্ট্র। কিন্তু এর কয় আনা ইসরাঈলের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের বাঁচাতে ব্যয় করে তারা? কতটুকু অংশ সাহায্য দেয় গাজার অবরুদ্ধ বাসিন্দাদের?

আরব শেখ, আমির ও বাদশাহরা তাদের তেল ও গ্যাসজাত আয় থেকে ফিলিস্তিন ও এর অধিবাসীদের জন্য খরচ করতে নারাজ। অথচ এদের একদিনের আয় দিয়ে ফিলিস্তিনের সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তারা খেতে পেতো, সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে পারতো। শিশুরা যেতে পারতো বিদ্যালয়ে এবং তরুণেরা কলেজে ভর্তি হতে না পেরে দেশ ছেড়েও যেতো না। খাদ্যের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ইসরাঈলি বর্ডার পেরোতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারাতে হতো না তাদের।

আরব সরকারগুলো ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ালে, ফিলিস্তিনি সরকারকে অসহায় হয়ে ইসরাঈলের হুকুমবরদারি করতে হয় না। ফাটল ধরে না ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে। এমন অনেক ফিলিস্তিনি তরুন-তরুণী আছেন, যারা কেবল বেতন পাচ্ছেন না বলে মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছেন। এভাবে উদ্বাস্তু হওয়ায় কমে যাচ্ছে এমনিতেই বিপন্ন জাতির আকার।

আরব ধনকুবেররা তাদের মুসলিম ভাইদের দিকে না তাকালেও অঢেল সম্পদ ব্যয় করার জায়গা খুঁজে পায় না। এসব খরচ হয় বিদেশে, ভোগ-বিলাসে। কী মূল্য এসব অর্থ-কড়ির? যদি সন্ত্রাসী ইসরাঈলের কবল থেকে প্রিয়ধর্মভূমি প্রথম কেবলা মসজিদে আকসাকে মুক্তই না করতে পারলে!

আরবদের স্বার্থপরতা ও সীমাহীন উদাসীনতা ইসরাঈলকে তার বর্ণবাদী নাৎসি নীলনকশা বাস্তবায়নে কামিয়াব করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশুভ সাম্রাজ্যের বলি হওয়াই কি ফিলিস্তিনি মুসলমানদের নিয়তি?

সত্তুর বছর ধরে জায়নবাদের বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছে ফিলিস্তিনি মুসলিম জীবন। ছবি : রয়টার্স

সৌদি সরকার পারে তহবিলের অভাবে দেউলিয়া ফিলিস্তিনি সরকারকে টিকিয়ে রাখতে। কুয়েত পারে গাজা ও পশ্চিম তীরে আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তুলতে। ঔষধ ও সুচিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে বসা মানুষগুলো হয়তো বাঁচতে পারে। হয়তো মরতে পারে খানিকটা স্বস্তিতে। আরব আমিরাত চাইলে গাজা ও পশ্চিম তীরের কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারে। কাতারের সঙ্গে ইসরাঈলের আছে খোলাখুলি ভালো সম্পর্ক। তারা চাইলে গাজা ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে মিসরের মাধ্যমে গাজা উপত্যকায় নিয়মিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ করার ব্যবস্থাও করতে পারে। তাহলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অভাবে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে তাদের জাতি ও ধর্মের ভাইবোনদের পড়তে হয় না। তারা মিসরকে মাত্র দেড়শ বিলিয়ন ডলার দিলে আট কোটি মিসরিয়কে আমেরিকার কাছে জিম্মি থাকতে হয় না।

কিন্তু কেন এসব ধনী আরব রাষ্ট্রের শাসকেরা এসব করতে পারে না? তারা কী মনে করে, তাদের বিত্ত থেকে মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশুর রক্ত ও জীবনের মূল্য কম? ইসলামি মর্যাদাবোধ থেকে টাকার মূল্যই কি তাদের কাছে বেশি? তাই যদি হয়, ধিক তাদের! এতে কি তাদের পাপ হয় না? তারা কি বিদেশি প্রভুদের কাছে সম্মান, স্বাধীনতা, ধর্ম বন্ধকি দিয়েছে? ফিলিস্তিনি জনগণ এসব ধনীকে ক্ষমা করে দিতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। গাজা উপত্যকার ক্ষুধার্ত মুসলিম শিশুরা মায়ের কোলে ছটফট করে মারা যাচ্ছে। মায়েরা সন্তানদের জন্য খাদ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে জীবন দিচ্ছে ইসরাঈলের নৃশংস গুলি ও ট্যাঙ্কের গোলায়। ধীরে ধীরে একটি জাতি সম্মিলিতভাবে ধাবিত হচ্ছে মৃত্যুর দিকে। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে কিছুতেই তাদের ক্ষমা করা যায় না। (-গালফ নিউজ)

খুন হয়েছেন আরাফাত?

...গল্পটি হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেতো। আব্বাস ও দাহলানের মতো নেতারা নিজেদেরকে 'শহীদ' আরাফাতের মশালবাহী দেখিয়ে মুখের কথায় স্বপ্ন দেখিয়ে যেতেন ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার 'বিপ্লব সাধনের'।

ইয়াসির আরাফাতের খুনি কে? ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর জানা গেল ফিলিস্তিনি নেতা ফরাসি হাসপাতালে মারা গেছেন। তার মৃত্যু নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো কীভাবে হাজির করা হবে, তা ঠিক করার কোনো উপায় তখন ছিল না। তিনি নিহত হয়েছেন, না তার মৃত্যু হয়েছে বার্ধক্যজনিত কারণে? যদি হত্যাই হয়ে থাকে, তাহলে তা করেছে কারা এবং কেন?

আরাফাতের অসুস্থতার 'রহস্যময়' ধরন থেকে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, তাকে দীর্ঘসময়জুড়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। অপকর্মটি প্রমাণ করতে অনেক সাক্ষ্যসাবুদও হাজির করা হয়। এমনকি তার কোনো কোনো ঘনিষ্ঠজনের প্রতিও তোলা হয় সন্দেহের আঙুল। সাম্প্রতিক কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ এ বিষয়ে নতুন বিতর্ক ও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

এ বিষয়ে উরি আভনেরি লিখেছেন, *আরাফাতের মৃত্যুদিবসের প্রশ্ন : তাকে কী খুন করা হয়েছিল?* কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। বিতর্ক হয়। সাক্ষ্যসাবুদ আসে। সম্প্রতি আল-জাজিরাসহ বেশকিছু গণমাধ্যমে একই অভিযোগের প্রচার হয়। এর আগে ডিক চেনির তৈরি গুপ্তহত্যা দলের কথা ফাঁস হয় http://www.slate.com/id/2222820/ ওয়েবসাইটে।

অভিযোগ উঠে সিআইএ বেনজির হত্যার সঙ্গেও জড়িত। জেনারেল জিয়াউল হক, প্যাট্রিস লুমুম্বাসহ অনেকের নামও তালিকায় চলে আসবে সন্দেহ নেই।

আরাফাত মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর। এর মধ্যে নৃশংস ইসরাঈলি কৌশলে খুন হয়েছেন আরো কয়েকজন ফিলিস্তিনি নেতা। এদের বেশিরভাগ হামাস নেতা। ফিলিস্তিনিরা ইসরাঈলের হাতে নিহত সবাইকে 'শহীদ' বলে স্মরণ করে। আরাফাতও তাদের চোখে একজন 'শহীদ'। তাদের খুব বেশি বিশ্বাস আরাফাতের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। আরাফাত যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকেন এবং যেহেতু তিনি ইসরাঈলি বিমান হামলা বা কোনো গুপ্তঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারাননি, তাহলে মূল যে প্রশ্নটির ফয়সালা করতে হবে তাহল, কে তার হত্যাকারী এবং কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

ইসরাঈলিদের পক্ষ থেকে আরাফাতের মৃত্যু কামনার বিষয়টি কখনোই গোপন থাকেনি। ২০০২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সাবেক ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন কয়েক দশক আগে সুযোগ পেয়েও আরাফাতকে খুন না করার জন্য সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুতাপ প্রকাশ করেন। ইসরাঈলি পত্রিকা *মারিভ*কে তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে লেবানন আগ্রাসনের সময়ই তার উচিত ছিল আরাফাতকে 'শেষ করে দেওয়া'। তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'তা না করার জন্য আপনি কি অনুতপ্ত?' তিনি বলেন, 'অবশ্যই অনুতপ্ত।'

আরাফাত যেদিন মারা যান, বিবিসি সেদিন ইসরাঈলের তখনকার বিরোধী নেতা শিমন পেরেজের একটি মন্তব্য প্রচার করে। পেরেজ বলেন, 'ভালো হলো, দুনিয়া তার কবল থেকে রক্ষা পেলো... মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে সূর্য এখন জ্বলজ্বল করছে।' মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আরাফাত বছরের পর বছর ধরে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত তার রামাল্লার সদরদপ্তরে গৃহবন্দী ছিলেন। জীবিত আরাফাত বিশ্বের কাছে ইসরাঈলের জন্য বিপর্যয়ের উৎস হয়েছিলেন। অতিনম্রতার জন্য ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ে সমর্থ না হলেও আন্তর্জাতিক মনোযোগের আলো আকর্ষণে তিনি সমর্থ ছিলেন। আরব, মুসলিম, ইউরোপ ও অন্যান্য জাতির সমর্থন আদায়েও ছিলেন সফল।

এখনো অনেকের চোখে তিনি পথের কাঁটা। তাদের বিশ্বাস, আরাফাত ইসরাঈলের জন্য 'বাধা হিসেবে' দাঁড়িয়ে থাকায় অবিচল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের একটি অংশ তার ওপর বিরক্ত ছিল, কারণ তিনি ঐক্যের স্বার্থে উপদলীয় সংঘাত বন্ধে ক্লান্তিহীনভাবে চেষ্টা করেছেন এবং বিভিন্ন পক্ষকে ছাড় দিয়ে চলছিলেন। এভাবে তিনি ফিলিস্তিনি সমাজের ওপর ওই অংশের দাপট প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিয়ে গেছেন। ইসরাঈলও তাকে ঘৃণা করত। তিনি শরণার্থী সমস্যা ও জেরুজালেমের মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ছাড় দিতে নারাজ ছিলেন। বুশ প্রশাসনও যখনই সুযোগ পেয়েছে, তাকে অপমান, অপদস্ত, বাতিল ও অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বারবার তার জায়গায় মাহমুদ আব্বাস ও মোহাম্মদ দাহলানের মতো ব্যক্তিদের 'বিকল্প নেতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, আব্বাসসহ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সাধারণ ফাতাহ সদস্য ও ফিলিস্তিনিদের সামনে তাকে 'শহীদ' বলে সম্বোধন করেছেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল তার ভাবমূর্তি থেকে ফায়দা তুলে নিজেদের জনপ্রিয় করা। গল্পটি হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেতো। আব্বাস ও দাহলানের মতো নেতারা নিজেদেরকে 'শহীদ' আরাফাতের মশালবাহী দেখিয়ে মুখের কথায় স্বপ্ন দেখিয়ে যেতেন ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার 'বিপ্লব সাধনের'। ব্যাপারটা এরকমই চলতো যদি না পিএলও'র দ্বিতীয় প্রধান নেতা ফারুক কাদ্দুমি প্রকাশ্যে দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করতেন, আরাফাত খুন হয়েছেন। কাদ্দুমি অভিযোগ তুলেছেন, আব্বাস ও দাহলান এবং এরিয়েল শ্যারন ও মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম বার্নস মিলে আরাফাতকে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ইসরাঈলি গুপ্তহত্যার শিকার হলেও অন্যরা এখনো বেঁচে আছে।

স্বাভাবিকভাবে রামাল্লাভিত্তিক ফাতাহ'র নেতারা কাদ্দুমির বিরুদ্ধে গালাগালের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। আব্বাসের অভিযোগ, আগস্টে ফাতাহ'র দীর্ঘ প্রত্যাশিত কংগ্রেস বানচালের জন্যই কাদ্দুমি এমনটা করেছেন। অন্যদিকে কাদ্দুমি বলছেন, এ অভিযোগ তিনি কংগ্রেসেই তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

আব্বাস স্বাধীন কোনো দেশে কংগ্রেস হওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে অধিকৃত পশ্চিমতীরে স্থান নির্ধারণ করায়, তাকে আগেই এটি প্রকাশ করতে হলো। কাদ্দুমি তিউনিসিয়ায় নির্বাসিত আছেন। পশ্চিমতীরে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাদ্দুমি এও বলেছেন, একটি 'বিপ্লবী' আন্দোলনের সম্মেলন ইসরঈলের অনুমতি নিয়ে তাদের ছত্রচ্ছায়ায় সফল হতে পারে না।

স্বাধীন কোনো তদন্ত কিংবা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কাদ্দুমির অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কিন্তু আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে এমনিতেই সন্দিহান ফিলিস্তিনিদের জন্য বেশি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তারা আরাফাতের বিরুদ্ধে ইসরঈলের লাগাতার হুমকি ও হত্যাচেষ্টার সাক্ষী। সাধারণ ফিলিস্তিনি, বিশেষত যাদের বসবাস গাজায়, তাদেরও বিশ্বাস দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু ফিলিস্তিনি আরাফাত হত্যাকাণ্ডে জড়িত। একটি ক্ষুদ্র ফিলিস্তিনি এলিট গোষ্ঠী খোলাখুলিভাবে ফিলিস্তিনের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত। দাহলান তো প্রকাশ্যেই গাজায় নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদের পক্ষে কথা বলে গেছেন, যখন ইসরঈল গাজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঠিক সে সময়টায় মাহমুদ আব্বাস ও দাহলানের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিমতীরে আমেরিকার অস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের ইসরঈলের শত্রুদের (হামাস সমর্থক) বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন।

আমরা বেছে নিয়েছি

'বিজয় অথবা শাহাদাত'

ফিলিস্তিনি প্যারামিলিটারি গ্রুপ ও রাজনৈতিক দল হামাসের প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক নেতা শায়েখ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াসিন বৃটিশ অধিকৃত ফিলিস্তিনের দক্ষিণ গাজার ছোট্ট গ্রাম *আল-জাওরায়* জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালে। নিশ্চিতভাবে তাঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। ফিলিস্তিনি পাসপোর্টে ১ জানুয়ারি ১৯৩৯ উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রচারিত তারিখ ১৯৩৮। তিন বছর বয়সে পিতা আব্দুল্লাহ ইয়াসিন ইন্তেকাল করেন। মাতার নাম সা'দা আল-হাবিল। আহমদ ইয়াসিন চার ভাই, দু'বোনের মধ্যে সবার বড়ো। পরিবারের সঙ্গে গাজা উপত্যকায় বসবাস করতেন। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে হানাদার বাহিনী আল-জাওরা থেকে তাঁদেরকে উচ্ছেদ করলে আশ্রয় নেন 'আল-শাতি উদ্বাস্তু শিবিরে'।

গাজায় আহমদ ইয়াসিনের আগমন উদ্বাস্তুর বেশে। ১২ বছর বয়সে বন্ধু আবদুল্লাহ খতিবের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মারাত্মকভাবে জখম হন। আঘাতের তীব্রতায় গলায় প্লাস্টার করতে হয়। ৪৫ দিন পর যখন প্লাস্টার খোলা হয়, ততোদিনে কঠিন প্যারালাইসিস তাঁকে হুইলচেয়ারে বসার উপযোগী করে দিয়েছে। হাঁটা-চলার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। বন্ধু খতিবের পরিবারের সঙ্গে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি হলে উদার মনের শায়েখ পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হন, 'এটি নিছক দুর্ঘটনা, বন্ধুর কোনো দোষ নেই এতে।'

শায়েখ ইয়াসিন মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারেননি। এরপরও মনের অদ্যম জোর তাঁকে নিজ গৃহে বিভিন্ন মৌলিক ও বুঁনিয়াদি বিষয়ে পড়ালেখা ও গবেষণা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি বিষয়ে স্ব-উদ্যোগে পাঠ নেন তিনি। ছিলেন সুবক্তা। গাজা

উপত্যকাসহ তাঁর বক্তব্য-বিবৃতি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতো। শুক্রবার জুমার সালাতে গণমানুষকে ধর্মপোদেশ দিতেন। এভাবে গাজার সর্বশ্রেষ্ঠ খতিবে পরিণত হন শায়েখ ইয়াসিন।

৮০'র দশকে আহমদ ইয়াসিন গাজা এলাকায় ইসলামি কমপ্লেক্সের প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা ও ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৮৩ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ওই বছরই ইসরাঈলি সন্ত্রাসীরা ১৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৮৫ সালে *পপুলার ফ্রন্ট অব ফিলিস্তিন লিবারেশনের* সঙ্গে বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় ইসরাঈলি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন তিনি। মুক্তি পেয়ে গাজায় ফিরে আসেন শায়েখ। এসময় তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ফিলিস্তিনি শাখায় যোগ দেন। ১৯৮৭ সালে *প্রথম ইন্তিফাদা* চলাকালে ড. আবদুল আজিজ আল-রানতিসিকে নিয়ে 'হরকাতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যা' প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে *হামাস* নামে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

শায়েখ ইয়াসিন ইহুদি ইসরাঈলের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। জিহাদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে- এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ও খোলামেলা অভিমত ব্যক্ত করতেন তিনি। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী। অপরাধী ইহুদিদের আবাসস্থল হিসেবে ইসরাঈলের অস্তিত্ব বরাবরই অস্বীকার করেছেন শায়েখ ইয়াসিন। এসব কারণে পশ্চিমা মিডিয়া আজন্ম তাঁকে শত্রুজ্ঞান করেছে।

পুনঃগ্রেফতার ও মুক্তি

১৯৮৯ সালের ১৮ মে পুণরায় গ্রেফতার হন শায়েখ ইয়াসিন। ১৯৯২ সালে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও হামলার অভিযোগে তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে জায়নিস্ট ইসরাঈল। ইসরাঈলি কারাগারে তাঁর ওপর চালানো সীমাহীন নির্যাতনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি।

১৯৯২ সালে হামাসের সামরিক শাখা 'ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম ব্রিগেড' আহমদ ইয়াসিনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এক ইসরাঈলি সৈন্যকে অপহরণ করে। কিন্তু হামাসের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইসরাঈল ওই সৈন্যকে উদ্ধারে হামলা চালালে হামাসের কয়েকজন যোদ্ধাসহ ওই সৈনিকটি নিহত হয়। ১৯৯৭ সালে

জর্দানে হামাসের বর্তমান প্রধান খালেদ মাশালকে হত্যা চেষ্টায় ধৃত দুই গুপ্তচরের মুক্তির বিনিময়ে শায়েখ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় ইসরাঈল। বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে জিহাদের মাঠে ফিরে আগ্রাসী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জোরদার হামলা চালানোর জন্য অনুচরদেরকে নির্দেশনা দেন শায়েখ ইয়াসিন। এসময় তিনি ইশতেশহাদি হামলার নতুন কিছু কৌশল উদ্ভাবন করেন। ২০০৩ সালে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে চালানো এক সন্ত্রাসী হামলা থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান শায়েখ। আহমদ ইয়াসিন ইহুদি ইসরাঈলের অস্তিত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, দখলদারদেরকে পরাজিত করার মাধ্যমেই ফিলিস্তিন সমস্যার স্থায়ী সমাধান আসবে। গাজায় এক সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন, 'বিশ্বমানচিত্র থেকে ইসরাঈলের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা বিজয় অথবা শাহাদাতের পথ বেছে নিয়েছি।' ফিলিস্তিনি গণমানুষের কাছে শায়েখের এ বিপ্লবী মন্ত্রবাণী বারুদের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে।

নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের গুপ্তসন্ত্রাস

ইসরাঈলি গোলায় শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত শায়েখ ইয়াসিন গাজায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছেন। প্রতিদিন রুটিন ধরে সব কাজ করতেন তিনি। একই রাস্তা দিয়ে যেতেন, একই রাস্তায় ফিরতেন। কখনো দেহরক্ষী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেননি। হামাসের কিছু সদস্য তাঁর প্রতিরক্ষায় সঙ্গে থাকতে চাইলেও, তাঁদের তিনি নিষেধ করতেন। গাজায় আসা যেকোনো মানুষ ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতো। নির্ভীকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন এই মুজাহিদ আলেম।

শায়েখ আহমদ হাসান ইয়াসিন শহীদ। ফিলিস্তিন জিহাদের আলোকিত নক্ষত্র।

২০০৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ইসরাঈলি বিমান বাহিনী শায়েখ ইয়াসিনের বাড়িতে রকেট হামলা চালায়। হামলায় গুরুতর আহত হন তিনি। গাজার আশ-শেফা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওই সময় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন- 'এমন একদিন আসবে, যখন এই আততায়ী হামলা কোনো কাজে আসবে না। হামাসের নেতারা শহীদ হওয়ার জন্য উদগ্রীব, তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পান না। জিহাদ চলবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না দুটি লক্ষ্যের একটি অর্জিত হয়- বিজয় অথবা শাহাদাত।'

২০০৪ সালের ২২ মার্চ ভোরে বাসা থেকে ১০০ মিটার দূরের মসজিদে হুইল চেয়ারে করে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন শায়েখ। ঠিক সে সময় অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গানশিপ[৮৯] থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে ইসরঈল। এসময় তার সঙ্গে থাকা দুই ছেলেসহ শাহাদাতবরণ করেন আরো ৯ হামাস যোদ্ধা। অবরুদ্ধ গাজায় শায়েখ ইয়াসিনের জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন ২ লাখ মানুষ।

১৯৫০-এর দশক থেকে বিমান হামলা চালিয়ে, মিসাইল দেগে, গাড়িবোমা ও পার্শ্বেল বোমা ব্যবহার করে, চোরাগোপ্তা গুলি চালিয়ে ও বিষ-প্রয়োগে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করে যাচ্ছে ইসরঈল। মোসাদের[৯০] ষড়যন্ত্রে বিষমেশানো

---

৮৯ এএইচ-৬৪ অত্যাধুনিক অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। টার্গেটিং ও সার্ভিল্যান্সের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির এই হেলিকপ্টারগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করে গুটিকয়েক দেশ। মার্কিন বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান *লকহিড মার্টিন* ও ক্রুসেডার আমেরিকার সেনাবাহিনী যৌথভাবে এই হেলিকপ্টারের নতুন প্রযুক্তি *M-DSA (Modernized Day Sensor Assembly)* উন্নয়ন করেছে। ৩০ মিলিমিটারের অ্যাপাচি গানশিপ থেকে খুব সহজে ভূমিতে টার্গেট করা যায়। এতে আছে এজিএম-১১৪ হেলফায়ার মিসাইল ও রকেট পড। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের ব্যবহারকারী দেশ- ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইসরঈল, মিসর, নেদারল্যান্ড, গ্রিস, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও তাইওয়ান। (*United States Department Of Defense Fiscal Year 2015 Budget Request Program Acquisition Cost By Weapon System (pdf)*)

৯০ মোসাদ ইসরঈলি সন্ত্রাসীদের গোয়েন্দা সংস্থা। কিডন্যাপ ও গুপ্তহত্যা সংস্থাটির প্রধান কাজ। কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের সমন্বয়ে গড়া এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। জায়নবাদী ইসরঈলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ন মোসাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এর বেশিরভাগ সদস্য সাবেক সন্ত্রাসী সংগঠন হাগানাহ, ইরগুন ও স্ট্যান গ্যাংয়ের সদস্য। আটটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কাজ করে মোসাদ। এর মধ্যে ৫টি বা ৬টি ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে জানা থাকলেও অন্য দুটি ডিপার্টমেন্ট রয়ে গেছে পর্দার আড়ালে।

(১) **কালেকশন ডিপার্টমেন্ট :** এটি সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেন্ট। বহির্বিশ্বে ডিপ্লোমেট, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ অন্যান্য ছদ্মবেশে কাজ করে। (২) **পলিটিক্যাল অ্যাকশন এবং লিয়াজোঁ ডিপার্টমেন্ট :** এই ইউনিটটি বন্ধু দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং যাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই উভয়ের মাঝে সমন্বয় করে। (৩) **স্পেশাল অপারেশন ডিপার্টমেন্ট :** এই গ্রুপ স্পর্শকাতর গুপ্তহত্যায় জড়িত। এদের অধীনে কাজ করে সংঘবদ্ধ ডেথ স্কোয়াড। কুখ্যাত খুনী ও অপরাধীদের দিয়ে

চকোলেট খেয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে *পিএফএলপি*[৯১] নেতা ওয়াদি হাদ্দাদকে।

জাল পশ্চিমা পাসপোর্টধারী ছদ্মবেশী ইসরাঈলি খুনীরা দুবাইয়ের একটি হোটেলে হামাসের সেনাকমান্ডার মাহমুদ আল-মাহবুহকে কীভাবে হত্যা করেছিল, সেই বিষয় অবলম্বনে ইসরাঈলি চলচ্চিত্র নির্মাতারা একটি ফিল্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বলে সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে। হামাসের বর্তমান প্রধান খালেদ মাশাল বিষক্রিয়ায় মরতে বসেছিলেন। কানাডিয় পাসপোর্টে ভ্রমণরত

এটি গঠিত। **(৪) ল্যাপ ডিপার্টমেন্ট :** এই ইউনিট মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে তৎপর। শত্রুর মাঝে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো ও ধোঁকা দেওয়া এদের কাজ। **(৫) রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট :** যাবতীয় গোয়েন্দা গবেষণার কাজ করে। **(৬) ইন্টেলেকচুয়াল ডিপার্টমেন্ট :** মুসলিমবিশ্বে আলেম, বুদ্ধিজীবী ও উল্লেখযোগ্য শ্রেণির চিন্তক তৈরির কাজ করে। মোসাদের প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু গোপন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সঙ্গোপনে ইসলামবিষয়ক এক্সপার্ট তৈরির কাজ চলে। **(৭) রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স :** বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতবাদ ও বিভক্তি সৃষ্টির কাজ করে। বিশেষ করে খৃস্টান ও মুসলিমদের মাঝে এরা ব্যাপক মাত্রায় তৎপর। বাহাই, কাদিয়ানি, শিয়া, ইয়াজিদি, ইসমাইলি প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলোর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে এই ইউনিটটি (সম্ভাব্য)। **(৮) ইহুদিবাদীদের সুরক্ষা ইউনিট :** ফ্রি-ম্যাসন, ইলুমিনাতি ও জায়নবাদসহ ইহুদিবাদের গোপন নেতৃত্ব শ্রেণিকে সুরক্ষা দেয় এই ইউনিটটি (সম্ভাব্য)।

গুপ্তহত্যায় দক্ষ মোসাদ বেশিরভাগ সময় হামলার জায়গায় থাকে না। এরা স্থানীয় মাফিয়া বা সন্ত্রাসীদের দিয়ে কাজ নেয়। মাফিয়াদের দ্বারা সম্ভব না হলেই শুধু মোসাদের ডেথ স্কোয়াড সক্রিয় হয়। ইসরাঈলি সরকারের জন্য কৌশলগত, রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজের বাইরেও মোসাদের কাজের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত। সংস্থাটির ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে ইসরাঈলের সীমানার বাইরে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা, শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলো যাতে বিশেষ ধরনের অস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা এবং দেশে-বিদেশে ইসরাঈলি লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলার ষড়যন্ত্র আগাম প্রতিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। (*The Mossad profile, Federation of American Scientists*)

৯১ *পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব ফিলিস্তিন* বা *পিএফএলপি* ফিলিস্তিনি বামপন্থী দল। মার্কসপন্থী-লেলিনপন্থী এই সেক্যুলার দলটির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ হাব্বাশ। ১৯৬৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে পিএলও-তে যোগ দেয়।

মোসাদ এজেন্টদের পাকড়াও করার পর হামাস নেতার জীবন রক্ষার জন্য বিষনাশক ওষুধ সরবরাহে প্রবল চাপ প্রয়োগে ইসরাঈলকে বাধ্য করা হয়েছিল।

আরববিশ্বে প্রতিক্রিয়া

শায়েখ ইয়াসিনের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনায় জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহ এক বিবৃতিতে এধরনের বর্বরোচিত হামলাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বলে অভিহিত করেন। লেবাননের প্রেসিডেন্ট এমিল লাহুদ ইসরাঈলি সন্ত্রাসের সমালোচনা করেন। কুয়েতের আমির সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ বলেন, 'এ ঘটনায় 'উত্তেজনা' আরো বৃদ্ধি পাবে। কেননা, বলপ্রয়োগ সবসময় কেবল বলপ্রয়োগই বৃদ্ধি করে'। মিসরিয় ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রধান মোহাম্মাদ আকেফ এই হত্যাকাণ্ডকে বীরোচিত শাহাদাত অভিহিত করে বলেন, 'সন্ত্রাসবাদী ইসরাঈলের এধরনের গুপ্তহত্যা কাপুরুষতার পরিচায়ক'।

শায়েখ ইয়াসিনের শাহাদাতে আরববিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও পশ্চিমা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরবতা পালন করে। ইসরাঈলের সমালোচনা কিংবা পোশাকি নিন্দাটুকু পর্যন্ত কেউ করেনি। তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার এই নিরবতা জায়নিস্ট সন্ত্রাসের অন্যায় আগ্রাসনের নগ্ন সমর্থনেরই পরিচয় বহন করে।

শাহাদাতের আগে

শহীদ ইয়াসিনের সন্তান মুহাম্মদ জানান, শাহাদাতের মাত্র তিন ঘণ্টা পূর্বে ইসরাঈলি হামলা সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা শাহাদাত লাভের চেষ্টা করছি। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।'

আজন্ম বিপ্লবী এই মানুষটি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন সমস্ত রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। তামাম ভয়কে জয় করে বিপন্ন স্বজাতির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে জর্দানের একটি পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শায়খ বলেছিলেন, 'পশ্চিমারা আমাদেরকে জিহাদ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু তারা ইহুদি ইসরাঈলকে আমাদের ভূমি জবরদখল করা থেকে বিরত থাকার কথা বলছে

না। আমরা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করছি। দখলদারকে প্রতিহত করার এই ন্যায্য অধিকার থেকে তারা (পশ্চিমারা) আমাদেরকে বিরত রাখতে চায়, যা কোনোভাবে যথার্থ নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের জিহাদ চলবে। যতোদিন ইসরাঈলি সন্ত্রাস বন্ধ না হবে এবং বিশ্বের মানচিত্র থেকে ইসরাঈলকে উপড়ে ফেলা না হবে, ততোদিন আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব'।

ইসরাঈলি গোলায় প্রাণ হারালেও ফিলিস্তিনি গণমানুষের হৃদয়-মনে মিশে আছেন আহমদ হাসান ইয়াসিন। হামাসের সমাবেশ ও র‍্যালিতে এখনো তাঁর বিশাল পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড চোখে পড়ে। মানুষ তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা ইহুদি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদে উজ্জীবিত হয় তাঁর বক্তৃতা, বাণী ও শাহাদাতের প্রেরণা থেকে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে উচ্চমাকাম দান করুন।

পরিশিষ্ট-ক

জেরুসালেমের ইতিবৃত্ত

জেরুসালেম হিব্রু ভাষায় יְרוּשָׁלַיִם *উরশিলম*। মুসলমানদের নিকট আল-কুদ্‌স। মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক এই শহরটি একই সঙ্গে ইহুদি, খৃস্টান ও মুসলিমদের নিকট পবিত্রতম শহর। উসমানি খেলাফতের পতনের পর ১৯২৪ সালে বৃটিশেরা এর দখল নেয়। জাতিসংঘের তরফে ১৯৪৮ সালে শহরটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জর্দানের হাতে হস্তান্তর করা হয় যা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। জেরুসালেম পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলোর অন্যতম। প্রায় তিন হাজার খৃস্টপূর্বাব্দে নগরীটির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, নর্থওয়েস্ট সেমিটিকদের দ্বারা এটি তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস এখানে বেশ কিছু অবকাঠামো তৈরি করে। ওই সময় এটি মিসরিয় সামন্ত নগররাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ায় সৈন্যদের একটি ব্যারাক ছিল এখানে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার সাত'শ ফুট এবং মৃতসাগর থেকে চার হাজার ফুট উঁচু চারটি পাহাড়ের ওপরে নগরীটি সেকালে অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো দেখাতো। এর উত্তর দিকটি খোলা এবং পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক সংকীর্ণ খাদ দিয়ে ঘেরা। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হিন্নোম উপত্যকা শুরু হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে পূর্বদিকে নগরীর দক্ষিণ পূর্বে কিদ্রোণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রতিটি পাশে পর্বতসমূহ নগরীর ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে জয়তুন পর্বতও রয়েছে।

দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে 'সিয়োন' বা 'জেরুসালেম' নগরীর পূর্বনাম ছিল 'শালেম' বা 'শালিম'। অনেকের মতে, নূহ পুত্র শ্যাম এ নগরীর গোড়াপত্তন করেন এবং তার নামানুসারে এটি 'শালেম' বা 'শালিম' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এর নাম হয় জেরুসালেম। জেরুসালেমের পুরনো শহর আধুনিক জেরুসালেম শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত ০.৯ বর্গ কিমি. আয়তনবিশিষ্ট দেয়ালঘেরা অঞ্চল। ১৮৬০ সালে *মিশকেনট শানানিম* নামের ইহুদি বসতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি নিয়েই জেরুসালেম শহর গঠিত ছিল। পুরনো শহরটি ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু স্থানের অবস্থানস্থল, যেমন- মুসলিমদের কাছে *ডোম অব দ্য রক (কুব্বাতুস সাখরা)* ও *আল-আকসা মসজিদ* (বায়তুল মোকাদ্দাস), ইহুদিদের *টেম্পল মাউন্ট* ও *পশ্চিম দেয়াল* (ওয়েস্টার্ন ওয়াল) এবং খৃস্টানদের কাছে *চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার* গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত। প্রথাগতভাবে পুরনো শহরটি চারটি অসমান অংশে বিভক্ত। বর্তমান অবস্থাটি ১৯ শতক থেকে চালু হয়েছে। শহরটি মোটামুটিভাবে মুসলিম মহল্লা, খৃস্টান মহল্লা, ইহুদি মহল্লা ও আরমেনিয় মহল্লা নামে বিভক্ত। ১৯৪৮ সালের ইসরঈলি আগ্রাসনের পর পুরনো শহরটি জর্দান কর্তৃক শাসিত হয়। ১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে টেম্পল মাউন্টে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হয়। এসময় ইসরঈল পূর্ব জেরুসালেমের অবশিষ্ট অংশসহ পুরনো শহর দখল করে পশ্চিম অংশের সঙ্গে একীভূত ও ইসরঈলের অন্তর্গত করে নেয়। জায়নবাদী ইহুদিদের নিকট এটি ইসরঈলের জাতীয় রাজধানী।

বিকৃত বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী খৃস্টপূর্ব ১১ শতকে রাজা দাউদের জেরুসালেম জয়ের পূর্বে এই শহরে জেবুসিয়দের (মাৎস দেবতার পূজারী) বাসস্থান ছিল। বাইবেলের বর্ণনাতে শহরটি মজবুত নগরপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলে জানা যায়। রাজা দাউদ কর্তৃক শাসিত শহর যেটি *দাউদের শহর* বলে পরিচিত তা পুরনো শহরের দেয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিমে

অবস্থিত। তাঁর পুত্র রাজা সোলায়মান আলাইহিস সালাম শহরের দেয়াল সম্প্রসারিত করেন। এরপর ৪৪০ খৃস্টপূর্বের দিকে পারস্য আমলে নেহেমিয়া ব্যবিলন থেকে ফিরে এর পুনঃনির্মাণ করেন। ৪১-৪৪ খৃস্টাব্দে জুডিয়ার রাজা আগ্রিপ্পা 'তৃতীয় দেয়াল' নামে নতুন নগরপ্রাচীর নির্মাণ করেন।

৭ম শতকে (৬৩৭ সালে) খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে সাহাবায়ে কেরাম জেরুসালেম জয় করেন। জেরুসালেম অবরোধের পর সেখানকার খৃস্টান শাসক সফ্রেনিয়াস খলিফা ওমরকে স্বাগতম জানান। জেরুসালেমের চার্চের কাছে পরিচিত বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে 'একজন দরিদ্র কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিশালী ব্যক্তি' জেরুসালেমের খৃস্টানদের রক্ষক ও মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হবেন- এমন উল্লেখ ছিল। সফ্রেনিয়াস বিশ্বাস করতেন, সাদাসিধে জীবনযাপনকারী ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন। আলেক্সান্দ্রিয়ার পেট্রিয়ার্ক ইউটিকিয়াসের লেখা ইতিহাসে দেখা যায়, ওমর রাদিআল্লাহু আনহু চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার পরিদর্শন করেন ও এর উঠোনে বসেন। নামাজের সময় তিনি চার্চের বাইরে গিয়ে নামাজ আদায় করেন যাতে পরবর্তীতে কেউ তাঁর নামাজের কারণকে ব্যবহার করে এই চার্চকে মসজিদে রূপান্তর না করে। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডের সময় ইউরোপের খৃস্টান সন্ত্রাসীরা জেরুসালেম দখল করে এবং ১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক তা বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এতে তাদের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহ ইহুদিদেরকে শহরে বসবাসের অনুমতি দেন। ১২১৯ সালে দামেশকের সুলতান মোয়াজ্জম নগরের দেয়াল উঠিয়ে দেন। ১২২৯ সালে মিসরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী জেরুসালেম জার্মানির দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের হস্তগত হয়। ১২৩৯ সালে ফ্রেডারিখ দেয়াল পুনঃনির্মাণ করেন। ক্রাকের আমির দাউদ খৃস্টান সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে দেয়ালগুলো ধ্বংস করে দেন। ১২৪৩ সালে জেরুসালেম পুনরায় মুসলিমদের দখলে আসে। ১২৪৪ সালে খারেজমের তাতাররা শহরটি দখল

করে নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে। ফলে শহরটি প্রতিরক্ষাহীন ও এর মর্যাদা হুমকির মুখে পড়ে। জেরুসালেমে এপর্যন্ত ২৩বার ভয়াবহ আগুন লেগেছে। বহিঃশক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে ৫২বার। দখল, পুনঃদখল ও হাতবদল ঘটেছে ৪৪বার।

প্রথম সোলায়মান : বর্তমান দেয়ালগুলো ১৫৩৮ সালে উসমানিয় সাম্রাজ্যের সুলতান প্রথম সোলায়মান কর্তৃক নির্মিত। দেয়ালগুলো প্রায় ৪.৫ কিমি. (২.৮ মাইল) দীর্ঘ ও ৫ থেকে ১৫ মিটার (১৬ থেকে ৪৯ ফুট) পর্যন্ত উঁচু এবং ৩ মিটার (১০ ফুট) পুরু। বর্তমানে পুরনো শহরে মোট ৪৩টি চেকপোস্ট ও ১১টি গেট আছে। এর মধ্যে সাতটি গেট উন্মুক্ত।

জেরুসালেম এখন চারটি অংশে বিভক্ত। এগুলো হলো- (১) মুসলিম মহল্লা (حارَة المُسلِمين)- উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত চারটি মহল্লার মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সবচে জনবহুল। পূর্বে সিংহ দরজা থেকে শুরু করে টেম্পল মাউন্টের উত্তর দেয়াল নিয়ে পশ্চিমে দামেশক পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০০৫ সালে এখানে ২২,০০০ মানুষ বসবাস করতো। অন্য তিনটি মহল্লার মতো মুসলিম মহল্লাতেও ১৯২৯ এর দাঙ্গার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের পাশাপাশি ইহুদি ও খৃস্টানরা বসবাস করতো। বর্তমানে ৬০টি ইহুদি পরিবার এখানে বাস করে। (২) খৃস্টান মহল্লা (حارة النصارى)- শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি উত্তরে নতুন গেট থেকে শুরু করে পুরনো শহরের পশ্চিম দেয়াল নিয়ে জাফা গেটসহ দক্ষিণে বিস্তৃত। এর সঙ্গে ইহুদি ও আরমেনিয় মহল্লার সীমানা রয়েছে। পূর্বে দামেশক গেটে মুসলিম মহল্লার সঙ্গেও এর সীমানা আছে। এই মহল্লায় খৃস্টানদের পবিত্রতম স্থান *চার্চ অব দ্য হলি সেপালচার* রয়েছে। (৩) আরমেনিয় মহল্লা (حارة الأرمن)- আরমেনিয় মহল্লা চারটি অংশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। আরমেনিয়রা ধর্মে খৃস্টান হলেও এটি খৃস্টান মহল্লা থেকে আলাদা। বর্তমানে ৩,০০০ এরও বেশি

আরমেনিয় জেরুসালেমে বসবাস করে যার মধ্যে ৫০০জন মহল্লায় থাকে। সেমিনারিতে অধ্যয়নরত বা চার্চে কর্মরত কিছু সাময়িক বাসিন্দাও এখানে রয়েছে। ১৯৭৫ সালে আরমেনিয় মহল্লায় একটি ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরঈল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত চার্চ সংস্কারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। (৪) ইহুদি মহল্লা (حارة اليهود)- ইহুদি মহল্লা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি দক্ষিণে জায়ন গেট থেকে পশ্চিমে আরমেনিয় মহল্লা নিয়ে উত্তরে কারডো এবং পূর্বে পশ্চিম দেয়াল ও টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে এখানে ইহুদিরা ধারাবাহিকভাবে বসবাস করছে। ১৯৬৭ সালে ছয়দিনের সন্ত্রাসী আগ্রাসনে ইসরঈলি ছত্রীসেনারা দখল করার আগ পর্যন্ত এটি জর্দানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দখল করার পর জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী মরক্কোন মহল্লা ধ্বংস করে ফেলে। এখানে বর্তমানে ২,৩৪৮জন বাসিন্দা রয়েছে (২০০৪ সালের হিসেবে) এবং বহু বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পুনঃনির্মাণের আগে জায়নবাদীরা এখানে খননকার্য চালায়।

মরোক্কান মহল্লা : পুরনো শহরে একটি ক্ষুদ্র মরোক্কান মহল্লা ছিল। ছয়দিনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর জায়নবাদীরা এটি ধ্বংস করে দেয়। যে অংশটি ধ্বংস করা হয়নি সেটি বর্তমানে ইহুদি মহল্লার অংশ হিসেবে রয়েছে। এখান থেকে ইহুদিরা মাগরিবি ব্রিজ দিয়ে টেম্পল মাউন্টে যেতে পারে। এটি তাদের একমাত্র প্রবেশ পথ।

প্রবেশপথ : ক্রুসেডার রাজ্য জেরুসালেমের সময় জেরুসালেমের পুরনো শহরে চারটি ফটক ছিল। এগুলো প্রতিটি একেক পাশে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে অবস্থিত দেয়ালগুলো প্রথম সোলায়মান কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে ফটক সংখ্যা এগারোটি। জায়নবাদীরা সাতটি উন্মুক্ত রেখেছে। ১৮৮৭ সাল

পর্যন্ত ফটকগুলো সূর্যাস্তের আগে বন্ধ করে দেওয়া হতো ও সূর্যোদয়ের সময় খুলে দেওয়া হতো।

উন্মুক্ত ফটক : (১) নিউ গেট (হিব্রু : হাশাআর হেহাদাশ, আরবি : আল-বাবুল জাদিদ)। অন্য নামে হামিদের ফটক। নির্মিত হয়, ১৮৮৭ সালে। এটি শহরের উত্তর অংশের পশ্চিমে অবস্থিত। (২) দামেশক গেট (হিব্রু : শাআর শেখিম, আরবি : বাবুল আমুদ)। অন্য নামে শাআর দামেশক-নাবলুস ফটক-পিলারের ফটক। নির্মিত হয়, ১৫৩৭ সালে। শহরের উত্তর অংশের মাঝখানে অবস্থিত। (৩) হেরোদ গেট (হিব্রু : শাআর হাপেরাচিম, আরবি : বাবুল শাহিরা)। অন্য নামে শাআর হরদস-পুষ্প ফটক-ভেড়া ফটক। নির্মাণ সাল, অজ্ঞাত। শহরের উত্তর অংশের পূর্বে অবস্থিত। (৪) লায়ন গেট (হিব্রু : শাআর হাআরায়ত, আরবি : বাবুল আসবাত)। অন্য নামে, ইয়েহশাফাতের ফটক-সেইন্ট স্টিফেনের ফটক-গোত্রদের ফটক। নির্মিত হয়, ১৫৩৮-৩৯ সালে। শহরের পূর্ব অংশের উত্তরে অবস্থিত। (৫) ডান গেট (হিব্রু : শাআর হাআশপত, আরবি : বাবুল মাগরেব)। অন্য নামে সিলওয়ানের ফটক-শাআর হামুগরাবিম। নির্মিত হয়, ১৫৩৮-৪০ সালে। শহরের দক্ষিণ অংশের পূর্বে অবস্থিত। (৬) জায়ন গেট (হিব্রু : শাআর জায়ন, আরবি : বাবুন নাবিয়ি দাউদ)। অন্য নামে, ইহুদি মহল্লার ফটক। নির্মিত হয়, ১৫৪০ সালে। শহরের দক্ষিণ অংশের মাঝখানে অবস্থিত। (৭) জাফা গেট (হিব্রু : শাআর ইয়াফো, আরবি : বাবুল খলিল)। অন্য নামে, দাউদের প্রার্থনা স্থলের ফটক-পোর্টা ডেভিডি। নির্মিত হয়, ১৫৩০-৪০ সালে। শহরের পশ্চিম অংশের মাঝখানে অবস্থিত।

বন্ধ ফটক : (১) গোল্ডেন গেট (হিব্রু : শাআর হারাহামিম, আরবি : বাবুর রাহমা)। অন্য নামে, দয়ার ফটক-চিরস্থায়ী জীবনের ফটক। নির্মিত হয়, ১৫৪১ সালে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ৬ষ্ঠ শতকে। পূর্ব অংশের মাঝখানে

অবস্থিত। (২) একক গেট, এর মধ্য দিয়ে টেম্পল মাউন্টের ভূগর্ভস্থ অংশে যাওয়া যায়। নির্মিত হয়েছে, হেরোদের শাসনামলে। টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ দেয়ালে অবস্থিত। (৩) দ্বৈত গেট। নির্মিত হয়েছে, হেরোদের শাসনামলে। টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ দেয়ালে অবস্থিত। (৪) হালদাহ গেট। তিনটি ধনু আকৃতির প্রবেশপথ থাকার কারণে তিন ফটক নামেও পরিচিত। নির্মিত হয়েছে, হেরোদের শাসনামলে। এটিও টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ দেয়ালে অবস্থিত। (-উইকিপিডিয়া)

পরিশিষ্ট-খ

'ইয়ম কিপুর' আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ

লন্ডন, ৫ অক্টোবর, ১৯৭৩। মধ্যরাত সবে পেরিয়েছে। ইসরাঈলি কর্মকর্তা ডুবি অ্যাশেরভের বাসার টেলিফোন বেজে উঠল। 'মি. সোর্স' ছদ্মনামের মিসরের জনৈক গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তার কাজ। ফোনটা ইসরাঈলের কাছে অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া মি. সোর্সের। খুব সরল একটি বার্তা 'বসের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন, জরুরি।'

অ্যাশেরভ তৎপর হয়ে উঠলেন। তেলআবিবে তার বস ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পরিচালক জভি জামিরকে ফোন করলেন তিনি। এর কয়েক ঘণ্টা পর জামিরকে দেখা গেল লন্ডনে। মোসাদের সেফ হাউসে ওই সোর্সের সঙ্গে দেখা হলো তার। তার দেওয়া খবর অবিশ্বাস্যই বটে। তার চেয়েও বড়ো কথা গুপ্তচরের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল যা এ পেশায় বিরল ঘটনা। এই গুপ্তচর আশরাফ মারওয়ান। জামাল আব্দুন নাসেরের শ্যালক।

লন্ডনের কিংস কলেজের ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার স্টাডিজের *আহরন ব্রেগম্যান* বলেন, 'গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে আশরাফ মারওয়ান ছিলেন অন্যতম সেরা। তিনি কখনো ভুল করেননি। তিনি শুধু চালাক ও ভীষণ দক্ষই ছিলেন না, তার তথ্যও হতো নির্ভুল। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের (১৯৫৬-১৯৭০) আত্মীয় ও প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের (১৯৭০-৮১) ডান হাত।'

এই মারওয়ান যখন জামিরকে বললেন, পরদিন অর্থাৎ ৬ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় মিসর ও সিরিয়া ইসরাঈল আক্রমণ করবে, তাকে বিশ্বাস করার সব কারণই ছিল। তারপরও কথা থাকে। এ খবর কি তিনি মিসরের ক্ষমতা কেন্দ্রের সর্বোচ্চপর্যায় থেকে পেয়েছেন? নাকি 'সোর্স' তাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তার কাছে ফাঁস করা খবর ইসরাঈলকে দিয়েছেন?

সর্বাত্মক যুদ্ধ

৬ অক্টোবর ইহুদিদের *ইয়ম কিপুর* বা প্রায়শ্চিত্তের পবিত্রতম দিন। জরুরি অধিবেশনে মিলিত হলো ইসরাঈলি মন্ত্রিসভা। রিজার্ভ সৈন্যদের জরুরি তলবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্রণীত হলো প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা, এর নাম দেওয়া হলো 'ডাভকোট' বা ঘুঘুর বাসা। যুদ্ধ শুরুর দুই ঘণ্টা আগে বাস্তবায়ন শুরু হবে *অপারেশন ডাভকোট*।

৬ অক্টোবর বেলা ২টায় ২২০টি মিসরিয় জঙ্গিবিমান সুয়েজ খাল পেরিয়ে সিনাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। একই সময়ে জিলান মালভূমির ইসরাঈলি অবস্থানগুলোতে ব্যাপকভাবে হামলা চালাল সিরিয়ার জঙ্গিবিমান। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে এ ছিল মিসর ও সিরিয়ার সর্বাত্মক যুদ্ধ। এটি শুরু হয়েছিল আশরাফ মারওয়ানের নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগে। মিসরের লক্ষ্য ছিল সিনাই উপদ্বীপ ও সিরিয়ার লক্ষ্য ছিল ইসরাঈলের কব্জা থেকে *জিলান* মুক্ত করা। ১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাঈল এগুলো দখল করে নিয়েছিল।

আসন্ন আরব হামলার ব্যাপারে গোয়েন্দা সূত্রে আগাম খবর পেলেও ইসরাঈলি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা *আমান*-এর প্রধান জেনারেল এলি জেইরা মনে করেছিলেন এ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এর ফল হলো, মিসর ও সিরিয়ার হামলা শুরুর সময় ইসরাঈল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। তাদের নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ছিল অপ্রতুল এবং রিজার্ভ ফোর্স তখনো জায়গায় এসে পৌঁছেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আনোয়ার সাদাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তারা যখন মিসরকে সামরিক সরঞ্জাম প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিল তখন ইসরাঈল জানত সাদাত সর্বাধুনিক অস্ত্র জোগাড় করতে পারেননি। ফলে সমরশক্তিতে মিসর ইসরাঈলের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ছয়দিনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে মিসরিয়রা চাইছিল, তাদের দেশ আবার যুদ্ধ করুক। মিসরিয় লেখক *জামাল গনি* বলেন, 'জনগণ পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে পারছিল না, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। মিসরের জনগণ যুদ্ধের জন্য যখন আন্দোলনে নামল তখন মিসরের সেনাবাহিনীও এটি প্রদর্শন করতে মরিয়া হয়ে উঠল, তারা সে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে ও তাদের পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে যারা রয়েছে সুয়েজের ওপারে।'

প্রমাণের অপেক্ষা

মিসরের অস্ত্রশস্ত্র পুরনো দিনের এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সিনাইকে ইসরাঈলের দখলমুক্ত করার ক্ষমতা নেই, এটি উপলব্ধি করে ক্ষমতায় আসার চার মাস পর প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাঈলকে একটি প্রস্তাব দেন। তিনি তাদের বলেন, তারা সিনাই ছেড়ে দিলে তিনি তাদের সঙ্গে চুক্তি করবেন। কিন্তু ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং, যুদ্ধ ছাড়া সাদাতের সামনে আর কোনো পথ খোলা রইল না। মিত্র হিসেবে তিনি পেলেন সিরিয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আসাদকে। ১৯৭০ সালে এক সামরিক ক্যুর মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। নিজের জনগণের কাছে তার আস্থা অর্জন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বৈরুতে মিডল ইস্ট স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক *হিশাম জাবের* বলেন, 'ইসরাঈলের সঙ্গে ১৯৬৭-এর যুদ্ধে আরব জোটের পরাজয়কালে হাফেজ আসাদ সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। পরাজয়ের জন্য তাকেই প্রধানত দায়ী করা হয়। তাই ক্ষমতা হস্তগত করার পর '৬৭-এর যুদ্ধের

পরাজয়ের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সিরিয় সেনাবাহিনীকে তিনি পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। ১৯৭৩ সালজুড়ে সাদাত ও আসাদ অনেকগুলো বৈঠকে যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এ পরিকল্পনার সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হলো 'বদর'।'

সুয়েজ খাল অতিক্রম

সিরিয়া জিলান মালভূমিতে সৈন্য সমাবেশ করল, একই কাজ করল মিসর সুয়েজ খালে। পাঁচ মাস আগে এরকম একটি সেনা সমাবেশ দেখার পর ইসরঈল ব্যাপক পাল্টা ব্যবস্থা নেয়। তখন মিসরিয় সেনা সমাবেশ সুয়েজ খালের পাড় থেকে আর এগোয়নি। ইসরঈলি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ একই ব্যয়বহুল ভুল আবার না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

ইসরঈলি সামরিক ঐতিহাসিক *উরি বার জোসেফ* বলেন, '৫ অক্টোবর দুপুরে *আমান*-এর প্রকাশিত একটি দলিলে দেখা যায়, মিসরিয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতির একটি নিখুঁত বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে।'

প্রথম বিমান হামলার কয়েক মিনিট পরই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়। গোলন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় ৭২০টি ভেলায় ৪ হাজার মিসরিয় স্থল সৈন্যের প্রথম দলটি সুয়েজ অতিক্রম করে। এদিকে যুদ্ধ শুরুর আধঘণ্টার মধ্যেই 'ডাভকোট' পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে ইসরঈল। কিন্তু বিকেল ৫টার মধ্যে ৪৫টি মিসরিয় পদাতিক ব্যাটালিয়ন সুয়েজ পেরিয়ে যায়। ব্যর্থ হয় 'ডাভকোট'। দ্বিতীয় দিনের সূর্যোদয় নাগাদ যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণরূপে মিসরের অনুকূলে। ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে এক লাখ সৈন্য, এক হাজারেরও বেশি ট্যাঙ্ক ও ১০ হাজারেরও বেশি অন্যান্য সামরিক যান সুয়েজ খাল অতিক্রম করে।

সুযোগ নষ্ট

জিলান রণাঙ্গনে তিনটি সিরিয় পদাতিক ডিভিশন *পারপল লাইন* নামে পরিচিত ১৯৬৭ সালের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে। যুদ্ধ শুরুর দুই ঘণ্টার মধ্যে সিরিয়রা 'ইসরঈলের চোখ' বলে পরিচিত হারমন পর্বতের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এটি ছিল তাদের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের ঘটনা।

৬ অক্টোবর রাতে সিরিয় সেনারা ইসরঈলি প্রতিরক্ষা রেখার প্রহরাহীন স্থানগুলো দিয়ে ঢুকে পড়ে। তাদের ট্যাঙ্কগুলো জিলানের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যায়। তারা যখন বিপুল সাফল্য লাভ করে চলেছিল এ অবস্থায় মধ্যরাতে তাদের থেমে যাওয়ার এবং সকালে পুনরাক্রমণের জন্য পুনর্গঠিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের সামনে তখন জর্দান উপত্যকা ও ইসরঈলের প্রাণকেন্দ্র প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় ছিল। পুবদিকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে জিলানের প্রান্তে ছিল সেসব অবস্থান যেগুলো দখল করতে পারলে সিরিয় বাহিনী অজেয় হয়ে উঠত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আসাদ নিজে সিরিয় সামরিক বাহিনীকে লৌহমুষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তার মূল যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারো ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আড়াই লাখ ইসরঈলি রিজার্ভ সৈন্য জড়ো হয়। সিরিয়দের হিসেব ছিল, ইসরঈলি রিজার্ভ সৈন্যদের জড়ো হতে ও জিলানে পৌঁছতে ২৪ ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু ইসরঈলের প্রথম ট্যাঙ্ক জিলানে পৌঁছে মধ্যরাতে অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাদের সেখানে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র ১৫ ঘণ্টা। ভোরের পরপরই সিরিয় বাহিনী ইসরঈলিদের সাফল্যজনক সমাবেশ উপেক্ষা করে পূর্বপরিকল্পনামাফিক ট্যাঙ্ক আক্রমণ শুরু করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসরঈলি অগ্রবর্তী কমান্ড সেন্টার *নাফাখ* ও *জিলান* নিয়ন্ত্রণকারী কৌশলগত সংযোগস্থল। ইসরঈলিরা সৈন্য ও ট্যাঙ্কের বিপুল ক্ষতির মাধ্যমে সিরিয়দের অগ্রগতি থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তারা দুটি সাঁজোয়া ডিভিশনের সমাবেশ ঘটায়। যুদ্ধের চতুর্থ দিনের শেষে দেখা যায়, উত্তর জিলানের একটি স্থানে

ইসরাঈলিরা শত শত সিরিয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে। পরে জায়গাটি 'অশ্রুজলের উপত্যকা' নামে পরিচিত হয়।

হিশাম জাবের বলেন, 'যুদ্ধের প্রথম দু'দিন অতি উৎসাহী সিরিয়রা ভেবেছিল তারা ইসরাঈলিদের পরাজিত করতে পারবে। তারা জিলান মুক্ত করে ফিলিস্তিনের দিকে এগোবে। তারা ভেবেছিল তারা যুদ্ধ শেষ করতে পারবে। কিন্তু তারা নিজেদের খুব বেশি জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল এবং প্রথম তিনদিনের যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক ট্যাঙ্ক হারিয়েছিল। সিরিয়দের অগ্রগতি পরিণত হয় পশ্চাৎপসরণে। ইসরাঈলিরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার আরো গভীরে ঢুকে পড়ে।'

প্রতিরোধমূলক অবস্থান

সিনাইয়ে মিসরিয়রা তাদের প্রথমদিনের বিজয়কে নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করে এবং ইসরাঈলের অনিবার্য পাল্টা হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়। ৮ অক্টোবর তা শুরু হয়। মিসরের দ্বিতীয় পদাতিক ডিভিশনের ইয়াসির ওমর স্মৃতিচারণ করেন, 'আমরা গুলি চালানোর নির্দেশ পেলাম। আমাদের কাছে যতো রকম অস্ত্র ছিল সেসব দিয়ে আমরা গুলি চালাই। সত্যিকার অর্থেই এ ছিল এক গণহত্যা। মিসরিয় রকেটচালিত গ্রেনেডধারী (আরপিজি) সৈন্যরা পাখিরা যেমন এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে বেড়ায় সেভাবে লাফিয়ে ফিরছিল। তারা ট্যাঙ্কগুলো ৫০ মিটার দূরে থাকতে এবং রেঞ্জের মধ্যে এলেই ফায়ার করছিল। তারা একটাকে অচল করে দেওয়ার পর আরেকটাকে আঘাত করছিল।'

২৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম ইসরাঈল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে। যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে ইসরাঈল আরেকটি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৩ অক্টোবর সুয়েজ খালের পূর্বতীরের *বারলেভ লাইন* নামে পরিচিত ইসরাঈলের প্রতিরক্ষা রেখার সর্বশেষ সেনাঘাঁটির সৈন্যরা সংবাদমাধ্যমের

সামনে মিসরিয় ৪৩তম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ ব্যাটালিয়নের *হামদি শোরবাগি* বলেন, 'আমি দেখলাম পরাজিত ইসরাঈলি সৈন্যরা সাদা পতাকা হাতে আত্মসমর্পণ করছে, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।'

'৬৭-এর ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাঈলের কাছে হারানো সিনাইয়ের ভূমি পুনর্দখল ও সামরিক বাহিনীর বিজয় সাফল্যে উল্লসিত মিসরিয়দের ভিড়ে কায়রোর রাজপথগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। অন্যদিকে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় আরববিশ্বে।

দুটি আলাদা যুদ্ধ

আট মাস আগে সাদাত ও আসাদ দুটি ফ্রন্টে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল, দুই প্রেসিডেন্ট একত্রে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার ব্যাপারে দু'জনের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আনোয়ার সাদাত চেয়েছিলেন একটি সীমিত যুদ্ধ যার লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক শক্তিগুলোকে নাড়া দেওয়া, যাতে স্থগিত শান্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে তা সাদাতের ব্যক্তিগত লক্ষ্য অতিক্রম করে যায়। একটি দ্রুত বিজয় যেন দৃশ্যমান হচ্ছিল। ১৩ অক্টোবর মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তার কাছে জাতিসংঘের উদ্যোগে বর্তমান অবস্থানের ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিলে সাদাত তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'ইসরাঈলিরা সমগ্র সিনাই থেকে প্রত্যাহার করলে তবেই তিনি যুদ্ধবিরতি মানবেন।'

'দি ইয়ম কিপুর ওয়ার' গ্রন্থের লেখক *আব্রাহাম রবিনোভিচ* বলেন, 'সাদাতের জন্য সবকিছুই খুব ভালোমতো চলছিল। তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি। তাকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে হলে নাটকীয় কিছু করার দরকার ছিল, হয়তো অনুরোধ করলে তিনি রাজি হতেন। সবচেয়ে ভালো কাজ

হতো ইসরাঈলিরা সুয়েজ খাল অতিক্রম করলে। তাকে তা যথেষ্ট শঙ্কিত করতো।’

১৪ অক্টোবর সকালে মিসরিয় সাঁজোয়া ডিভিশন পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইসরাঈলিরা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণকৃত অবস্থানে অপেক্ষা করছিল। তাই প্রথম কয়েক মিনিটেই মিসরিয়রা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। দুপুর নাগাদ ২৫০টি মিসরিয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। মিসরের জেনারেল কমান্ড অগ্রগামী বাহিনীকে পশ্চাৎপসরণের নির্দেশ দেয়। ওদিকে সিরিয় রণাঙ্গনে ইসরাঈল প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়, কিন্তু তারা সাফল্য লাভ করে। তারা দামেশকের ৩৫ কিমির মধ্যে পৌঁছে যায়। নতুন যেসব এলাকা তারা অধিকার করে তা পরে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় তাদের দরকষাকষিতে সহায়ক হয়। ইসরাঈলিরা মিসরিয়দের মনোযোগ দক্ষিণে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তারপর তারা সুয়েজ অতিক্রমের পরিকল্পনা করে যার নাম দেওয়া হয় ‘স্টাউটহার্টেড ম্যান’। এজন্য প্রয়োজন ছিল তাদের অগ্রাভিযানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মিসরের দ্বিতীয় আর্মিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

চিনা ফার্মের লড়াই

মিসরের একটি কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের চারপাশে লড়াই চলছিল। ষাটের দশকে জাপানি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এটি চালু হয়েছিল। ’৬৭-র ছয়দিনের যুদ্ধে এলাকাটি দখলের পর ইসরাঈলিরা সেখানে কৃষি সরঞ্জাম পরিচালনায় নিয়োজিত জাপানিদের চিনা বলে ভুল করেছিল। এবার তা মিসরিয় সৈন্যরা পুনর্দখল করে। কিন্তু ১৫ অক্টোবর ইসরাঈলি ট্যাঙ্কগুলো চিনা ফার্মটির ওপর হামলা শুরু করে।

১৬ অক্টোবর সকালে ১৫টি ভেলা খালে আনা হয়। সেগুলো ইসরাঈলি ট্যাঙ্কগুলোকে পশ্চিম পাড়ে নিতে থাকে। মিসরিয়দের অজ্ঞাতসারে ইসরাঈলিরা এ কাজটি করতে সক্ষম হয়। সেদিন সকালে প্রেসিডেন্ট সাদাত কায়রোর সড়কগুলোতে এক বিজয় কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেন।

ইসরাঈলিদের ট্যাঙ্ক সুয়েজ খাল পার করার মিসরিয় রিপোর্টগুলো ছিল বিভ্রান্তিকর এবং তাতে সমস্যার গভীরতা উপেক্ষিত হয়েছিল। তা তখনই ধরা পড়ে যখন ইসরাঈলিরা খালের পশ্চিম পাড়ে হামলা শুরু করে এবং মিসরিয়রা দেখতে পায়, শত্রু তাদের পেছন দিকে অবস্থান নিয়েছে। মিসরিয়রা প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। চিনা ফার্ম নিয়ে দু'দিনের প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর খাল অভিমুখী সড়কে ইসরাঈলের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মিসরিয় বাহিনী পশ্চাৎপসরণ করে। এজন্য ইসরাঈলকে চড়া মূল্য দিতে হয়।

উরি ড্যান নামে জনৈক ইসরাঈলি রণাঙ্গন সংবাদদাতা বলেন, 'প্রধানত আহত ও নিহতদের বিপুল সংখ্যার কারণে এটি ছিল একটি বেদনাময় বিজয়। খাল পার হওয়ার একরাতেই আমরা ৪শ' লোক হারাই। ট্যাঙ্কগুলো যুদ্ধ করছিল যেগুলোর কিছু অংশকে আমরা পরদিন দিবালোকে দেখতে পাচ্ছিলাম। একটি ট্যাঙ্কের ব্যারেল আরেকটি মিসরিয় ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগের তলোয়ারধারী দু'যোদ্ধা যেমন পরস্পরে লড়ত। তবে এখন তা ছিল ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে যুদ্ধ। এতে দুটিই ধ্বংস হয়ে যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেতরে থাকা সৈনিকদের সবাই নিহত হতো। পরদিন খাল বরাবর মৃত্যু উপত্যকার পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ, কিন্তু আমরা ছিলাম খালের অপর পাড়ে।'

১৮ অক্টোবর ইসরাঈলি হাইকমান্ড খালের পশ্চিম তীরে ৩টি সাঁজোয়া ডিভিশন মোতায়েনের মাধ্যমে তাদের খাল অতিক্রমের এ সাফল্যকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একটি ডিভিশন মিসরের দ্বিতীয় আর্মিকে ঘিরে ফেলবে ও ইসমাইলিয়া দখল করবে। অন্য দুটি ডিভিশন দক্ষিণে গিয়ে মিসরের তৃতীয় আর্মিকে ঘেরাও ও সুয়েজ শহর দখল করবে। এসময় সাদাত মিসরের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে তলব করেন। বলেন, 'তিনি যুদ্ধবিরতি মানতে প্রস্তুত আছেন।' কিন্তু এবার ইসরাঈলিদের তাতে আগ্রহ ছিল না।

বিশ্বপ্রতিক্রিয়া

যুদ্ধের দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে উভয় বাহিনী অচলাবস্থায় থাকা অবস্থায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মস্কো পৌঁছেন। তার লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘের উদ্যোগে যুদ্ধবিরতি যা মিসরের সোভিয়েত মিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

২২ অক্টোবর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে ৩৩৮ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্য সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিটে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২৩ অক্টোবর সকালেও ইসরঈলি বাহিনী যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। দিনের শেষে তারা সুয়েজ সিটি পাশ কাটিয়ে গিয়ে আদাবিয়া বন্দরে পৌঁছে। খালের পূর্ব পাড়ে অবস্থান নিয়ে থাকা মিসরের তৃতীয় আর্মি সবদিকে ইসরঈলি সৈন্য দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। ৩৫ হাজার সৈন্য তাদের ঘাঁটিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

২৩ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। রণাঙ্গনে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক প্রেরণ সংবলিত ৩৩৯ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরদিন অর্থাৎ, ২৪ অক্টোবর সকাল ৭টা থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার সময় নির্ধারিত হয়। কিন্তু আরেকবার ইসরঈল তা ভঙ্গ করে।

আল-ঘিতানি বলেন, 'তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি বড় শহর, সুয়েজ সিটি বা ইসমাইলিয়া সিটি দখল। একটি নামী শহর চাইছিল তারা। তারা একটি প্রচারণার লড়াই চাইছিল, একই সঙ্গে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছিল তারা।'

সুয়েজের জন্য লড়াই

ছয়দিনের যুদ্ধের আগপর্যন্ত সুয়েজ ছিল একটি বর্ধনশীল বাণিজ্যিক শহর ও বন্দর। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর সুয়েজ নিজেকে আবিষ্কার করল মিসর ও ইসরঈল অধিকৃত সিনাইয়ের মধ্যকার রণাঙ্গন হিসেবে। ইসরঈলি হামলার লক্ষ্য হিসেবে শিগগিরই তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

আড়াই লাখ লোককে শহরটি থেকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে তা পরিত্যক্ত এলাকার রূপ নেয়। মাত্র পাঁচ হাজার লোক থেকে যায় অবকাঠামোগুলো পরিচালনা ও কারখানা পাহারা দেওয়ার জন্য।

২৪ তারিখ সকালে নতুন যুদ্ধবিরতি সবে কার্যকর হতে শুরু করেছে। এসময় প্রায় জনশূন্য শহরে ইসরাঈলি ট্যাঙ্ক ও সৈন্যদের চলাচল শুরু হয়। এসময় তারা মিলিশিয়াদের একটি ছোট দলের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এই যুদ্ধে ৮০ ইসরাঈলি সৈন্য নিহত ও ১২০জন আহত হয়।

একই দিন ওয়াশিংটনে একটি উদ্বেগজনক বার্তা পৌঁছে। 'সোভিয়েতরা যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে একতরফা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।' 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি'তে নাকানিচুবানি খেতে থাকা প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এ সঙ্কট মোকাবেলার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে দায়িত্ব দেন। তিনি শক্তিপ্রদর্শনের মাধ্যমে সোভিয়েত হুমকির জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সতর্কাবস্থা শান্তিকালীন সময়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

'দ্য টু ও'ক্লক ওয়ার' গ্রন্থের লেখক *ওয়াল্টার জে বয়েন* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশ্ন সবসময়ই পারস্পরিক নিশ্চিহ্নকরণের চেষ্টায় আবর্তিত হয়েছে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেককে হত্যা করতে পারতাম, আমরা কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেককে হত্যা করতে পারতাম? বাকি বিশ্ব কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত? এ সম্পূর্ণ এক পাগলামি পরিস্থিতি। যে বিষয়টি সবকিছু রক্ষা করেছে তাহল সব পক্ষই জানত, যুদ্ধ সংঘটিত হলে নেতারা নিজেরাও মারা যাবেন। সুতরাং আপনি যখন জানেন, শুধু দরিদ্র কিছু কৃষক নয়, একটি যুদ্ধে আপনিও মারা যেতে চলেছেন, তখন আপনি যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে আলাদা সিদ্ধান্ত নেবেন।'

পরদিন কূটনীতির জয় হলো। সোভিয়েতরা পিছিয়ে গেল, উচ্চ সতর্কাবস্থা স্বাভাবিক হলো। ২৪ ঘণ্টা বিশ্ব দুটি পারমাণবিক পরাশক্তির মধ্যে

একটি যুদ্ধের কিনারে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে জাতিসংঘ ৩৪০ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করল যা ছিল চার দিনের মধ্যে তৃতীয়।

একা লড়াই করা

লড়াইয়ের ভারসাম্য ইসরাঈলের দিকে চলে যাওয়ার পর অন্য আরব দেশগুলো সিরিয়া ও মিসরের সমর্থনে সৈন্য প্রেরণ করে। ইরাক, জর্দান, সৌদি আরব ও কুয়েত থেকে প্রেরিত সৈন্য সিরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে। এ পাঁচমিশালি আরববাহিনী দিয়ে সিরিয়ার মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন দখলকৃত স্থান থেকে ইসরাঈলিদের হটানোর পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৩ অক্টোবর। কিন্তু তা আর কখনোই হয়নি। কারণ সাদাত জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যা ওই দিন সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হয়। তবে ইসরাঈলের জন্য তখনো একটি বড়ো রকমের তিক্ততা বিরাজ করছিল। যুদ্ধের প্রথম দিনেই সিরিয় ছত্রী সেনারা হারমন পর্বতের ইসরাঈলি লিসেনিং পোস্টটি দখল করে নিয়েছিল। এখন বিজয়ী ইসরাঈলের জিলানি ব্রিগেড ২৩ অক্টোবর হারমন পর্বতে হামলা চালায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা তা পুনর্দখল করে।

ইসরাঈলের ৬শ'তম রিজার্ভ সাঁজোয়া ব্রিগেডের *ইয়োরাম দোরি* বলেন, 'কোনো যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় বলে আমি মনে করি না। কেউ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেউ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

সুয়েজ রণাঙ্গনে ৩৫ হাজার মিসরিয় সৈন্য বিপর্যয়ের শিকার হয়। তারা ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ইসরাঈলিরাও একই অবস্থায় পড়ে। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বহু সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়। ইসরাঈলের জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। তারা অভিযোগ করে গোল্ডামেয়ার সরকার যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনতে পর্যাপ্ত কিছু করছে না। ২৮ অক্টোবর মিসর ও ইসরাঈলের সামরিক নেতারা যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনায় মিলিত হন। ২৫ বছরের মধ্যে দুই দেশের সামরিক পর্যায়ে এটিই ছিল প্রথম

বৈঠক। কিন্তু রণাঙ্গনে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকায় আলোচনা শিগগির থেমে যায়।

শাটল কূটনীতি

ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী এ যুদ্ধের প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। আরব তেল উৎপাদক দেশগুলো ইসরঈলের পশ্চিমা সমর্থকদের চাপে ফেলার জন্য তেলের মূল্যকে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। বৃহৎ উৎপাদনকারীরা একতরফাভাবে তেলের দাম ২০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।

৬ নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কায়রোতে আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে প্রথমবারের মতো বৈঠকে মিলিত হন। চারদিন পর সুয়েজ সিটি ও অবরুদ্ধ মিসরিয় তৃতীয় আর্মির কাছে দৈনিক অসামরিক সরবরাহ বহনকারী গাড়িবহর প্রেরণ নিশ্চিত করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আরো চারদিন পর দুই পক্ষের মধ্যে বন্দীবিনিময় ঘটে।

১৯৭৪ সালের শুরুতে কিসিঞ্জার পুনরায় মিসর-ইসরঈল সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তির মহাপরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপে এ অঞ্চলে সফরে আসেন। ১৯৭৪ সালের ১১ জানুয়ারি তিনি মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় আসওয়ান শহরে সাদাতের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। পরদিন তেলআবিব রওনা হন তিনি। দুই পক্ষই সৈন্য প্রত্যাহার চুক্তিতে সম্মত হয়। এসময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে *শাটল কূটনীতি* শব্দবন্ধটি চালু হয়।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি মিসরিয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মোহাম্মদ আল-গামাসি ও তার ইসরঈলি প্রতিপক্ষ জেনারেল ডেভিড এলাজার ধারাবাহিক সৈন্য প্রত্যাহারের প্রথম পর্যায়ের চুক্তি স্বাক্ষর করেন যার আওতায় ১৯৮২ সালের এপ্রিলে সিনাই থেকে ইসরঈলি সেনা প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়। ইসরঈলি সৈন্যরা তাদের প্রত্যাহার উদযাপন করলেও

তাদের দেশের চিত্র ছিল ভিন্ন। রবিনোভিচ বলেন, 'তিন সপ্তাহের যুদ্ধে ইসরঈল দুই হাজার ৬০০ সৈন্য হারায়।'

ইসরঈলের সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে এ প্রাণহানির জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ী করা হয়। তদন্তে ইসরঈলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ইসরঈলি জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ চলতে থাকে। অবশেষে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নয়দিন পর গোল্ডামেয়ার পদত্যাগ করেন।

এদিকে ইসরঈল সিরিয়ার অভ্যন্তরে দখলীকৃত এলাকায় অবস্থান অব্যাহত রাখে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে কিসিঞ্জার দামেশক ও তেলআবিবের মধ্যে দ্বিতীয় দফা *শাটল কূটনীতি* শুরু করেন। এক মাসের কঠিন আলোচনার পর তিনি সফল হন। ২৮ মে ইসরঈল সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয়। ৫ জুন জেনেভায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবে যুদ্ধ শুরুর ২৪৩ দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে তার অবসান ঘটে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়

'৭৩-এর যুদ্ধের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো সিআইএসহ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরঈলের কোনো গোয়েন্দা সংস্থা এ যুদ্ধ পরিকল্পনার কিছুই আঁচ করতে পারেনি। যুদ্ধে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত ইসরঈলের মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ইসরঈলি প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার অনুমোদন করেন। অন্যদিকে ইসরঈলের সামরিক ক্ষতিপূরণ করতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন অস্ত্র সরবরাহে ওয়াশিংটন ও তেলআবিবের মধ্যে বিমান সেতু প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। সোভিয়েত ইউনিয়নও মিসর ও সিরিয়ায় অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে। সিরিয়াতে সোভিয়েত টেকনিশিয়ান এমনকি সৈন্যরাও যুদ্ধে অংশ নেয়। ইসরঈল সিরিয়া উপকূলে একটি রুশ বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে

রাশিয়া ইসরাঈলকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি দুটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে। প্রয়োজনে ইসরাঈলি যুদ্ধজাহাজের ওপর গুলি চালানোরও অনুমতি দেওয়া হয়। সিরিয়ার লাতাকিয়া বন্দর অভিমুখী পরিবহন জাহাজগুলোর নিরাপত্তা দিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়।

কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে, এ যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আনোয়ার সাদাত প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাননি। এর পরিণতিতে পরে মস্কোর সঙ্গে কায়রোর সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। সাদাত যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ৪ নভেম্বর বলেছিলেন, 'আমরা বহু দিন ধরে তাদের (আরবদের) বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার জন্য বলে আসছি। কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে চাইল। বেশ! আমরা তাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা দিয়েছি যা এমনকি ভিয়েতনামকেও দেওয়া হয়নি। ট্যাঙ্ক ও জঙ্গিবিমানের ক্ষেত্রে তাদের ইসরাঈলের চেয়ে দ্বিগুণ ও আর্টিলারির ক্ষেত্রে তিনগুণ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। বিমান প্রতিরক্ষা ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্রের ক্ষেত্রেও তারা সম্পূর্ণ এগিয়ে ছিল। কিন্তু আবারো তারা ব্যর্থ হয়েছে, আবারো তারা তাদের রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য চেয়ে চিৎকার করেছে। সাদাত মধ্যরাতে দু'বার টেলিফোনে আমার ঘুম ভাঙান। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ সোভিয়েত সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি তাকে জানাই, না আমরা তাদের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।'

বিশ্লেষকেরা বলেন, এ যুদ্ধের পর আরব দেশগুলো সামরিকভাবে ইসরাঈলকে পরাজিত করার ব্যাপারে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের প্রতিবাদে সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ১৭ অক্টোবর থেকে প্রতি মাসে ৫ শতাংশ তেল উৎপাদন হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইসরাঈলে অস্ত্র প্রেরণ ও ২২০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেন। পাল্টাব্যবস্থা হিসেবে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ওপেক এতে শরিক হয় এবং নেদারল্যান্ডসহ

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়। ফলে বিশ্বে সাময়িক তেলসঙ্কট সৃষ্টি হয়।

বাইরের সমর্থন

এ যুদ্ধে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মিসর ও সিরিয়ার সমর্থনে বিভিন্ন দেশের এগিয়ে আসা। কিউবা, আলজেরিয়া, উত্তর কোরিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লেবানন, সুদান মিসর ও সিরিয়ায় সৈন্য, জঙ্গিবিমান ও সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ করে। (মূল : হুসেইন আল-রাজ্জাজ। হোসেন মাহমুদকৃত)

জায়নবাদ; সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে *জায়নবাদ* (*Zionism*) নামে অভিহিত করা হয়। হিব্রু *Zion* শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। *জায়ন* জেরুসালেমের একটি পাহাড়ের নাম। এর অর্থ- 'দাগ কাটার মতো ঘটনা' বা 'স্মৃতি উৎসব' অথবা 'রৌদ্রোজ্জ্বল'। 'ইহুদিবাদ' ও 'জায়নবাদ' মূলত একই জিনিস। রাষ্ট্রহীন নাগরিক (Stateless Citizen) হিসেবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর দীর্ঘ-পরিক্রমায় জায়নবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও ইসরঈল নামের কল্পিত ভূমি ইহুদিদেরকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্ররোচিত করেছে। একসময় 'ইহুদি পুনরুদ্ধার' বা 'খৃস্টবাদের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের' আকারে জায়নবাদ প্রকাশ করা হতো। শুধু ইসরঈল ভূমিই নয় বরং পৃথিবীর ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে খৃস্টান ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর রয়েছে। সংখ্যায় কম হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাহিত্য সাধনা, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম, সমরবিদ্যা, প্রশাসনসহ অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে তাদের পরিকল্পিত দখল জায়নবাদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছে। আমেরিকা শুধু তাদের বন্ধুই নয়, পথপ্রদর্শকও। জায়নবাদের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। ইউরোপ মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে জায়নবাদ একটি মতবাদ হিসেবে বিকশিত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতধারার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দেশ ও

চিন্তাবিদদের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এই মতবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রঙ ধারণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে জায়নবাদকে কোনো একক ব্যক্তি, গায়েবী গ্রন্থ, কোনো উক্তি বা ঘোষণার অভিব্যক্তি বলা যায় না। ইহুদিরা জায়নবাদকে বিংশ শতাব্দীতে তাদের আদর্শিক সাফল্যের অনুঘটক মনে করে। একটি অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার কৃতিত্ব এর। জায়নবাদকে পরিষ্কারভাবে জানতে হলে ইহুদিবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। বস্তুত ইহুদিবাদ ও জায়নবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

ইহুদিরা কাউকে ইহুদি বানায় না। কেউ ইহুদি ধর্মগ্রহণ করলেও ইহুদি হতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গোত্রগুলো খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে কোনো গোত্রের সঙ্গে তাদের গোত্র বা বংশগত সামঞ্জস্য। এই উদ্যোগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নব্বই দশকের শুরুতে তারা সুদানের একটি গোত্রের সঙ্গে তাদের গোত্রকে *ইহুদি ফালাসা* (Falasha) নাম দিয়ে তাদের লাখ লাখ সদস্যকে ইসরঈল ভূমিতে বসতি স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে। এর কিছুদিন পর উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম রাজ্যের কোনো কোনো গোত্রকে তারা ইহুদি বলে গণ্য করেছে এবং তাদের ইসরঈলে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাইরের ইহুদিদের এনে ইসরঈলে বসবাসের সুযোগ দেওয়া বর্তমানে ইহুদিদের একটি জাতীয় প্রয়োজন। কেননা, ইসরঈলের প্রতিরক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা অত্যন্ত জরুরি। আর এই কাজটি করার জন্য প্রথম ঠেলে দেওয়া হয় অভিবাসীদের। ইহুদিরা প্রাণ দিতে ভয় পায়। হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, ইহুদিদের মধ্যে তেমনি *সেফারদিম* (Sepherdim) এবং *আশকেনাজিম* (Ashkenazim) নামে দুটি উচ্চবর্ণের সম্প্রদায় আছে। এরা নিজেদেরকে ইসরঈলের মালিক মনে করে।

জায়নবাদ ও ইহুদি মুক্তি

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের উত্থান ইউরোপিয় ইহুদিদের মুক্তিপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং এর ফলে তারা অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় সমান অধিকার পেতে সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রতি উদারনীতি অনুসরণের এই ঘটনা পূর্ব-ইউরোপ ও রাশিয়ার ওপরও প্রভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে ইহুদি সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে যা কট্টর জায়নবাদীদের মনোপুত ছিল না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকায় ইহুদিরা অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র ছিল। ওই সময় এ দুটি মহাদেশের বাসিন্দাদের অনেকের বাড়িতেই একটি সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যেতো যাতে লেখা থাকতো- *Dogs and Jews are not allowe.* জায়নবাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিংশ শতাব্দীতে এসে এখন আর এই সাইনবোর্ড দেখা যায় না। কুকুর এখন ইউরোপ-আমেরিকার অনেকেরই বিছানা ও প্রাতঃ এবং সান্ধ্যভ্রমণের সাথী আর ইহুদিরা তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি।

সাংস্কৃতিক জায়নবাদ

ধর্মীয় ও বাস্তবসম্মত অন্যান্য কারণে জায়নবাদের নামে ইহুদি সংস্কার আন্দোলন বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তাদের মধ্যে বিপ্লবী হওয়ার অনুপ্রেরণাও যোগায়। ১৮৪০-এর দশকে লর্ড সভার দু'জন সদস্য *সাফটেসবারী* এবং *পালামারস্টন* এই মর্মে প্রস্তাব করেন, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের একটি কলোনী প্রতিষ্ঠাই বিশ্বব্যাপী ইহুদি সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাদের এই দর্শন ও প্রস্তাবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইহুদি কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং নাট্যকাররা এগিয়ে আসেন। সেক্সপিয়র ও অন্যান্য লেখকের ইহুদিদর্শন বিরোধী নাটক-উপন্যাসের মোকাবেলায় বাজারে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়। লর্ড বায়রন, বেঞ্জামিন ডিসরেইলী, জর্জ ইলিয়ট ও ওয়াল্টার স্কটের গল্প-উপন্যাস এবং কবিতা-প্রবন্ধ এরই প্রমাণ।

ধর্ম ও জায়নবাদ

ইহুদি ধর্মগুরুদের সবাই জায়নবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। তাদের ভয় ছিল একটি ধর্মীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কৌশলগত কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে ধর্ম আর কখনো তার মর্যাদা ফিরে পেতে পারে না। প্রেসবার্গের রাব্বী Moses Schreiber (১৭৬২-১৮৩৯) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জায়নবাদের নামে যেকোনো সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। রাদুনের হাফেজ চেইমও এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি Aqudath Yisrael নামে একটি সংস্থারও প্রধান ছিলেন। এদের ধ্যান-ধারণা ছিল ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি বা জীবনের দৈনন্দিন তৎপরতা যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এতে ধর্ম তার বিশুদ্ধতা হারায়। অন্যদিকে ধর্মের উসুলসমূহ যদি পালন করা হয় এবং ধর্মপুস্তককে সহিহভাবে পড়তে শেখা হয়, জীবনাচারে সততা-নিষ্ঠা থাকে তাহলে আপনা-আপনিই নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা ধর্মপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে চলে আসবে এবং ইহুদিরা পুণ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইহুদিসমাজে এই গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা পায়নি। মসির জন্য অপেক্ষা না করে জায়নবাদীদের যে দলটি ইসরাঈল ভূমি পুনরুদ্ধারের পক্ষে ছিল (Proto Zionism) তারাই শেষপর্যন্ত জয়লাভ করে। তারা প্রথমত ইসরাঈলে ভূমি ইজারা ও পরে ক্রয়ের মাধ্যমে বসতি শুরু করে এবং শেষপর্যন্ত মিত্রশক্তি ও বৃটিশ সরকারকে ব্যবহার করে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে গোটা ভূখন্ড দখল করে নেয়।

প্রোটো জায়নবাদের পরের অধ্যায়টি এই মতবাদের ইতিহাসে Foundational Zionism নামে পরিচিত। এই সময়ে থিওডর হার্জেল (Theodor Herzl) এবং শাইম উইজম্যানের (Chaim Weizmann) নেতৃত্বে জায়নবাদ একটি সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। রাজনৈতিক জায়নবাদ, সাংস্কৃতিক জায়নবাদ, ধর্মীয় জায়নবাদ, ভূখণ্ডগত জায়নবাদ থেকে শুরু করে জায়নবাদী কংগ্রেস ও বৃটিশ ম্যান্ডেট আদায় পর্যন্ত সমস্ত

তৎপরতাই এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অধ্যায়ে জায়নবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

ম্যান্ডেটরী জায়নবাদ

বৃটিশ ম্যান্ডেটের আওতায় ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে জায়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব ইউরোপ থেকে ইসরাঈলে স্থানান্তরিত হয়। এসময় বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের এনে ফিলিস্তিনে বসতিস্থাপনের ব্যবস্থাকরণ ও ইহুদি বিভিন্ন সশস্ত্র গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ডেভিড বেন গুরিয়ন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

যুদ্ধোত্তর জায়নবাদ

ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত এই ইহুদি রাষ্ট্রটিকে আনবিক অস্ত্রে সুসজ্জিতকরণের ঘটনা জায়নবাদের আদর্শিক ও ভূখণ্ডগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরবদের সঙ্গে ছয়দিন মেয়াদী যুদ্ধে ইসরাঈলের বিজয় জায়নবাদীদের মধ্যে নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা জায়নবাদীদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বজুড়ে জায়নবাদ পুনরুদ্ধারে আলোকছটা ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সামরিক সম্প্রসারণবাদও উৎসাহিত হয়। এর ফলে লিকুদ পার্টি ও মোনাশেম বেগিন নেতৃত্বে আসেন এবং বৃহত্তর ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। ১৯৭৭ সালে *লিকুদ পার্টি* ক্ষমতায় আসার পর ইসরাঈল সরকার ও জায়নবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব-কাঠামো অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় ইহুদি বসতি স্থাপনের ব্যাপারে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারা মুক্তবাজার অর্থনীতির অনুকূলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে। ইসরাঈলের ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনা হয় এবং জায়নবাদী বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া

হয়। বিভিন্ন দেশের জায়নবাদী আন্দোলন ভূমি পুনরুদ্ধার ও বসতি স্থাপন আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করে।

গবেষকদের মতে, দুনিয়ায় যেসব সংস্থা সরাসরি জায়নবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরোক্ষভাবে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই মতবাদটি একটি ফেতনা যার প্রভাবে সারা দুনিয়া বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ইহুদি ও জায়নবাদীরা যে যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাকে ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা নারী, অর্থ-বিত্তসহ প্রলুব্ধ করার যাবতীয় উপাদানকে ব্যবহার করে। ইউরোপের রেনেসাঁ ছিল ইহুদি চক্রান্তের সাফল্যের সূচনা। রেনেসাঁর পর তারা চক্রান্তের জাল বিস্তার করে খৃস্টানদের ঐক্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। খৃস্টানদের আকিদা ও চিন্তা-চেতনায় এমন সব বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যার ফলে তারা পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোটি কোটি খৃস্টানকে প্রাণ দিতে হয়। ইহুদিরা প্রকাশ্য ও গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেক খৃস্টধর্মাবলম্বীকে নিজেদের সহযোগী ও ক্রীড়নকে পরিণত করে। এভাবে তারা তাদের শত্রু Roman Catholic ও Orthodox Church এর কার্যক্রমকে দুর্বিষহ করে তোলে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, খৃস্টান জগতের অর্ধেক এখন জায়নবাদী ইহুদিদের দখলে। তারা তাদের কথায় উঠে-বসে এবং অন্ধের মতো তাদের অনুসরণ করে। এব্যাপারে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ইহুদি অনুপ্রেরণায় এরা ল্যাতিন বা পশ্চিমা খৃস্টবাদ থেকে আলাদা হয়ে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেমন- মোরাভিয়া, লুথারিয়া, ক্যালভিনিয়া এবং প্রেসবাইটেরিয়ান সম্প্রদায়। এর ভিত্তিতে তাদের গির্জাও ভাগ হয়েছে। চার্চ অব ইংল্যান্ডের বাপটিস্ট, কংগ্রেশনালিস্ট, মেথডিস্ট, ইভানজেলিকান, মডার্নিস্ট ও এংলো ক্যাথলিক প্রভৃতি শাখা এরই প্রমাণ বহন করে। বিশ্বব্যাপী রোমান ক্যাথলিকদের স্বতন্ত্র

রাষ্ট্র *হলি সিটি* তাদেরই প্ররোচনায় বিশাল ভূখণ্ড ছেড়ে রোমের একটি পাহাড়ের কয়েক একর জমিতে আশ্রয় নিয়েছে।

একটি অভিশপ্ত জাতি হিসেবে ইহুদিরা খৃস্টানদের কাছেও নিন্দিত ছিল। ইউরোপিয় রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লব এবং zionist International Jewry'র ন্যায় প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে এবং জায়নবাদী নেতাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে তাদের এই নিন্দিত অবস্থা বর্তমানে আর নেই বললেই চলে। খৃস্টজগত সর্বসম্মতভাবে এই আকিদা পোষণ করতো, ইহুদিরা আল্লাহর নবীদের হত্যাকারী একটি জাতি (Diecide Nation)। এ প্রেক্ষিতে ইহুদিদের প্রতি লা'নত বর্ষণ খৃস্টানদের উপাসনার একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। ১৯৬৫ সালের ২৮ অক্টোবর দ্বিতীয় ভ্যাটিকানের এক নির্দেশনামায় গুড ফ্রাইডে উপাসনার এই অংশটি পরিত্যাগ করা হয়।

জায়নবাদী সংগঠনসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

জায়নবাদী ইহুদিরা দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নেই যেখানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে না। আস্তিক-নাস্তিক, পৌত্তলিক সব মতবাদের মানুষকে টার্গেট করে তারা কাজ করছে এবং সর্বত্র সাংগঠনিক নিপুণতার পরিচয় দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিশ্বব্যাপী কর্মরত জায়নবাদী সংগঠনসমূহকে কাঠামোগত দিক থেকে ১০টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো- ১. আদর্শিক (Ideological), ২. রাজনৈতিক (Political), ৩. প্রশাসনিক (Administrative), ৪. সামাজিক (Social), ৫. বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual), ৬. বৈজ্ঞানিক (Scientific), ৭. সাংস্কৃতিক (Cultural), ৮. ধর্মীয় (Religious), ৯. কৌশলগত (Strategic), ১০. সরবরাহ সুযোগ সুবিধাগত (logistic)।

কার্যক্রমের দিক থেকে জায়নবাদী তৎপরতাগুলো চারভাগে বিভক্ত- ১. ইতিবাচক, ২. নেতিবাচক, ৩. সক্রিয় ও ৪. নিষ্ক্রিয়।

যোগাযোগের দিক থেকে জায়নবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো আট প্রকারের- ১. গোপন তবে সক্রিয় (Secret Active), ২. গোপন এবং নিষ্ক্রিয় (Secret Passive), ৩. অধিভুক্তি বহির্ভূত (Unattached), ৪. প্রত্যক্ষ (Direct), ৫. পরোক্ষ (Indirect), ৬. স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous), ৭. সংকটকালীন (Critical), ৮. স্ববিকশিত (Self Growing)।

বিশ্বে জায়নবাদের লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগণিত সংস্থা কাজ করছে। এর সাফল্য ও ক্রমবিকাশে যেসব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং রাখছে সেগুলোর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এরা জন্মগতভাবে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তৎপর। এর মধ্যে কিছু আছে প্রত্যক্ষ ইহুদি সংগঠন, কিছু পরোক্ষ সংগঠন এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মুসলিম নামধারী সংগঠন।

এক. প্রত্যক্ষ ইহুদি সংগঠন-

(১) আন্তর্জাতিক ইহুদি কংগ্রেস (২) আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট লিগ (৩) বেরিহাহ মুভমেন্ট (৪) বেনেই মোশা (৫) হা পু-এল হা মিযরাচি (৬) হা সোমের হা যায়ের (৭) হা নওয়ার হা জিওনী (৮) আগুদাত ইসরঈল (৯) বেতার (১০) বিলু (১১) বান্ড (১২) ডোরশেই জায়ন (১৩) ইজরাত আহিম (১৪) হার্বোনেম (১৫) হাদাসাহ (১৬) হাগানাহ (১৭) হাখশারাহ (১৮) হ্যাসিদিজম (১৯) হাসকালাহ (২০) হেদের মেতুকান (২১) হা হালুজ (২২) হেরুত (২২) হোভেওয়াই জায়ন (২৩) *Helfjverein Der Deutchem Juden* (24) *Hestadrunt* (25) *Irgun zevai Leummi* (26) *Jewish Agency* (27) *world zionists organisation* (28) *Jewish Colonial Trust* (29) *Jewish Legion* (30) *Jewish Natural Fund* (31) *Lohami Herul Israel* (32) *Kadumah* (33) *Kneset Israel* (34) *Malabi* (35) *Mahal* (36) *Mapam* (37) *Migrachi* (38) *New zionist organization* (39) *Pioneer women* (40) *Po Alei zion* (41) *Shalia plu Shelihum* (42) *V'aad Le Ummi* (43) *Women zionist*

organistion (44) *Young Judea* (45) *Youn Aliyah* (46) *Zeirei zion* (47) *Zyyoni zion*

দুই. পরোক্ষ ইহুদি সংগঠন-

(1) *Anglican Church of England* (2) *International Communist Congress* (3) *United Nations Organization* (4) *International Monetary Fund* (5) *World Bank* (6) *International Association & Poets* (7) *Play writes* (8) *Editors Essayists and Novelists* (9) *International Free Mason Movement* (10) *Oxfam* (11) *The Rockfellers Institute/Centre* (12) *Amnesty International* (13) *The Loyds* (14) *Bank Luxembarg* (15) *Bank Barmuda* (16) *Bank of Grand Caymon* (17) *International Red Cross* (18) *The Group of Thirty* (19) *The Chase Manhatton* (20) *City Bank* (21) *Clouser* (22) *Ford Foundation* (23) *The Council for Parliamet of the World Relgions* (24) *Multinational Corporations*

তিন. আন্তর্জাতিক সংস্থা-

(1) *UNDP* (2) *FAO* (3) *UNCTAD* (4) *WHO* (5) *UNIDO* (6) *UNICEF* (7) *UNESCO*

চার. মুসলিম নামধারী সংগঠন-

(১) কাদিয়ানী সম্প্রদায় (২) বাহাই সম্প্রদায় (৩) দ্রুজ সম্প্রদায় (৪) ইসমাইলি সম্প্রদায় (৫) নুসাইরি সম্প্রদায় (৬) মুতাজিলা সম্প্রদায়।

ভারতবর্ষে জায়নবাদী সংগঠন

(১) *Indian National Congress* (২) *Theosophical Society of India* (৩) রামকৃষ্ণ মিশন (৪) ব্রাহ্ম সমাজ (৫) হিন্দু মহাসভা (৬) রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও সংঘ পরিবার *(RSS & Sangha pariber)* (৭) আর্য সমাজ (৮) দলিত ভয়েস (৯) বহুজন সমাজ পার্টি (১০) *All Socialist parties* (১১) *All communist parties* (১২) *Free Thinkers*.

ফিলিস্তিন ভূমিতে অভিশপ্ত ইহুদিরা এখন রাষ্ট্রহীন নাগরিকের ন্যায় বিশ্বব্যাপী লাঞ্ছিত নয়, বরং তারা সর্বত্র মুসলিমদের লাঞ্ছিত করছে। খৃস্টান ও মুশরিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা দুনিয়াময় কর্তৃত্ব করতে চাইছে। মুসলিম জাতি এখন সর্বত্র মজলুম। দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে হলে এবং সার্থকভাবে জায়নবাদকে মোকাবেলা করতে হলে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। **প্রথমত,** পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা। **দ্বিতীয়ত,** জীবনাচরণকে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করা। **তৃতীয়ত,** ইহুদি ও জায়নবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে উম্মাহকে সার্বক্ষণিক সতর্ক করার ব্যবস্থা করা। ইহুদি-খৃস্টান নিয়ন্ত্রনাধীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব সংগঠন ও উৎসসমূহের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। তবে আশা করা যায় ধীরে ধীরে জায়নবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদেরকে আমরা মুক্ত করতে পারবো। (জায়নবাদ বিষয়ক গবেষণাপত্র-মোহাম্মাদ নূরুল আমিন)